প্রাকৃতিক ভূগোল

প্রথম পত্র

কোর্স কোড: HSC 1836

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম

(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাকৃতিক ভূগোল

প্রথম পত্র

কোর্স কোড: HSC 1836

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

রচনায়

ফারজানা হোসেন
প্রভাষক, ভূগোল
স্কুল অব সোসাল সাইয়েন্স হিউমেনিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনায়

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
প্রভাষক, ভূগোল
ওপেন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সমন্বয়কারী

এন এম রিফাত নাসের
প্রভাষক, ওপেন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাকৃতিক ভূগোল

প্রথম পত্র

কোর্স কোড: HSC 1836

এইচ এস সি প্রোগ্রাম

প্রকাশ কাল ঃ ডিসেম্বর ২০০৩
পুন:মুদ্রণ : ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭
পুন:মুদ্রণ : ২০১১

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

কভার গ্রাফিকস
আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ টিপু সুলতান
মোঃ আশরাফুজ্জামান
শাহাবুদ্দিন মোল্লা
কাজী মোদ্দাছেরুল হক

মুদ্রণ
বিজনেস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৪-১৫, পদ্মনিধি লেন, ঢাকা-১১০০

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN 984-34-3056-5

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে

বইটি কিভাবে পড়বেন

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনার জানেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করে থাকে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে সরাসরি শিক্ষাদান প্রক্রিয়া বিদ্যমান থাকে না। তাই বই হয় শিক্ষার্থীদের জন্য প্রধান সাহায্যকারী উপাদান। এ দিকটি বিবেচনা করে অত্র বইটি স্ব-শিক্ষণ পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে এবং লেখার সময় বাউবি'র নির্ধারিত মড্যুল অনুসরণ করা হয়েছে।

বইটির প্রতিটি ইউনিট এবং পাঠ সহজ ও বোধগম্য করে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সহজ ভাষা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। লিখিত বর্ণনার পাশাপাশি পড়ার সময় চিত্রে লক্ষ্য করুন এবং বর্ণনার সাথে মিলিয়ে নিন। তাতে আপনার ধারণা আরও সুস্পষ্ট হবে এবং বুঝতে সুবিধা হবে।

বইটি পড়ার সময় আপনি অবশ্যই প্রতিটি ইউনিট এবং পাঠের প্রথম অংশ ভালভাবে পড়বেন। সংশ্লিষ্ট পাঠে কি কি বিষয়ে পাঠদান করা হবে এবং আপনি কি কি জানতে পারবেন তা উল্লেখ রয়েছে। পাঠ শেষে সে বিষয়গুলো ভালভাবে জানতে পারলেন কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ইউনিটের শেষের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে নিজেই ঠিক করুন। এরপর আপনার উত্তরগুলো বইটিতে দেওয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন। যদি আপনি প্রশ্নগুলোর উত্তর সঠিকভাবে দিতে না পারেন তবে বুঝবেন আপনার পাঠটি আবার পড়ার প্রয়োজন রয়েছে। পাঠটি পুনরায় পড়ার পরেও যদি আপনি বুঝতে অসমর্থ হন সেক্ষেত্রে আপনি মাসের নির্ধারিত শুক্রবারে টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে কর্তব্যরত শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারেন। এছাড়াও বইটির গুরুত্বপূর্ণ পাঠ সমূহের উপর রেডিও এবং টেলিভিশনে অডিও এবং ভিডিও প্রোগ্রাম প্রচার করা হয়ে থাকে যা থেকে আপনারা পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারেন।

আপনাদের মঙ্গল কামনা করছি।

সূচিপত্র

ইউনিট ১ ঃ	**প্রাকৃতিক ভূগোল**	**১-৬**
পাঠ ১.১ ঃ	প্রাকৃতিক ভূগোল সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা	১
পাঠ ১.২ ঃ	অশ্মমন্ডল, বারিমন্ডল, বায়ুমন্ডল ও জীবমন্ডল	৪
ইউনিট ২ ঃ	**পৃথিবী (Earth)**	**৭-৩২**
পাঠ ২.১ ঃ	পৃথিবী ও সৌরজগত	৭
পাঠ ২.২ ঃ	ভূ-অভ্যন্তরের গঠন ও উপাদান	৯
পাঠ ২.৩ ঃ	শিলা ও খনিজ	১১
পাঠ ২.৪ ঃ	খনিজের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্ম	১৪
পাঠ ২.৫ ঃ	শিলা ঃ শ্রেণী বিভাগ, বৈশিষ্ট্য ও শিলা গঠনকারী প্রধান খনিজসমূহ	২১
পাঠ ২.৬ ঃ	পাললিক শিলা - গঠন, প্রকৃতি, শ্রেণীবিন্যাস, উৎপত্তি, গুরুত্ব	২৫
পাঠ ২.৭ ঃ	রূপান্তরিত শিলা-উৎপত্তি, রূপান্তর প্রক্রিয়া, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব	৩০
ইউনিট ৩ ঃ	**ভূ-আলোড়ন (Diastrophism)**	**৩৩-৫৮**
পাঠ ৩.১ ঃ	ভূ-আলোড়নকারী শক্তি	৩৩
পাঠ ৩.২ ঃ	ভূ-আলোড়নে সৃষ্ট ভূমিরূপ	৩৯
পাঠ ৩.৩ ঃ	পর্বত	৪৪
পাঠ ৩.৪ ঃ	মালভূমি	৫০
পাঠ ৩.৫ ঃ	সমভূমি	৫৫
ইউনিট ৪ ঃ	**ভূমিকম্প (Earth Quake)**	**৫৯-৭২**
পাঠ ৪.১ ঃ	ভূমিকম্পের সংজ্ঞা ও কারণ	৫৯
পাঠ ৪.২ ঃ	ভূ-কম্পন তরঙ্গ, এর প্রকারভেদ, তীব্রতা ও পরিমাপ	৬৩
পাঠ ৪.৩ ঃ	ভূমিকম্প অঞ্চল, ভূমিকম্পক্রিয়া এবং পূর্বাভাস	৬৮
ইউনিট ৫ ঃ	**আগ্নেয়গিরি (Volcanoes)**	**৭৩-৮৮**
পাঠ ৫.১ ঃ	আগ্নেয়গিরিঃ সংজ্ঞা, উৎপত্তি, শ্রেণীবিভাগ	৭৩
পাঠ ৫.২ ঃ	আগ্নেয়জাত পদার্থ ও আগ্নেয়গিরি	৭৯
পাঠ ৫.৩ ঃ	আগ্নেয়জাত ভূমিরূপ	৮৪
পাঠ ৫.৪ ঃ	আগ্নেয়গিরির ভৌগোলিক অবস্থান ও অগ্ন্যুৎপাতের ফলাফল	৮৭
ইউনিট ৬ ঃ	**বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবন**	**৮৯-১১২**
পাঠ ৬.১ ঃ	বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবন সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা	৮৯
পাঠ ৬.২ ঃ	বিচূর্ণীভবনের প্রভাবক সমূহ	৯৩
পাঠ ৬.৩ ঃ	যান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন	৯৭
পাঠ ৬.৪ ঃ	রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন	১০১
পাঠ ৬.৫ ঃ	জৈবিক বিচূর্ণীভবন	১০৪
পাঠ ৬.৬ ঃ	স্তূপ অপসারণ - দ্রুতগামী ও ধীরগামী অপসারণ	১০৮
ইউনিট ৭ ঃ	**নদী : নদী খাতের আকৃতি এবং নদী প্রবাহ**	**১১৩-১৩০**
পাঠ ৭.১ ঃ	নদী খাতের আকৃতি এবং নদী প্রবাহ	১১৩
পাঠ ৭.২ ঃ	নদীর বিভিন্ন অবস্থা বা গতি	১১৫
পাঠ ৭.৩ ঃ	নদীর কাজ	১১৭
পাঠ ৭.৪ ঃ	নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ	১২০
পাঠ ৭.৫ ঃ	মধ্যগতিতে নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ	১২৩
পাঠ ৭.৬ ঃ	নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ	১২৬

ইউনিট ৮ ঃ	**বায়ুমন্ডল (Atmosphere)**	**১৩১-১৪২**
পাঠ ৮.১ ঃ	বায়ুমন্ডলের গুরুত্ব ও উপাদান, গভীরতা এবং বৈশিষ্ট্য	১৩১
পাঠ ৮.২ ঃ	বায়ুমন্ডলীয় স্তর	১৩৪
পাঠ ৮.৩ ঃ	বায়ুমন্ডলীয় চাপ	১৩৮
ইউনিট ৯ ঃ	**জলবায়ু (Climate)**	**১৪৩-১৭৪**
পাঠ ৯.১ ঃ	আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামক	১৪৩
পাঠ ৯.২ ঃ	সৌরশক্তি	১৪৯
পাঠ ৯.৩ ঃ	বায়ুর প্রবাহ ঃ নিয়ামক ও ধরণ	১৫৩
পাঠ ৯.৪ ঃ	নিয়ত বায়ুপ্রবাহ	১৫৬
পাঠ ৯.৫ ঃ	স্থানীয় বায়ু	১৫৯
পাঠ ৯.৬ ঃ	সাময়িক বায়ু	১৬২
পাঠ ৯.৭ ঃ	বায়ুর আর্দ্রতা	১৬৫
পাঠ ৯.৮ ঃ	বৃষ্টিপাত	১৬৭
পাঠ ৯.৯ ঃ	অনিয়মিত বায়ু ঃ ঘূর্ণিঝড়	১৭২
ইউনিট ১০ ঃ	**জলবায়ুর শ্রেণী বিভাগ (Classification of Climate)**	**১৭৫-১৮৮**
পাঠ ১০.১ ঃ	জলবায়ুর শ্রেণী বিভাগ	১৭৫
পাঠ ১০.২ ঃ	নিরক্ষীয় জলবায়ু	১৭৯
পাঠ ১০.৩ ঃ	ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু (Topical Monsoon Climate)	১৮২
পাঠ ১০.৪ ঃ	ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু	১৮৬
ইউনিট ১১ ঃ	**বারিমন্ডল**	**১৮৯-১৯৬**
পাঠ ১১.১ ঃ	মহাসাগর বন্টন	১৮৯
পাঠ ১১.২ ঃ	মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ	১৯৩
ইউনিট ১২ ঃ	**মহাসাগরীয় স্রোত (Ocean Current)**	**১৯৭-২১৮**
পাঠ ১২.১ ঃ	সংজ্ঞা ও কারণ	১৯৭
পাঠ ১২.২ ঃ	প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত	২০৩
পাঠ ১২.৩ ঃ	ভারত মহাসাগরীয় স্রোত	২০৭
পাঠ ১২.৪ ঃ	আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত	২১১
পাঠ ১২.৫ ঃ	সমুদ্র স্রোতের প্রভাব বা ফলাফল	২১৬
ইউনিট ১৩ ঃ	**জোয়ার ভাঁটা**	**২১৯-২২৬**
পাঠ ১৩.১ ঃ	জোয়ার-ভাঁটার সংজ্ঞা, কারণ, শ্রেণীবিভাগ	২১৯
পাঠ ১৩.২ ঃ	জোয়ার ভাঁটার সময়, গতি ও প্রভাব	২২৪

ব্যবহারিক ভূগোল

ইউনিট ১৪ ঃ	**মানচিত্রের স্কেল**	**১-২২**
পাঠ ১৪.১ ঃ	সাধারণ স্কেল বা সরল মাপনী	১
পাঠ ১৪.২ ঃ	ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্কেল	৩
পাঠ ১৪.৩ ঃ	স্কেলের ব্যবহার	৫
পাঠ ১৪.৪ ঃ	স্কেলের প্রকাশ পদ্ধতি	৭
পাঠ ১৪.৫ ঃ	সাধারণ স্কেল	৯
পাঠ ১৪.৭ ঃ	সাধারণ স্কেল ঃ উদাহরণ	১১
পাঠ ১৪.৭ ঃ	সাধারণ স্কেল ঃ অনুশীলনী	১৮

ইউনিট ১৫ ঃ	**কর্ণীয় স্কেল (Diagonal Scale)**	**২৩-৩৭**
পাঠ ১৫.১ ঃ	সংজ্ঞা ও গঠন	২৩
পাঠ ১৫.২ ঃ	কর্ণীয় স্কেলের অঙ্কন পদ্ধতি	২৬
ইউনিট ১৬ ঃ	**মানচিত্রের সংকোচন ও প্রসারণ (Reduction & Enlargement of Maps)**	**৩৭-৫২**
পাঠ ১৬.১ ঃ	মানচিত্রের সংকোচন ও প্রসারণ সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা	৩৭
পাঠ ১৬.২ ঃ	মানচিত্রের সংকোন কৌশল ঃ বর্গ পদ্ধতি	৩৮
পাঠ ১৬.৩ ঃ	মানচিত্রের সংকোচন কৌশল ঃ ত্রিভুজ পদ্ধতি	৪০
পাঠ ১৬.৪ ঃ	মানচিত্রের সংকোচন কৌশল ঃ অনুশীলনী	৪২
পাঠ ১৬.৫ ঃ	মানচিত্রের সম্প্রসারণ কৌশল ঃ বর্গ পদ্ধতি	৪৫
পাঠ ১৬.৬ ঃ	মানচিত্রের সম্প্রসারণ কৌশল ঃ ত্রিভুজ পদ্ধতি	৪৮
ইউনিট ১৭ ঃ	**মানচিত্রে ভূমির বন্ধুরতা প্রদর্শন (Relief of Maps)**	**৫৩-৬৮**
পাঠ ১৭.১ ঃ	মানচিত্রে ভূমির বন্ধুরতা প্রদর্শনের বিভিন্ন পদ্ধতি	৫৪
পাঠ ১৭.২ ঃ	মানচিত্রে ভূমির বন্ধুরতা প্রদর্শন ঃ অঙ্কন প্রক্রিয়া	৫৮
পাঠ ১৭.৩ ঃ	সমোন্নতি রেখার সাহায্যে বিভিন্ন ভূমিরূপ প্রদর্শন	৬১
পাঠ ১৭.৪ ঃ	সমোন্নতি রেখার সাহায্যে বিভিন্ন ভূমিরূপ প্রদর্শন	৬৪

ইউনিট ১

প্রাকৃতিক ভূগোল

পাঠ- ১.১ ঃ প্রাকৃতিক ভূগোল সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা
(General Discussion on Physical Geography)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- প্রাকৃতিক ভূগোল কি তা বলতে পারবেন।
- প্রাকৃতিক ভূগোল চর্চার ক্ষেত্র বলতে পারবেন ।
- প্রাকৃতিক ভূগোলের শ্রেনী বিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ভূগোল চর্চা দুটো মূল ধারায় বিভক্ত। যথা–
প্রাকৃতিক ভূগোল ও মানবিক ভূগোল। এদুটো ধারার মধ্যে আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রাকৃতিক ভূগোল।

প্রাকৃতিক ভূগোল কি?

(What is Physical Geography?)

বিজ্ঞানের যে শাখা অধ্যয়নে ভূ-ত্বকের উপরিভাগের ভৌত পরিবেশ এবং এতে কার্যরত বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াসমূহ সম্পর্কে জানা যায় তাকে প্রাকৃতিক ভূগোল বলে। এটি প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক শাখা সমূহ নিয়ে গড়ে উঠেছে। যেমন ঃ আবহাওয়াবিদ্যা, জলবায়ুবিদ্যা, সমুদ্রতত্ব, ভূমিরূপবিদ্যা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক ভূগোল কাকে বলে?

প্রাকৃতিক ভূগোল চর্চার ক্ষেত্র

যে সব ভূগোলবিদ প্রাকৃতিক ভূগোল চর্চা করেন তাঁদের মূখ্য বিষয় প্রাকৃতিক বিষয়াদি। যেমন পৃথিবীর জন্ম, ভূ-প্রকৃতি, শিলা ও খনিজ, ভূমিরূপ, নদ-নদী, জলবায়ু, মৃত্তিকা ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক ভূগোলের শ্রেনীবিভাগ

(Classification of Physical Geography)

আধুনিক ভূগোলে নানা চর্চার মাধ্যমে সব ক্ষেত্রেই ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। ফলে সব শাখায়ই বহু উপবিভাগ গড়ে উঠেছে। ১.১.১ নং ছকে আধুনিক প্রাকৃতিক ভূগোলের উপবিভাগ সমূহ ও এর সগোত্রীয় বিষয় সমূহ দেখানো হয়েছে। লক্ষণীয় যে, প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রতিটি উপ-বিভাগ এর সমগোত্রীয় বিষয়ের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠের সুবিধার জন্য ভূগোলবিদগণ একে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন।

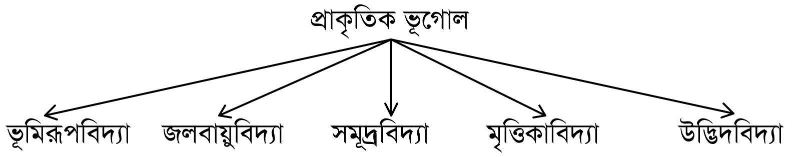

ছক ঃ ১.১.১

নিম্নোক্ত আলোচনায় আমরা এদের সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাব।

(১) ভূমিরূপবিদ্যা (Geomorphology)

ভূগোলের এই শাখা পৃথিবীর অভ্যন্তরীন অবস্থা, পৃথিবীর উৎপত্তি, ভূ-তাত্ত্বিক সময় মাপনী, ভূ-আলোড়ন, ভূ-আন্দোলন বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ, প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কাজ করে। এই শাখার অধ্যয়নে পৃথিবীর অভ্যন্তরীন অবস্থার বর্ণনা ও এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ভূ-ত্বকের পরিবর্তন, পৃথিবীর উৎপত্তি সংক্রান্ত নানা প্রকার মতবাদ ও এর উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা, প্রাথমিকভাবে পৃথিবীর আকার ও আয়তন কেমন ছিল তার বর্ণনা, ভূমিকম্প ও আলোড়নের ফলে পৃথিবীতে যে নানা প্রকার ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়।

(২) জলবায়ুবিদ্যা (Climatology)

এই শাখা বায়ু, বায়ুস্তর, বায়ুর উপাদান, বায়ুর ধর্ম, বায়ুর তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুপুঞ্জ, বায়ুপ্রাচীর, ঘুর্ণিবাত, প্রতিপ ঘুর্ণিবাত, বায়ুমন্ডলের জলীয়বাষ্প, বৃষ্টিপাত, পৃথিবীর জলবায়ূ অঞ্চল প্রভৃতি নিয়ে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ মূলক সমীক্ষা, পরিমাপ, তথ্য, তত্ত্ব ও পূর্বাভাস পর্যন্ত দেয়া সম্ভব। পৃথিবীর অঞ্চলভেদে আবহাওয়ার রূপ, বিস্তরণ, নানা প্রাকৃতিক কারণে এসব আবহাওয়ার পরিবর্তন, কোন স্থানের আবহাওয়ার বিন্যাস, আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রভৃতি বিষয় আবহাওয়াবিদ্যার অর্ন্তগত। ভূগোলের আওতাভূক্ত পদ্ধতি দুর অনুধাবনের (Remote Sensing) মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও বিন্যাস প্রত্যক্ষ রূপে জানা সম্ভব।

(৩) সমুদ্র তত্ত্ব বা সমুদ্র বিদ্যা (Oceanography)

প্রাকৃতিক ভূগোলের এই ভাগটি সাগর, মহাসাগর, উপসাগর ইত্যাদির উৎপত্তি, বিন্যাস, বিস্তরণ, সমুদ্রস্রোত, সমুদ্র তরঙ্গ ও এর কার্য, সমুদ্র তলের বিন্যাস, সমুদ্রে বসবাসকারী প্রাণী ও উদ্ভিদের বিন্যাস, সমুদ্র তলের ভূ-প্রকৃতি, স্থলভাগের উপর সমুদ্রের প্রভাব, জোয়ার-ভাঁটা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে। এই ধারণাকে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও সে অনুযায়ী পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়।

(৪) মৃত্তিকাবিদ্যা (Soil science)

পৃথিবীর বহি:রাবরণ ভূ-ত্বকের গঠণ উপাদান মৃত্তিকা ভূগোলের এই শাখার আওতায় পড়ে। মৃত্তিকার উৎপত্তি, গঠণ, ভূ-তাত্ত্বিক সময় মাপনী অনুযায়ী মৃত্তিকার গঠণ ও বিন্যাস, অঞ্চল ও সময় ভেদে মৃত্তিকার বিস্তরণ, মৃত্তিকার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের বিন্যাস, মৃত্তিকার প্রকার সর্বোপরি মৃত্তিকা ও পরিবেশের আন্ত:সম্পর্ক ও এর প্রভাব নিয়ে ভূগোলের এ শাখাটি কাজ করে।

(৫) উদ্ভিদ বিদ্যা (Biotic science)

ভূগোলের এই শাখায় অর্ন্তভূক্ত বিষয় সমূহ হচ্ছে উদ্ভিদের সময় ও স্থান ভেদে ক্রমবিকাশ, পরিবেশের ওপর উদ্ভিদের প্রভাব বা পরিবেশ ভেদে উদ্ভিদের বিস্তরণ, স্থান ও সময় ভেদে উদ্ভিদের বিন্যাস, উদ্ভিদ বাস্তব্যবিদ্যা এবং উপরোক্ত বিষয়সমূহের আলোকে পৃথিবীর ভূ-আচ্ছাদন সম্পর্কে ধারণা ও সে অনুযায়ী কি পদক্ষেপ নিলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা।

প্রাকৃতিক ভূগোল-এর শাখা কয়টি এবং কি কি?

পাঠসংক্ষেপ

ভূগোলের প্রধান দুটি শাখা প্রাকৃতিক ভূগোল ও মানবিক ভূগোল। প্রাকৃতিক ভূগোল পৃথিবীর নানারূপ প্রাকৃতিক বিষয়াদি নিয়ে কাজ করে। যেমন জলবায়ুবিদ্যা জলবায়ুর নানা বিষয় নিয়ে, সমুদ্রতত্ত্ব সমুদ্র সংক্রান্ত, ভূমিরূপবিদ্যা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ, মৃত্তিকা বিজ্ঞান-মৃত্তিকা ও উদ্ভিদবিদ্যা - উদ্ভিদ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে। স্থান ও সময় ভেদে বিশ্লেষণ ও গঠনমূলক ধারণার প্রকাশ আমরা উক্ত বিষয়গুলো থেকে পাই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ভূগোল চর্চা দুটো মূল ধারায় বিভক্ত, প্রাকৃতিক ও ____________________ ভূগোল।
২. প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠে__ উপরিভাগের ভৌত পরিবেশ ও এতে কার্যরত বিভিন্ন____________প্রক্রিয়াসমূহ সম্পর্কে জানা যায়।
৩. আধুনিক ভূগোলে নানা চর্চার মাধ্যমে সব শাখায় নানা _________________ গড়ে উঠেছে।
৪. যে সব ভূগোলবিদ প্রাকৃতিক ভূগোল চর্চা করেন তাদের মুখ্য বিষয় _______________ বিষয়াদি।

উত্তর ঃ ১. মানবিক ২. ভূ-ত্বকের, ভূ প্রাকৃতিক ৩. উপবিভাগ ৪. প্রাকৃতিক

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রাকৃতিক ভূগোল কি?
২. প্রাকৃতিক ভূগোল চর্চার ক্ষেত্রসমূহ কি কি?
৩. জলবায়ুবিদ্যার বিষয়বস্তু কি কি?
৪. সমুদ্র তত্ত্বের বিষয়বস্তু কি কি?
৫. ভূমিরূপবিদ্যার বিষয়বস্তু কি কি?
৬. মৃত্তিকা বিজ্ঞানের কি কি বিষয় নিয়ে ভূগোলে কাজ হয়?
৭. উদ্ভিদ বিজ্ঞানের কি কি বিষয় নিয়ে ভূগোলে কাজ হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাকৃতিক ভূগোল কাকে বলে? প্রাকৃতিক ভূগোলের চর্চার ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

পাঠ- ১.২ ঃ অশ্মমন্ডল, বারিমন্ডল, বায়ুমন্ডল ও জীবমন্ডল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ♦ অশ্মমন্ডল, বারিমন্ডল, বায়ুমন্ডল ও জীবমন্ডল কি তা জানতে পারবেন।
- ♦ অশ্মমন্ডল বারিমন্ডল, বায়ুমন্ডল ও জীবমন্ডল পাঠের প্রাজেনীয়তা বলতে পারবেন।
- ♦ বায়ুমন্ডল, অশ্মমন্ডল, বারিমন্ডল ও জীবমন্ডল এর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

প্রাকৃতিক ভূগোলের বিষয়বস্তুকে প্রধানত তিনটি অজৈব পরিবেশে ভাগ করা যায়, যেমন বায়ুমন্ডল, অশ্মমন্ডল ও বারিমন্ডল। এছাড়া জৈব পরিবেশ হিসেবে জীবমন্ডল নামেও একটি ভাগ আছে। এই চারটি মন্ডল পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

পৃথিবীর এইসব মন্ডল সমূহের অবস্থান বিবেচনা করলে দেখা যায় যে এরা ঘনত্ব অনুযায়ী উলম্বভাবে অবস্থিত। যেমন, বায়ুর ঘনত্ব সবচেয়ে কম (১.৩ কি: গ্রা:/মি^{৩}) হওয়ায়-এর অবস্থান ওপরে এবং শিলার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী (২০০০ কি:গ্রা:/মি^{৩}) হওয়ায় এর অবস্থান সর্ব নিম্নে। পানি (১০০০ কি: গ্রা:/মি^{৩}) ও জৈব পদার্থ (৫০০ কি: গ্রা:/মি^{৩}) মাঝারী ঘনত্বের, ফলে এদের অবস্থান মাঝামাঝি (চিত্র- ১.১)।

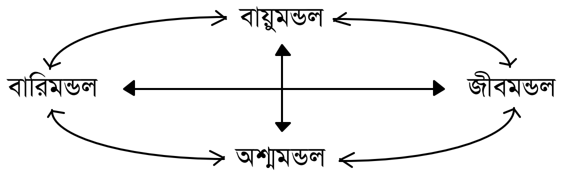

চিত্র ১.১ ঃ পৃথিবীর প্রধান মন্ডল সমূহের পাস্পরিক অবস্থান ও সম্পর্ক

বায়ুমন্ডল (Atmosphere)

বায়ুমন্ডল ভূ-পৃষ্ঠকে চর্তুদিকে বেষ্টন করে আছে। এই মন্ডলের সাথে জীবের অস্তিত্বের সম্পর্ক; তাই একে জীবনস্তর নামেও অভিহিত করা হয়। ভূ-ত্বকের উপরিভাগের কয়েকমিটার থেকে এর শুরু এবং উর্ধ্বাকাশের প্রায় ৬,০০০ কি: মি: পর্যন্ত বিস্তৃত। সূর্য থেকে আগত শক্তি এর প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। বায়ুমন্ডল সমূদ্র সমতলে সবচেয়ে ঘন এবং উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর ঘনত্ব হ্রাস পায়।

বায়ুমন্ডল পাঠের প্রয়োজনীয়তা

১. বায়ুমন্ডলের গভীরতা, বায়ুস্তর বিন্যাস, বায়ুর উপাদান, বায়ুর ধর্ম, বায়ুর তাপ ও চাপ সম্পর্কে জানতে;
২. বায়ুপ্রবাহের কারণ, দিক, বায়ুর শ্রেণী বিভাগ, বিভিন্ন প্রকার ঘূর্ণিবাতের বিষয় জানতে;
৩. জলীয়বাষ্প, বায়ুর আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাতের কারণ, বৃষ্টিবলয়, বৃষ্টিপাতের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে;
৪. এছাড়া বিভিন্ন প্রকার আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে বায়ুমন্ডল পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অশ্মমন্ডল (Lithosphese)

অশ্মমন্ডল পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন ও অধিক পুরুত্ব বিশিষ্ট অংশ যা প্রধানত: গুরুমন্ডল ও কেন্দ্র মন্ডল এই দুই অংশ নিয়ে গঠিত। পুরুত্বের দিক থেকে উভয় অংশই প্রায় ৩,০০০ কি: মি: এর অধিক পুরু। গুরুমন্ডলের প্রায় ১০০ কি: মি: উপরিভাগই সরাসরি বারিমন্ডল, বায়ুমন্ডল ও জীবমন্ডলের সাথে মিথ্স্ক্রিয়ায় অংশ নেয়।

অশ্মমন্ডল পাঠের প্রয়োজনীয়তা

১. পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা, তার উপাদান সমূহ জানতে ;
২. পৃথিবীর জন্ম, শিলার উৎপত্তি, ভূ-আন্দোলন প্রভৃতি জানতে ;
৩. পৃথিবীর জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন ভূগোলবিদের মতবাদ জানতে ;

৪. সূর্য হতে পৃথিবী সৃষ্টি হবার পর বিভিন্ন বিবর্তন জানতে ;
৫. ভূ-মধ্যস্ত ও ভূ-উপরিভাগের বিভিন্ন শক্তি সমূহের ক্রিয়াকর্ম জানতে ;
৬. কিভাবে পাহাড় হতে নদীর উৎপত্তি হয়ে সাগরে পতিত হচ্ছে তা জানতে ; এবং
৭. হিমবাহ ও বায়ু প্রবাহের কার্য-কারণ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে অশ্মমন্ডল পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বারিমন্ডল (Hydrosphere)

ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের শতকরা ৭৯ ভাগ জুড়ে আছে বারিমন্ডল, যা মূলত: বায়ুমন্ডল ও অশ্মমন্ডলের মাঝখানে অবস্থিত। সাগর ও মহাসাগরই বারিমন্ডলের প্রধান অংশ যা পৃথিবীর পানির বেশীরভাগ ধারণ করে আছে এবং বায়ুমন্ডলের বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতার প্রধান উৎস।

বারিমন্ডল পাঠের প্রয়োজনীয়তা

১. সাগর সমূদ্রের উৎপত্তি, তলদেশের অবস্থা, সমুদ্র পানির বৈশিষ্ট্য, সমুদ্রস্রোত, জোয়ার ভাঁটা প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে ;
২. কিভাবে স্থল মন্ডল ও বারিমন্ডল সৃষ্টি হয়েছে তা জানতে ;
৩. ভূ-পৃষ্ঠের সুবিশাল জলভাগ সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে ; এবং
৪. বিভিন্ন প্রকার শৈবাল, সমূদ্র তরঙ্গ ও তার কার্য প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে বারিমন্ডল পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

জীবমন্ডল (Biosphere)

জীবমন্ডল উদ্ভিদ ও প্রাণী জগত নিয়ে গঠিত। ভূ-পৃষ্ঠ এদের আবাসস্থল। ভূ-ত্বকের উপরিভাগের পানি ও মাটির মিলনস্থলে (Interface) জীবের বিকাশ ঘটে। ভরের গুরুত্ব বিবেচনায় বিশ্বব্যাপী মোট জৈব পদার্থের ওজন মাত্র ৮ ট্রিলিয়ন মেট্রিক টন, অথচ বায়ুমন্ডলের মোট ওজন ৫,১৪০ ট্রিলিয়ন মেট্রিক টন এবং বারিমন্ডলের মোট পানির ওজন ১,৫০০,০০০ ট্রিলিয়ন মেট্রিক টন। এই থেকে সহজেই অনুমেয় যে, অন্যান্য মন্ডলের তুলনায় জীবমন্ডলের ভর খুবই নগন্য।

জীবমন্ডল পাঠের প্রয়োজনীয়তা

১. পূর্বে উল্লেখিত তিনটি মন্ডল এর পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটে জীবমন্ডলে;
২. জীবমন্ডলের বৈশিষ্ট্য ও ধরণের উপর উদ্ভিদ ও প্রানী জগৎ টিকে থাকে ও এদের বিবর্তন ও বিকাশ ঘটে থাকে;
৩. জীবমন্ডল হচ্ছে মানুষ ও প্রাণীর আবাসস্থল কাজেই এই মন্ডল সম্পর্কে ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরী।

মন্ডলগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক

বায়ুমন্ডল, অশ্মমন্ডল একত্রে জীবজগৎ টিকিয়ে রেখেছে। চিত্র ১.২-এ জীবজগৎসহ তিনটি অজৈব পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থান দেখানো হয়েছে। চিত্রে লক্ষ্য করুন, অশ্মমন্ডল (ক) বায়ুমন্ডল (খ) ও বারিমন্ডল (গ) -এ তিন মন্ডলের সঙ্গে জীবজগৎ সরাসরি যুক্ত। জৈব ও অজৈব মন্ডলের বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের মাধ্যমে অবিরাম পদার্থ ও শক্তির বিনিময় হয়। প্রাকৃতিক ভূগোলে এ সমস্ত ভূ-প্রাকৃতিক মাধ্যম (যেমন, বায়ু, তরঙ্গ, পানি স্রোত, হিমবাহ) ও প্রক্রিয়াসমূহের (ক্ষয় ও সঞ্চয় কাজ) ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ বইয়ের তিনটি অংশের মধ্যে প্রথম অংশে জীবজগতের আবাসস্থল এবং অশ্মমন্ডল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অশ্মমন্ডলের গঠন উপাদান এবং এতে কার্যরত বিভিন্ন প্রক্রিয়া বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে বায়ুমন্ডলের গঠন, উপাদান ও আঞ্চলিক জলবায়ু সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে এবং তৃতীয় অংশে বারিমন্ডলের বিভিন্ন দিক আলোকপাত করা হয়েছে।

চিত্র ১.২ ঃ অশ্মমন্ডল, বারিমন্ডল ও বায়ুমন্ডলের পারস্পরিক অবস্থান ও সম্পর্ক।

পাঠসংক্ষেপ

আজকের পাঠে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে আলোচিত হল। পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পদ্ধতি মেনে চলে। প্রাকৃতিক ভূগোলের বিষয়বস্তুকে তিনটি অজৈব ও একটি জৈব পরিবেশে ভাগ করা যায়। স্থান ভেদে অজৈব পরিবেশ তিনটি হচ্ছে বায়ুমন্ডল, অশ্মমন্ডল ও বারিমন্ডল এবং একটি জৈব পরিবেশ হচ্ছে জীবমন্ডল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. প্রাকৃতিক ভূগোলের বিষয় বস্তুকে প্রধানত ____________________পরিবেশে ভাগ করা যায়।
২. জৈব পরিবেশ হিসেবে ____________________ নামে একটি ভাগ আছে।
৩. বায়ুমন্ডল উর্ধাকাশের প্রায় ________________________ পর্যন্ত বিস্তৃত।
৪. অশ্মমন্ডল পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন ও অধিক __________ বিশিষ্ট অংশ।
৫. ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের শতকরা ____________________ ভাগ জুড়ে আছে বারিমন্ডল।
৬. জীবমন্ডল উদ্ভিদ ও ______________________ জগত নিয়ে গঠিত।

উত্তর ঃ ১.অজৈব ২. জীবমন্ডল ৩. ৬০,০০০ কি. মি ৪. পুরুত্ব ৫. ৭৯ ৬. প্রাণী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : সময় ১০ মিনিট

১. প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রধান বিষয়বস্তুগুলো কি কি?
২. বায়ুমন্ডলের প্রধান চালিকা শক্তি কি?
৩. অশ্মমন্ডলের এর ভাগ দুটো কি কি?
৪. পানি ও মাটির মিলনস্থলে কার বিকাশ ঘটে?

রচনা মূলক প্রশ্ন

১. প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রধান ভাগগুলো কি কি এবং এদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

ইউনিট- ২

পৃথিবী (Earth)

পাঠ- ২.১ ঃ পৃথিবী ও সৌরজগত

এই পাঠ শেষে আপনি—

- সৌরজগতে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের অবস্থান বলতে পারবেন;
- পৃথিবীর বাহ্যিক আকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- পৃথিবী সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাবেন।

পৃথিবী সূর্যের তৃতীয় নিকটবর্তী গ্রহ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার। পৃথিবীর ন্যায় সূর্যের আরও ৮টি গ্রহ ও তাদের উপগ্রহ নিয়ে সৌরজগৎ গঠিত (চিত্র ২.১.১)। সৌরজগতে পৃথিবীর তুলনামুলক দূরত্বে অবস্থানের কারণে এটি বৈশিষ্ট্যপূর্ন আকার আকৃতি ধারণ করেছে। এ সবই পৃথিবীর অবস্থানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।

পৃথিবী সূর্যের কত তম নিকটবর্তী গ্রহ?

চিত্র: ২.১.১ ঃ সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের তুলনামূলক আকার ও অবস্থান।

অবস্থানগত দিক দিয়ে পৃথিবী মঙ্গল গ্রহের চেয়ে সূর্যের কাছাকাছি একটি কক্ষপথে পরিভ্রমন করে। এই বিশেষ অবস্থানের জন্যই পৃথিবীর গঠন, উত্তাপ, বায়ুমন্ডলের চাপ প্রভৃতি প্রাণীজগতের জীবন ধারণের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। বর্তমান কক্ষপথের চেয়ে পৃথিবী যদি সূর্যের আরো কাছাকাছি পথে পরিভ্রমন করত তাহলে পৃথিবীর তরল পানি সব বাষ্পীভূত হয়ে পৃথিবী পানি শূন্য গ্রহে পরিণত হত। আবার যদি পৃথিবী তার বর্তমান অবস্থান থেকে আরো দুরে অবস্থিত হত তবে সমস্ত পানি বরফে পরিণত হয়ে পৃথিবীকে জীবশূন্য জগতে পরিণত করত। কাজেই: বর্তমান অবস্থানই জীবজগতের জন্য প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত।

এছাড়া, পৃথিবীর আয়তনগত বৈশিষ্ট্যের কারনে এর অভ্যন্তরভাগ আধা গলিত আঠাঁলো অবস্থায় আছে। এই আধাগলিত আঠাঁলো পদার্থই আগ্নেয় পদার্থের অন্যতম উৎস। তাহলে বলা যায় পৃথিবী সূর্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ কি অবস্থায় আছে?

পৃথিবী হঠাৎ করে অল্প সময়ে আজকের এই পৃথিবীতে পরিণত হয়নি। বিবর্তনের নানা পর্যায় পার হয়ে আজকের পৃথিবী। বিভিন্ন পর্যায়ে বারিমন্ডল ও বায়ুমন্ডল সৃষ্টি হয়েছে। এই মন্ডল দুটি পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থিত। পৃথিবীর উপরিভাগ অশ্মমন্ডল নামে পরিচিত। অশ্মমন্ডল কঠিন পদার্থ দ্বারা আবৃত। অশ্বমন্ডলের গঠন এবং উৎপত্তি পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত। পরবর্তী পাঠে আমরা ভূ-অভ্যন্তর সম্পর্কে জানব।

কোন মন্ডল দুটি পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থিত?

পাঠসংক্ষেপ

পৃথিবী সূর্যের তৃতীয় নিকটবর্তী গ্রহ। সূর্যের আরো ৮টি গ্রহ আছে এবং এই গ্রহগুলোর উপগ্রহসহ সৌরজগৎ গঠিত। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থানের কারনে পৃথিবীতে জীব বা প্রানী গঠনের উপযোগী পরিবেশ তৈরী হয়েছে। এর ফলেই প্রাণের উদ্ভব হয়েছে। পৃথিবীর গঠন, উত্তাপ, বায়ুমন্ডলের চাপ প্রভৃতি প্রাণীজগতের জীবন ধারনের জন্য বিশেষ উপযুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন। (সময় ৫ মিনিট)

১.১ পৃথিবী সূর্যের __________নিকটবর্তী গ্রহ।

১.২ সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় ____________ কিলোমিটার।

১.৩ সূর্যের গ্রহ সংখ্যা ______________টি।

১.৪ অবস্থানগত দিক দিয়ে পৃথিবী মঙ্গল গ্রহের চেয়ে সূর্যের ________________ একটি কক্ষপথে পরিভ্রমন করে।

১.৫ পৃথিবী অভ্যন্তরের আধাগলিত আঠাঁলো পদার্থ _______________ পদার্থের অন্যতম উৎস।

উত্তর ঃ ১.১. তৃতীয় ১.২. ১৫ কোটি ১.৩. ৯ ১.৪. কাছাকাছি ১.৫. আগ্নেয়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ (৪×২=৮ মিনিট)

১. পৃথিবীর আকার আকৃতি কি কারনে এ রকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকার আকৃতি ধারন করেছে?
২. পৃথিবী প্রানী জগতের জীবধারনের পক্ষে কেন বিশেষভাবে উপযুক্ত?
৩. বর্তমান কক্ষপথের চেয়ে পৃথিবী সূর্যের আরো কাছে পরিভ্রমন করলে কি অবস্থা হতো?
৪. বর্তমান কক্ষপথের চেয়ে পৃথিবী সূর্যের আরো দূরে পরিভ্রমন করলে কি অবস্থা হতো?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। 'পৃথিবী ও সৌরজগত' এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত টিকা লিখুন।

পাঠ- ২.২ : ভূ-অভ্যন্তরের গঠন ও উপাদান

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভূ-অভ্যন্তর সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- ভূ-অভ্যন্তরের গঠন ও উপাদান কি কি তা জানতে পারবেন;
- ভূ-অভ্যন্তরের প্রধান স্তর সমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

পৃথিবী প্রথম অবস্থায় একটি জ্বলন্ত বাষ্পপিন্ড ছিল। তখন পৃথিবী বিভিন্ন প্রকার গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। ক্রমে পৃথিবী ঠান্ডা হতে শুরু করে এবং গ্যাসীয় অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় রূপ নেয়। ফলে ভারী পদার্থগুলি পৃথিবীর কেন্দ্রে এবং হালকা পদার্থগুলি পৃথিবীর উপরের দিকে জমা হতে থাকে। এভাবে একটির পর একটি পদার্থ জমা হয়ে ভূ-অভ্যন্তর গঠিত।

ভূ-অভ্যন্তরের গঠন ও উপাদান

গোলাকার পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৬৪০০ কিলোমিটার। এর কঠিন আবরণ ভেদ করে এত গভীরে ঢুকে অভ্যন্তরের অবস্থা দেখার কোন সুযোগ নেই। খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য এপর্যন্ত সবচেয়ে গভীরতম কূপ মাত্র ৮ কিলোমিটার ভূ-অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রবেশ করতে পেরেছে এবং ক্ষয়কার্যের ফলে মাত্র ২০-২৫ কিলোমিটার গভীরের শিলা উন্মুক্ত রয়েছে। এইজন্য বিজ্ঞানীরা ভূ-অভ্যন্তরভাগ সম্পর্কে জানার জন্য তিন ধরণের তথ্যের উপর নির্ভর করে থাকেন–

প্রথমত ঃ আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত থেকে প্রাপ্ত ভূ-অভ্যন্তরের শিলার নমুনা,
দ্বিতীয়ত ঃ পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য ও ঘনত্ব এবং
তৃতীয়ত ঃ ভূ-কম্পন তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য বা ভূ-কম্পন তরঙ্গের বেগ ও দিক পরিবর্তনের পরিমাপ।

প্রঃ ভূ-অভ্যন্তর সম্পর্কে জানতে কি কি ভাবে তথ্য পাওয়া যায়?

ভূ-অভ্যন্তরের প্রধান স্তর সময়হ

ভূ-অভ্যন্তরভাগ প্রধানত: তিনটি স্তরে বিভক্ত। যথা-

ক) কেন্দ্রমন্ডল ঃ কেন্দ্রমন্ডল, গুরুমন্ডলের নিম্নভাগ থেকে কেন্দ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরের পুরুত্ব ৩,৪৮৬ কি.মি.। এর গড় ঘনত্ব প্রায় ১০.৭৮ সে.মি.। কেন্দ্রের দিকে ঘনত্ব বাড়তে থাকে। এই স্তর মোট ওজনের শতকরা ৩১.৫ ভাগ দখল করে আছে। এই স্তরটি দুই ভাগে বিভক্ত। যথা- অন্ত:কেন্দ্র ও বহি:কেন্দ্র। চিত্রে (২.২.১) কেন্দ্রমন্ডল দেখানো হল।

f

চত্র ২.২.১ ঃ ভূ-অভ্যন্তরের গঠন

খ) গুরুমন্ডল ঃ কেন্দ্রমন্ডলের বহি:ভাগ থেকে ভূ-ত্বকের নিম্নস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে গুরুমন্ডল বলে। এটি পৃথিবীর আয়তনের শতকরা ৮২ ভাগ এবং ওজনের শতকরা ৬৮ ভাগ দখল করে আছে। ভূ-ত্বক ও গুরুমন্ডলের বহি:সীমানা পর্যন্ত ১০০ কি.মি. পুরু এ স্তরকে একত্রে শিলামন্ডল বা অশ্মমন্ডল ও বলা হয়। গুরুমন্ডলের ১০০ কি.মি. গভীরতায় আনুমানিক তাপমাত্রা ১১০০°-১২০০° সেলসিয়াস। বহিঃকেন্দ্রমন্ডলের সীমানায় এ তাপমাত্রা প্রায় ৩০০০° সেলসিয়াসের কাছাকাছি।

ভূ-অভ্যন্তর কয়টি স্তরে বিভক্ত

গ) অশ্মমন্ডল ঃ গুরুমন্ডলের উপরে অবস্থিত পাতলা শিলাস্তরকে অশ্মমন্ডল বা ভূ-ত্বক বলে। এ স্তরের গড় পুরুত্ব ২০ কি.মি.। ভূকম্পন তরঙ্গ থেকে জানা গেছে যে, মহাদেশীয় ভূ-ত্বক মেকিক ও ফেলমিক নামক পৃথক শিলাস্তরে গঠিত। ভূ-ত্বকের নিচের দিকে প্রতি কিলোমিটারে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

পাঠসংক্ষেপ

পৃথিবী দেখতে প্রায় একটি গোলকের ন্যায়, যার ব্যাসার্ধ প্রায় ৬৪০০ কি.মি.। এর কঠিন আবরণ ভেদ করে ভিতরটা দেখার সুযোগ কম। তাই বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। ভূ-অভ্যন্তর প্রধানত: লোহা, নিকেল, ম্যাগনেশিয়াম, সিলিকেট এবং নানা রকম শিলা ও খনিজ দ্বারা গঠিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

নৈর্ব্যাক্তিক প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১.১. পৃথিবী সূর্যের একটি
ক. উপগ্রহ খ. গ্রহ গ. জ্যোতিষ্ক

১.২. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায়
ক. ৬৪০০ কি.মি. খ. ৫৪০০ কি.মি. গ. ১০৪০০ কি.মি.

১.৩. ভূ-ত্বকের গড় পুরুত্ব
ক. ১৫ কি.মি. খ. ১০ কি.মি. গ. ২০ কি.মি.

১.৪. ভূ-ত্বকের নিচের দিক থেকে প্রতি কিলোমিটারে উত্তাপ বাড়ে
ক. ৩০° সে. খ. ১৫° সে. গ. ২০° সে.

১.৫. কঠিন অন্ত:কেন্দ্রমন্ডল গঠিত
ক. লোহা ও ম্যাগনোশিয়াম দ্বারা
খ. শুধুমাত্র লোহা দ্বারা
গ. লোহা ও নিকেল দ্বারা

উত্তর ঃ ১.১. ক ১.২. ক ১.৩. গ ১.৪. ক ১.৫. গ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ (৩×২=৬ মিনিট)

১. কেন্দ্র ও গুরুমন্ডলের মধ্যে পার্থক্য কি?
২. কেন্দ্রমন্ডল কি?
৩. ভূ-ত্বক প্রধানত: কি কি উপাদান দ্বারা তৈরী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্রসহ ভূ-অভ্যন্তরের গঠন বর্ণনা করুন।

পাঠ- ২.৩ ঃ শিলা ও খনিজ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- খনিজ ও শিলা কি তা বলতে পারবেন;
- খনিজ ও শিলার পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

কতগুলো মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হয়ে যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে তাকে খনিজ বলে। খনিজের প্রকৃত সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। তবে বলা যায় স্বাভাবিক ভাবে সৃষ্ট কেলাশিত এমন একটি সমসত্ব অজৈব পদার্থ যার সাধারণত একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক মিশ্রন এবং একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ন পারমানবিক গঠন থাকে তাই খনিজ।

ভূ-ত্বক বিভিন্ন প্রকার খনিজের সংমিশ্রনে গঠিত এবং বিভিন্ন প্রকার খনিজের মিশ্রনে শিলা গঠিত। ভূ-পৃষ্ঠে নানা প্রকার রাসায়নিক মৌলিক উপাদান একত্রে মিলিত হয়ে যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে, এগুলোই খনিজ। তবে কিছু কিছু খনিজ পদার্থ আছে যারা শুধুমাত্র একটি রাসায়নিক উপাদান দ্বারাগঠিত। যেমন : রূপা, তামা, সোনা, হীরা, গন্ধক ইত্যাদি।

কোন একটি খনিজকে তার রং, কাঠিন্য, আপেক্ষিক গুরুত্ব, স্থিতিস্থাপকতা, ফাঁটল, রাসায়নিক মিশ্রণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিনতে পারা যায়। পৃথিবীর বুকে অসংখ্য খনিজ আছে এবং এদের প্রত্যেকটির আলাদা রাসায়নিক সংমিশ্রন রয়েছে। প্রত্যেকটি খনিজ রাসায়নিক উপাদান দ্বারা এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত যে এদের দিয়ে গঠিত খনিজ পদার্থের ধর্ম উক্ত রাসায়নিক পদার্থের ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকে।

অধিকাংশ খনিজ পদার্থই দুই বা ততোধিক উপাদানের সংমিশ্রনে গঠিত। কতগুলি খনিজ পদার্থের গঠন প্রনালী সম্পূর্ন নির্দিষ্ট বা স্থির। যেমন কোয়ার্টজ।

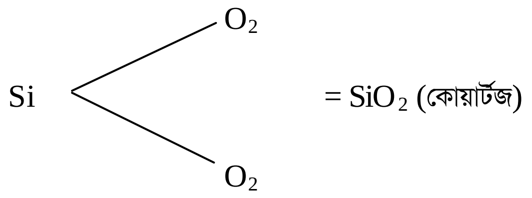

চিত্র ২.৩.১ ঃ কোয়ার্টজ এর গঠন

সিলিকনের একটি পরমানুর সঙ্গে অক্সিজেনের দুটি পরমানুর রাসায়নিক সংমিশ্রনে কোয়ার্টজ (SiO_2) এর একটি অনু গঠিত হয়। তবে বেশীর ভাগ খনিজের গঠন পরিবর্তনশীল।

প্রতিটি খনিজের একই বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম থাকে। হ্যাঁ অথবা না

খনিজের উদাহরণ

গ্র্যানাইড, ব্যাসল্ট, শ্লেট, হর্নব্লেন্ট, ফেলসপার, লাইমষ্টোন ইত্যাদি।

খনিজের প্রয়োজনীয়তা

১. মৃত্তিকার প্রাথমিক উৎস;
২. কৃষিকার্যের জন্য দরকারী পলির উৎস;
৩. খনিজ পদার্থ মৃত্তিকার উর্বরতা ও পুষ্টির ভান্ডার হিসেবে কাজ করে;
৪. বায়ুমন্ডলের গ্যাসীয় পদার্থের প্রধান উৎস;
৫. সমুদ্র, বায়ুমন্ডল ও ভূমিতে যে মুক্ত পানি আছে, তার প্রাথমিক উৎস।

শিলা ঃ ভূ-ত্বক নানা রকম পদার্থ দ্বারা তৈরী। এদের মধ্যে পাথর, নুড়ি, কাঁকর, বালি, খড়ি, কাঁদা প্রভৃতি প্রধান। এছাড়া এ সমস্ত পদার্থের মধ্যে জীবাশ্ম মিশে রয়েছে। ভূ-ত্বক গঠনকারী এ সমস্ত পদার্থগুলো নানা প্রকার খনিজের সংমিশ্রনে গঠিত। কাজেই বলা যায় যে, বিভিন্ন প্রকার খনিজ প্রাকৃতিক উপায়ে একত্রিত হয়ে যে পদার্থ গঠন করে তাকে শিলা বলে।

শিলা এক বা একাধিক খনিজের মিশ্রণ। খনিজের এই মিশ্রণ প্রকৃতিতে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট শিলা গঠনকারী প্রতিটি খনিজের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। কোন কোন শিলা একটি মাত্র খনিজ দ্বারা গঠিত হতে পারে। এক্ষেত্রে খনিজ ও শিলা একই পদার্থ। যেমন- কেলসাইট একটি খনিজ এবং শিলা হিসেবে এটি চুনাপাথর। খনিজের ধর্ম এর গঠনকারী মৌলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর শিলার ধর্ম এর গঠনকারী খনিজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ শিলা যে খনিজ দ্বারা গঠিত সে খনিজ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। যেমন- কোয়ার্টজ খনিজ গঠিত সিলিকন ও অক্সিজেন দ্বারা। আর কোয়ার্টজ খনিজ যখন শিলা গ্রাফাইট তখন তার ধর্ম কোয়ার্টজ খনিজের মত (ছক ২.৩.১)।

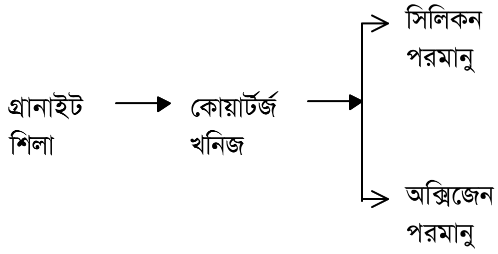

ছক ২.৩.১ ঃ শিলা ও খনিজের গঠন

শিলা গঠনকারী উপাদান কি?

শিলা ও খনিজের পার্থক্য

কতগুলো মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে মিশ্রিত হয়ে যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয় তাই-ই খনিজ। আবার কতগুলো খনিজ প্রাকৃতিক উপায়ে একত্রিত হয়ে শিলা গঠন করে। শিলা ও খনিজের পার্থক্য নিম্নরূপঃ

শিলা	খনিজ
১. শিলা বিভিন্ন খনিজের মিশ্রন।	১. খনিজ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান দ্বারা গঠিত।
২. আকার ও আয়তন অর্নিদিষ্ট।	২. অধিকাংশ খনিজ স্ফটিকাকার।
৩. সাধারনত নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংস্থিতি বা সংকেত নাই।	৩. নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংস্থিতি ও সংকেত আছে।
৪. ভৌত গুনাবলির মধ্যে সুনির্দিষ্টতা কম। ভৌত গুনাবলী যেমন : রঙ, কষ, দ্যুতি, কেলাসরূপ, প্রভৃতি।	৪. সুনির্দিষ্ট ভৌত গুনাবলী বর্তমান।
৫. শিলা কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।	৫. খনিজ সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।
৬. ইহা সহজে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না।	৬. ইহা সহজেই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহন করে।

শিলা ও খনিজের ভৌত গুনাবলী নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট?

পাঠসংক্ষেপ

এই পাঠে আমরা খনিজ ও শিলা কি এবং তাদের পার্থক্য জানবার চেষ্টা করেছি। দেখা গেছে কতগুলো মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হয়ে যে যৌগিক পদার্থ গঠন করে তাই খনিজ। আবার শিলা হচ্ছে এক বা একাধিক খনিজের মিশ্রণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। টিক (Ö) চিহ্ন দিনঃ (সময় ৫ মিনিট)

১.১. ভূ-ত্বক গঠণ করে-
ক) শিলা খ) খনিজ গ) শিলা ও খনিজ উভয় ঘ) বায়ু

১.২. খনিজ উপাদানের মিশ্রনকে বলে-
ক) শিলা খ) অনু গ) মৌল ঘ) পরমানু

১.৩. গ্রানাইট এক ধরণের-
ক) শিলা খ) খনিজ গ) অনু ঘ) পরমানু

১.৪. নিচের কোনটি খনিজ-
ক) কেলসাইট খ) চুনাপাথর গ) গ্রানাইট ঘ) সিলিকন

১.৫. শিলার উদাহরণ-
ক) সিলিকন খ) অক্সিজেন গ) গ্রানাইট ঘ) কোয়াটজ

উত্তর ঃ ১.১. গ ১.২. ক ১.৩. ক ১.৪. ক ১.৫. গ

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ (সময় ১০ মিনিট)

২.১. খনিজ কাকে বলে?
২.২. শিলা কাকে বলে?
২.৩. খনিজ গঠনকারী উপাদান কি?
২.৪. শিলা গঠনকারী উপাদান কি?
২.৫. শিলা ও খনিজের দুটি পার্থক্য বলুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিলা ও খনিজের সংজ্ঞা দিন। এদের পার্থক্য লিখুন।

পাঠ- ২.৪ ঃ খনিজের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্ম

এই পাঠ শেষে আপনি—

- খনিজের রাসায়নিক ও ভৌতধর্ম বলতে পারবেন;
- খনিজের গঠণ উপাদান বলতে পারবেন এবং
- কয়েকটি প্রধান খনিজের রাসায়নিক ও ভৌত গুণাবলী সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

রাসায়নিক ও ভৌত বৈশিষ্ট্য দুটি ভিন্ন জিনিস বা বৈশিষ্ট্যের ভিন্ন দু'টি রূপ। রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোন কিছুর যে আনবিক গঠন তাই। পদার্থের সবচাইতে ক্ষুদ্র একক পরমাণু। বিভিন্ন পরমাণুর বিভিন্ন আনুপাতিক মিশ্রনে বিভিন্ন রকম পদার্থের সৃষ্টি হয়। ভৌত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই নির্দিষ্ট আনবিক গঠনে সৃষ্ট পদার্থের বাহ্যিক রূপ যা দেখে অন্য পদার্থ থেকে আর একটি পদার্থকে সহজেই পৃথক করা যায়। এই ভৌত বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে কেলাসরূপ, দ্যুতি, বর্ণ, কষ, কাঠিন্য, চিড়, ফাঁটল, আপেক্ষিক গুরুত্ব ইত্যাদি।

খনিজের বৈশিষ্ট্য সমূহ

একটি খনিজের রাসায়নিক ও ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ এর রাসায়নিক গঠন ও আনবিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। তাই উৎস ভিন্ন হলেও একটি খনিজের যে কোন অংশের গুনাবলী একই ধরণের অন্য আরেকটি খনিজের গুনাবলীর সাথে একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হবে। যেমন আফ্রিকার কোন খনি থেকে পাওয়া লোহা আকরিক হেমাটাইট এর গুনাবলি ভারতের কোন খনি থেকে আহরিত হেমাটাইটের মতই রাসায়নিক ও ভৌত গুনাবলী সম্পন্ন হবে। তাহলে আমরা বলতে পারি খনিজ ও এর দ্বারা তৈরী শিলা যে কোন প্রাকৃতিক অবস্থায় সৃষ্টি হোকনা কেন এদের প্রকৃতি এদের আনবিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল।

একটি নির্দিষ্ট খনিজের প্রতিটি অংশের গুনাবলী এক। হ্যাঁ/না

খনিজের আনবিক গঠন

যে কোন মৌলের ক্ষুদ্রতম একক পরমাণু। এই ক্ষুদ্রতম পরমাণু দুটি মৌলের সংযুক্তিতে সহায়তা করে থাকে। একটি পরমাণুর সরলিকৃত কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর কেন্দ্রে আছে নিউক্লিয়াস (Nucleus)। নিউক্লিয়াস ধনাত্বক চার্জবাহী প্রোটন ও নিরপেক্ষ নিউট্রন নামক পদার্থ ধারণ করে আছে। এর চারদিকে ঋনাত্বক চার্জবাহী ইলেকট্রন নামক পদার্থ ঘুরছে (চিত্র ২.৪.১)। পরমানুর কেন্দ্রে ধারনকৃত প্রোটনের পারমানবিক সংখ্যা ও মৌলের নাম নির্ধারিত হয়। যেমন- ৬টি প্রোটন বিশিষ্ট সব পরমাণু কার্বন এবং ৮টি প্রোটন বিশিষ্ট সব পরমাণু অক্সিজেন।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় গ্রানাইট শিলা গঠনকারী কোয়ার্টজ (Sioz) খনিজের কথা। এখানে সিলিকন ও অক্সিজেন এদুটি পৃথক মৌল ১ঃ২ অনুপাতে আছে। সিলিকন ও অক্সিজেন রাসায়নিক ভাবে সংযুক্ত হয়ে সিলিকা-ডাই-অক্সাইড নামে খনিজ উৎপন্ন করে। এই খনিজ এর বৈশিষ্ট্য উক্ত উভয় মৌল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

দুটি ভিন্ন মৌল হতে উৎপন্ন একটি খনিজ এর বৈশিষ্ট্য ঐ মৌল দুটির ধর্ম হতে স্বতন্ত্র। (হ্যাঁ অথবা না)

নিচের ছকের মাধ্যমে গ্রানাইট শিলা গঠনকারী কোয়ার্টজ খনিজের গঠন কাঠামো দেখান হলঃ

| সিলিকন

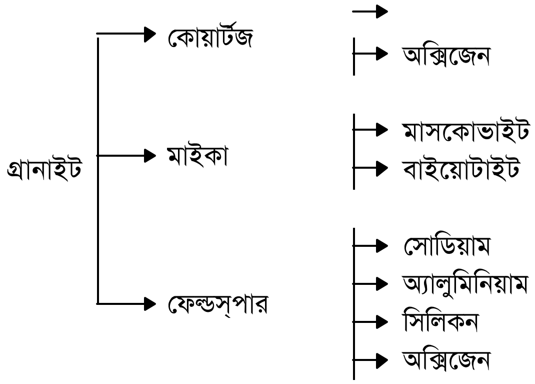

ছক ২.৪.১ ঃ গ্রানাইট শিলা গঠনকারী কোয়ার্টজ খনিজের গঠন কাঠামো

ছক ২.৪.১ ঃ সাধারণ শিলার চিত্ররূপ দেখতে পাবেন ২.৪.২ নং চিত্রে। এখানে উল্লেখ্য যে ম্যাগনেটাইট শিলার খনিজ উপাদান শুধুমাত্র তখনই দৃশ্যমান হয় যখন ঐ শিলা তীব্রভাবে চৌম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়।

চিত্র ২.৪.২ ঃ সাধারণ শিলা

কোনটি শিলা?
কোয়ার্টজ, মাইকা, ফেল্সপার, গ্রাফাইট

খনিজের ভৌত বৈশিষ্ট্য

প্রতিটি খনিজের কতগুলো ভৌত বৈশিষ্ট্য থাকে যেগুলো দিয়ে সহজে শিলা সনাক্ত করা যায়। খনিজ পদার্থের সনাক্ত করন উহার কতগুলো বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। এ বৈশিষ্ট্য গুলো হচ্ছে-

কেলাস রূপ (Crystal form)

দ্যুতি (Lustre)

বর্ণ (Colour)

কর্ষ (Streak)

কাঠিন্য (Hardness)
চিড় (Cleavage)
ফাঁটল (Fracture)

আপেক্ষিক গুরুত্ব ঃ এটি খনিজের ওজনের তুলনায় একই আয়তনের পানির ওজনের অনুপাতই ঐ খনিজের আপেক্ষিক গুরুত্ব। যেমন- কোন খনিজের ওজন সম আয়তনের পানির ওজনের চেয়ে ২ গুণ বেশী হলে উক্ত খনিজের আপেক্ষিক গুরুত্ব হবে ২।

কেলাস রূপ ঃ খনিজের গঠনকারী পরমানুর ভিতরের সুবিন্যাস্ত আয়তন প্রকাশকারী বাহ্যিক রূপ হচ্ছে কেলাস রূপ। একটি খনিজ যখন বাধাহীন ভাবে বেড়ে ওঠে তখন আলাদা আলাদা পূর্ন কেলাস রূপে প্রকাশিত হয়। অনুকূল পরিবেশে খনিজগুলো বিশেষ জ্যামিতিক আকৃতিতে কেলাসিত হয়।

খনিজের কেলাস রূপ কি?

দ্যুতি ঃ কোন খনিজের ওপর আলোর প্রতিফলনে ঐ খনিজের বাহ্যিক অবয়বকে যেমন দেখায় উহাই ঐ খনিজের দ্যুতি। খনিজের দ্যুতিকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যে সকল খনিজ দেখতে ধাতবের মত, তা যে বর্ণেরই হোক সেটা ধাতব দ্যুতি সম্পন্ন খনিজ। এছাড়া অধাতব দ্যুতিকে কাঁচিক, মুক্তাময়, রেসমী তেল-তেলে, মেটে বা অনুজ্বল, মসৃন প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–
কাঁচিক-কাঁচের মত দ্যুতি সম্পন্ন। উদাহরণ কোয়ার্টজ।

মুক্তাময়- মুক্তার মত দ্যুতি সম্পন্ন। উদাহরণ ট্যালক।
রেশমী- রেশমের ন্যায়। উদাহরণ ঃ জিপসাম।

খনিজের দ্যুতি প্রধানত কয় প্রকার ও কি কি?

বর্ণ ঃ শুধুমাত্র বর্ণের ওপর নির্ভর করে খনিজ চিহ্নিত করা উচিত নয়। এর সাথে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যর সমন্বয়ে খনিজ সনাক্ত করা উচিত। খনিজের সাথে অন্য খনিজের সামান্যতম সংমিশ্রনে অন্য রং ধারণ করতে পারে। যেমন গোলাপী, বেগুনী, সাদা, কালো।

কষ ঃ খনিজ পাউডার অবস্থায় যে বর্ণ প্রকাশ করে তাকে কষ বলে। কষ্টি পাথরের সঙ্গে খনিজ ঘষলে এ পাউডার পাওয়া যায়। ধাতব ও অধাতব দ্যুতি কষ দেখে সহজেই আলাদা করা যায়।

কষ দেখে খনিজের কি সহজেই আলাদা করা যায়?

কাঠিন্য ঃ কাঠিন্যতার মাধ্যমে খনিজের প্রতিরোধ ক্ষমতা বোঝা যায়। কাঠিন্যতার মাধ্যমে খনিজ কি পরিমাণ চাপ বা আঘাত সহ্য করতে পারে তাই বুঝায়। খনিজের কাঠিন্যতা একটি আপেক্ষিক ধর্ম। কোন খনিজের কাঠিন্য জানা থাকলে ঐ খনিজের সাথে ঘর্ষনের মাধ্যমে অজানা খনিজের কাঠিন্য জানা যায়। কাঠিন্যতা পরিমাপের একটি মাপনী আছে। এটি 'মোহ' নামক একজন বিজ্ঞানী কর্তৃক প্রদত্ত। এজন্য একে "মোহ'স কাঠিন্যতা মাপনী" বলে। এই মাপনীতে কাঠিন্যতার উচ্চক্রম অনুসারে ১০টি খনিজ ব্যবহৃত হয়। নিচে এ সমস্ত খনিজের একটি তালিকা দেয়া হল ঃ

সারণী ২.৪.১ ঃ খনিজের কাঠিন্যতা

কাঠিন্যতা	খনিজের নাম	সমকাঠিন্যতা সম্পন্ন বস্তু
১	টেলক	-
২	জিপসাম	আঙ্গুলের নখ
৩	ক্যালসাইট	তামা মুদ্রা
৪	ফ্লোরাইট	চাকু বা ব্লেড
৫	এপাটাইট	গ্লাস প্লেট
৬	অর্থক্লেজ	-
৭	কোয়ার্টজ	ষ্টীল ফাইল
৮	টোপাজ	-

কাঠিন্যতা	খনিজের নাম	সমকাঠিন্যতা সম্পন্ন বস্তু
৯	কোরানডাম	-
১০	হীরা	-

কয়েকটি খনিজের রাসায়নিক ও ভৌত বৈশিষ্ট্য

অধিকাংশ খনিজ পদার্থই দুই বা ততোধিক উপাদানের রাসায়নিক মিশ্রনে গঠিত। ভূ-পৃষ্ঠে এ পর্যন্ত মোট ১০৩টি মৌলিক উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে অর্ধেকেরও কম উপাদান বহুল পরিচিত এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু বেশীরভাগ মৌলিক উপাদানের পরিমান একেবারেই কম এবং উহারা বিশেষ ব্যবহৃত হয় না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে উল্লেখিত মৌলিক উপাদানগুলির মধ্যে মাত্র ১৫টি উপাদান দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশী অংশ গঠিত।

প্রত্যেকটি খনিজের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্ম রয়েছে। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে চিনতে পারা যায়। অসংখ্য খনিজের মধ্যে কতিপয় খনিজ এমন রয়েছে যারা পরিমাণগতভাবে ভূ-পৃষ্ঠে সবচাইতে বেশী। এ সমস্ত অতি সাধারণ খনিজ শিলা গঠণে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখে। কয়েকটি সাধারণ খনিজ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল ।

কোয়ার্টজ (Quartz) ঃ এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ। ইহা সিলিকন এবং অক্সিজেনের রাসায়নিক মিশ্রনে গঠিত একটি অক্সাইড অনেক শিলার মধ্যে পাওয়া যায়। এই জন্য সাধারণ খনিজ বলে পরিচিত। দেখতে ফিটাকারির মত, রং সাদা বা বর্ণহীন। সাবান, কাঁচ, পোর্সেলিন, রং, সিমেন্ট তৈরীতে কোয়ার্টজ ব্যবহৃত হয়।

ফেলস্পার (Felspar) ঃ এটি গ্রানাইট জাতীয় আগ্নেয় শিলার প্রধান উপাদান। বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এটাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা- অর্থক্লেজ এবং প্লোজিওক্লেজ। অর্থক্লেজ পটাশিয়াম, এ্যালুমিনিয়াম, সিলিকেট দ্বারা গঠিত। আর প্লোজিওক্লেজ সোডিয়াম, ক্যালাসিয়াম, এলুমিনিয়াম, সিলিকেট দ্বারা গঠিত। বর্ণ গাড় ধূসর।

অভ্র (Mica) ঃ এটি একটি মিশ্র সিলিকেট বিশেষ। এ্যালুমিনিয়াম, পটাশিয়াম, লৌহ অথবা ম্যাগনোশিয়াম দ্বারা গঠিত। বর্ণ অনুসারে দুই প্রকার। যথা- মাস্কোভাইট ও বায়োটাইট। সাদা মাইকাকে মাস্কোভাইট এবং কালো মাইকাকে বায়োটাইট বলে। এর কাঠিন্য কম ও হালকা। পাতলা অবস্থায় হালকা, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল মুক্তার মত দেখায়।

হর্নব্লেন্ড (Hornblende) ঃ এটা বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠিত। তার মধ্যে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ ও এলুমিনিয়াম প্রধান। কাঠিন্য মাঝারি ধরণের এবং উজ্জ্বল দীপ্তিসম্পন্ন।

পাইরক্সিন (Pyroxine) ঃ এই শ্রেণীর মধ্যে অগাইট, ইনষ্টেটাইট, হাইপায়স্থিন অন্যতম, ইহা ক্যালসিয়াম, ম্যাগনোশিয়াম, এ্যালুমিনিয়াম, লৌহ, সোডিয়াম ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত। গাঢ় সবুজ থেকে কাল রং এর হয়।

অলিভিন (Olivine) ঃ ইহা একটি লৌহ এবং ম্যাগনেসিয়ামযুক্ত সিলিকেট। রং জলপাইয়ের মত।

ক্যালসাইট (Calcite) ঃ এটার উপাদান হল ক্যালসিয়াম কার্বনেট। বর্নহীন বা সাদা হয়।

সারণি ২.৪.২ ঃ শিলা গঠনকারী খনিজ

শিলার নাম	খনিজের নাম
আগ্নেয়	ফেল্ডস্পার, মাইকা, পাইরক্সিন, অলিভিন,
পাললিক	ক্যালসাইট, কর্দম, ডলোমাইট, হেলাইট, জিপসাম, ফেলসপার।
রূপান্তরিত	ফেলসপার, পাইরক্সিন, মাইকা, গারনেট, ক্লোরাইটস

খনিজের গুরুত্ব

ভূ-ত্বক বিভিন্ন খনিজের সমন্বয়ে গঠিত। এ মিশ্রিত খনিজ উপাদানকে শিলা বলে। ভূ-ত্বক গঠনকারী এ খনিজ পদার্থ আমাদের বর্তমান সভ্যতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বেশ কিছু চাহিদা মিটিয়ে থাকে। যেমন, ভারি খনিজ (ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, প্লুটোনিয়াম) পারমানবিক চুল্লীতে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া সোনা, রুপা, তামা, দস্তা, এ্যালুমিনিয়াম, নিকেল, প্লাটিনাম, হীরা, মার্বেল, রুবী, গ্রাফাইট ইত্যাদি খনিজ পদার্থসমূহের অর্থনৈতিক ব্যবহার আছে। নিচে প্রধান প্রধান খনিজের অর্থনৈতিক ব্যবহারের একটি সারণী দেয়া হল।

শিলা গঠনকারী প্রধান খনিজসমূহ ঃ এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে দুই হাজারের বেশী খনিজ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর সবগুলো খনিজই একই পরিমাণে নেই। মাত্র দুই ডজন খনিজ পৃথিবীর প্রায় সব শিলা গঠন করেছে। এদেরকে শিলা গঠনকারী খনিজ বলা হয়ে থাকে। বেশির বাগ খনিজ গঠিত হয়েছে মাত্র ৮টি মৌল দ্বারা। নীচে ভূ-ত্বক গঠনকারী উপাদান সমুহের তালিকা প্রদান করা হল।

সারণী ২.৪.৩. ঃ ভূ-ত্বক গঠনকারী প্রধান মৌলসমূহ (শতকরা পরিমাণ দেখান হয়েছে)

ক্রমিক নং	মৌলিক উপাদান	সাংকেতিক চিহ্ন	শতকরা অংশ
১.	অক্সিজেন (Oxygen)	O_2	৪৬.৪৬
২.	সিলিকন (Silicon)	Si	২৭.৬১
৩.	এ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)	Al	৮.০৭
৪.	লৌহ (Iron)	Fe	৫.০৬
৫.	ক্যালসিয়াম (Calcium)	Ca	৩.৬৪
৬.	সোডিয়াম (Sodium)	Na	২.৭৫
৭.	পটাসিয়াম (Potasium)	K	২.৫৮
৮.	ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium)	Mg	২.০৭
৯.	টিটানিয়াম (Titanium)	Ti	০.৬২
১০.	হাইড্রোজেন (Hydrozen)	H	০.১৪
১১.	ফসফরাস (Phosphorus)	P	০.১২
১২.	ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)	Mn	০.১০
১৩.	কার্বন (Carbon)	C	০.০৯
১৪.	সালফার (Sulphur)	S	০.০৬
১৫.	ক্লোরিন (Chlorine)	Cl	০.০৫
মোট			**৯৯.৪২**

মহাদেশীয় ভূ-ত্বকের প্রায় ৯৮ শতাংশই (ওজন অনুপাতে) এ সমস্ত মৌল দ্বারা গঠিত।

সারণী অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে অক্সিজেন ও সিলিকন মৌল দুটি যৌথভাবে শতকরা ৭৫ ভাগ ওজন দখল করে আছে। বাকী মাত্র ২৫ ভাগ অন্যান্য মৌলগুলো অর্থাৎ এ্যালুমিনিয়াম, লোহা, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম দ্বারা গঠিত। এসমস্ত খনিজ উপাদান ধাতব মৌল হিসেবে পরিচিত।

শিলা গঠন কারী খনিজ কয়টি?
বেশির ভাগ খনিজ কয়টি মৌল দ্বারা গঠিত?

বিভিন্ন ধরণের শিলায় এর গঠনকারী খনিজের তারতম্য দেখা যায়। নিচে এই খনিজগুলোর তালিকা দেয়া হল।

দুইটি খনিজ এর নাম করুন যারা ৩ ধরণের শিলারই গঠন উপাদান

সারণী ২.৪.৪ ঃ প্রধান প্রধান খনিজের অর্থনৈতিক ব্যবহার

খনিজের নাম	সংকেত	অর্থনৈতিক ব্যবহার

হেমাটাইট	Fe_20_3	লোহার আকরিক
মেগনেটাইট	Fe_30_4	লোহার আকরিক
কোরানডাম	Al_20_3	জেমস্টোন, ঘর্ষণ
গেলেনা	PbS	সীসার আকরিক
স্ফেলেরাইট	ZnS	দস্তার আকরিক
পাইরাইট	FeS_2	সালফিউরিক এসিড উৎপাদন
চেলকোপাইরাইট	$CuFeS_2$	তামার আকরিক
জিপসাম	$CaSO_4\text{-}2H_20$	প্লাস্টার
এনহাইড্রাইট	CaSO4	প্লাস্টার
সোনা	Au	বাণিজ্যিক কাজ ও গহনা
তামা	Cu	তড়িৎ পরিবাহী
হীরা	C	তড়িৎ পরিবাহী
সালফার	S	সালফা জাতীয় ঔষধ, রাসায়নিক
গ্রাফাইট	C	পেনসিলের সীস, শুষ্ক লুব্রিকেন্ট
ফ্লোরোইট	CaF_2	স্টীল তৈরি, রাসায়নিক
কেলসাইট	$Calo_3$	পোর্ট ল্যান্ড সিমেন্ট
ডোলোমাইট	$CaMg(Co3)_2$	কৃষির জন্য চুন জাতীয় সার
কোয়ার্টজ	$SiO222_2$	গ্লাস তৈরির প্রধান উপাদান

ভূ-ত্বকের অজৈব খনিজ পদার্থসমূহ মানুষের ও জীবজগতের অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিচে কিছু উদাহরণ দেয়া হল-

ক. শিলা কৃষিকাজের জন্য উপযোগী মৃত্তিকা ও পলির প্রাথমিক উৎস;

খ. খনিজ পদার্থ মৃত্তিকার উর্বরতা সংরক্ষণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টির প্রধান উৎস ভান্ডার হিসেবে কাজ করে;

গ. বায়ুমন্ডলের গ্যাসীয় পদার্থের প্রধান উৎস;

ঘ. সামুদ্রিক লবণের প্রধান উৎস খনিজ;

ঙ. সমূদ্র, বায়ুমন্ডল এবং ভূমির মুক্ত পানির প্রাথমিক উৎস।

পৃথিবীতে কার্যরত বিভিন্ন ভূমিরূপ প্রক্রিয়া যেমন- ক্ষয়, পরিবহন, সঞ্চয়ন কাজ শিলা ও খনিজের ধরণ দ্বারা প্রভাবিত। খনিজ ও শিলা সম্পর্কে তাই ধারণা লাভ করা প্রয়োজন।

পাঠসংক্ষেপ

খনিজের দুটি বৈশিষ্ট্য যথা- রাসায়নিক ও ভৌত। রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোন কিছুর যে আনবিক গঠন তাই। পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক পরমাণু। বিভিন্ন পরমাণুর বিভিন্ন আনুপাতিক মিশ্রণে বিভিন্ন রকম পদার্থের সৃষ্টি হয়। পদার্থের ভৌত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই নির্দিষ্ট আনবিক গঠনে সৃষ্ট বাইরের রূপ, যা দেখে একটি পদার্থ থেকে আর একটি পদার্থকে সহজেই আলাদা করা যায়। সোনা, রূপা, দস্তা, এ্যালুমিনিয়াম, তামা, প্লাটিনিয়াম প্রভৃতি খনিজের অর্থনৈতিক ব্যবহার বহুবিধ বলে খনিজের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১.১. ভূ-পৃষ্ঠে এ পর্যন্ত মোট ১০৩টি মৌলিক উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে।

১.২. কোয়ার্টজ সিলিকন ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক মিশ্রনে গঠিত একটি অক্সাইড।

১.৩. ভূ-ত্বক বিভিন্ন খনিজের সমন্বয়ে গঠিত।

১.৪. বায়ুমন্ডলের গ্যাসীয় পদার্থের প্রধান উৎস খনিজ।

উত্তর ঃ ১.১. স ১.২. মি ১.৩. স ১.৪. স

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. খনিজ কোন ধরণের মিশ্রন?
২. খনিজের পারমাণবিক গঠন কি অত্যাবশকীয়?
৩. মোট কতটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া গেছে?
৪. কোয়ার্টজের ব্যবহার কি?
৫. ফেলস্পারের রং কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. খনিজের বৈশিষ্ট্য কয় প্রকার? খনিজের ভৌত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
২. খনিজের আনবিক গঠন কি? চারটি খনিজের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য বর্ণণা করুন।
৩. খনিজের বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি? খনিজের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ ২.৫ ঃ শিলা ঃ শ্রেণী বিভাগ, বৈশিষ্ট্য ও শিলা গঠনকারী প্রধান খনিজসমূহ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- শিলা পরিবার কি তা বলতে পারবেন;
- শিলার শ্রেণী বিভাগ বলতে পারবেন;
- শিলাগঠনকারী খনিজসমূহ সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- বিভিন্ন প্রকার শিলার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

শিলা পরিবার

বিভিন্ন ধরণের শিলাকে একত্রে শিলা পরিবার বলা যায়। মানব সমাজে আমরা যেমন একে অপরের সাথে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সমাজ গঠন করে থাকি, তেমনি বিভিন্ন ধরণের শিলা নানা ভাবে একত্রিত হয়ে বা পারস্পরিক সহাবস্থানে ভূ-ত্বক গঠন করে থাকে।

শিলা পরিবারের বৈশিষ্ট্য

- এরা পারস্পরিক সহাবস্থানের মাধ্যমে ভূ-ত্বক গঠন করে।
- এরা প্রাকৃতিক ভাবে বন্ধনে আবদ্ধ।
- বিভিন্ন প্রকার শিলার সংমিশ্রনই মৃত্তিকার উৎস।

শিলা পরিবারের বৈশিষ্ট্য গুলো কি কি?

শিলার শ্রেণীবিভাগ

ভূ-ত্বক নানা জাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত। ভূ-ত্বক গঠনকারী এসকল পদার্থকে সাধারণভাবে শিলা বলে। প্রকৃতপক্ষে ভূ-ত্বকের সকল কঠিন পদার্থই শিলা। এগুলো গ্রানাইট পাথরের মত শক্ত বা কাদার মত নরমও হতে পারে। ভূ-ত্বক নানা উপায়ে গঠিত হয়েছে বলে এতে নানা প্রকার শিলা পাওয়া যায়। শিলাকে প্রধানত: তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমনঃ

১. আগ্নেয়শিলা
২. পাললিক শিলা এবং
৩. রূপান্তরিত শিলা

আগ্নেয়শিলা (Igneous Rocks)

আদিম অবস্থায় পৃথিবী উত্তপ্ত গলিত অবস্থায় ছিল। সেখান থেকে আস্তে আস্তে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে কঠিন হয়ে যে শিলার উৎপত্তি তাকে আগ্নেয় শিলা বলে। অগ্নিময় অবস্থা থেকে এই শিলার সৃষ্টি হয় বলে একে আগ্নেয় শিলা বলা হয়। কারণ ইগনিয়াস (Igneous) শব্দের অর্থ আগুন। সকল প্রকার শিলার মধ্যে আগ্নেয়শিলা সর্ব প্রথম সৃষ্টি হওয়ায় একে প্রাথমিক শিলাও (Primary Rock) বলা হয়। ইহার মধ্যে স্তর নাই বলে একে অস্তরীভূত শিলাও (Unstratifie) বলা হয়।

আগ্নেয় শিলার উৎপত্তি কোথা থেকে?

উদাহরণ ঃ ব্যাসল্ট, গ্রানাইট, গ্যাব্রো,

চিত্র ২.৫.১ ঃ আগ্নেয়শিলা

আগ্নেয়শিলার বৈশিষ্ট্য

ক) স্তরবিহীন ঃ উত্তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে ঠান্ডা হয়ে জমাট বেঁধে এই জাতীয় শিলার সৃষ্টি হয়। তাই এদের মধ্যে কোন স্তর থাকে না।

খ) জীবাশ্ম বিহীন ঃ এত উত্তপ্ত গলিত পদার্থ থেকে আগ্নেয়শিলার উৎপত্তি যে ওখানে কোন প্রানী বা উদ্ভিদের অস্তিত্ব আশা করা যায় না। এছাড়াও কোন কোন আগ্নেয়শিলার উৎস ভূ-গর্ভের এত নীচে যে সেখানে কোন জীব ও প্রাণী থাকে না। এ কারণে এ জাতীয় শিলার মধ্যে জীবাশ্ম পাওয়া যায় না।

গ) কেলাসিত ঃ উত্তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে তাপ বিকিরণ করে এ জাতীয় শিলা তৈরী হয় বলে ক্ষেত্র বিশেষে কেলাসিত হয় বা নির্দিষ্ট আকারে দানা বাঁধে।

ঘ) অপ্রবেশ্য ঃ আগ্নেয় শিলার দানাগুলির মধ্যে কোন ছিদ্র না থাকায় এই শিলায় পানি প্রবেশ করতে পারে না। তাই আগ্নেয় শিলা অপ্রবেশ্য।

ঙ) সুদৃঢ় ও সুসংহত ঃ উত্তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে তাপ বিকিরণ করে উৎপন্ন হয় বলে এ শিলা সুদৃঢ় ও সুসংহত।

চ) প্রাচীনতম ঃ আগ্নেয়শিলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা। এই শিলা থেকে অন্যান্য শিলার উৎপত্তি হয়েছে।

আগ্নেয় শিলার বৈশিষ্ট্য কি?

আগ্নেয় শিলার বুনট, শ্রেণী বিভাগ

ভূ-অভ্যন্তরে উত্তপ্ত, ম্যাগমা শীতল ও কেলাসিত হয়ে আগ্নেয়শিলা গঠিত হয়। পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার শুরুতেই এর বাহির্ভাগে অত্যন্ত উত্তপ্ত ও গলিত অবস্থায় ছিল বলে ধারণা করা হয়। এ সমস্ত পদার্থ ধীরে ধীরে শীতল ও কেলাসিত হয়ে পৃথিবীর আদি ভূ-ত্বক সৃষ্টি করে।

আগ্নেয় শিলার প্রধান উপাদান ম্যাগমা। ম্যাগমা গুরুমন্ডলের উপরিভাগ থেকে ওপরে উঠে আসে। এই ম্যাগমা ভূ-অভ্যন্তরের গভীর তলদেশ থেকে (প্রায় ২০০ কি.মি.) ভূ-ত্বকের অভ্যন্তরেই জমাট বদ্ধ হয়। আবার কখনও বা ম্যাগমা ভূ-ত্বকের গভীর ফাঁটল বরাবর সজোরে ভূ-পৃষ্ঠে উঠে আসে।

আগ্নেয় শিলা কিভাবে সৃষ্টি হয়।

আগ্নেয়শিলার বুনট

শিলার বুনট বলতে এর গঠনকারী খনিজ উপাদানের আকার, আকৃতি, বিন্যাস বুঝায়। শিলার বুনট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শিলার উৎপত্তির সময় কি ধরণের পরিবেশ এবং প্রক্রিয়া কাজ করছে তা বুনটের বৈশিষ্ট্যে প্রতিফলিত হয়। যেমন, ম্যাগমা খুব দ্রুত শীতল ও কেলাসিত হলে মিহি বুনটের শিলা গঠণ করে। যেমন- রাইয়োলাইট। ম্যাগমা ধীরে ধীরে শীতল হলে মোটা বুনটের শিলা গঠন করে। যেমন- গ্রানাইট। আগ্নেয় শিলায় প্রধানত: ৫ ধরণের বুনট দেখা যায়। যথা-

১। কাঁচের মত দানাহীন, যেমন গ্লাস ;

২। এফানিটিক (Aphanitic) অতি সুক্ষ্ম দানা, খালি চোখে দেখা যায় না। যেমন ঃ ব্যাসল্ট, অ্যান্ডেসাইট।

৩। ফেনারেটিক (Phancritic) ক্ষুদ্র দানা, কিন্তু খালি চোখে দেখা যায়, যেমন- গ্রানাইট।

৪। পরফাইটিক (Porphytic) দুই ধরণের দানা বিশিষ্ট (বড় ও ছোট), যেমন ঃ পরফাইটিক রায়োলাইট।

৫। পাইরোক্লাষ্টিক (Pyroclastic) বৃহৎ আকৃতির দানা বিশিষ্ট আগ্নেয় শিলা। যেমন ঃ টাফ (Tuff) ও ছাই-ধুম্র।

আগ্নেয় শিলার পাঁচ ধরণের বুনটের পাঁচটি উদাহরণ দিন।

আগ্নেয়শিলার শ্রেণী বিভাগ

আগ্নেয়শিলাকে নিম্নলিখিত দুই ভাবে শ্রেণী বিন্যাস করা যায়। যথা–

১। গঠনকারী খনিজ উপাদানের উপর ভিত্তি করে আগ্নেয় শিলাকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) ফেলাপসিক ঃ অধিক পরিমাণে ফেলসার, সিলিকা মিশ্রিত থাকে বলে এই নামে পরিচিত। এরা হালকা বর্ণের হয়ে থাকে। যেমন- গ্রানাইট, রাইয়োলাইট।

খ) মেফিক ঃ এতে ম্যাগনেসিয়াম ও লোহার আধিক্য থাকে। এরা ব্যাসল্ট জাতীয়। ধুসর থেকে কালো বর্ণের হয়। যেমন- ব্যাসল্ট, গ্যাব্রো।

গ) ফেলসিক ও মেফিকের মাঝামাঝি ঃ এরা এ্যান্ডেসাইট জাতীয়। প্রধান খনিজ হল হর্নব্লেন্ড, সোডিয়াম ফেলসপার। বর্ণ গাঢ়। যেমন- ডাইয়োরাইট, অ্যান্ডেসাইট।

ঘ) উচ্চমাত্রায় মেফিক ঃ অধিক মাত্রায় লোহা ও ম্যাগনোসিয়াম থাকে। প্রধান খনিজ হল অলিভিন, পাইরাক্সিন। গাঢ় সবুজ থেকে কালো বর্ণের। যেমন- পেরিডোটাইট, কমাডোটাইট।

নিজ উপাদান ভিত্তিক আগ্নেয় শিলাগুলির গুনাগুন ও উদাহরণ দিন।

২। **উৎপত্তি ও গঠণভেদে আগ্নেয়শিলা নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা- ক) বহিজ: আগ্নেয় শিলা এবং খ) অন্তজ: আগ্নেয় শিলা**

ক) **বহিজ: আগ্নেয়শিলা ঃ** পৃথিবীর ভিতরের গলিত পদার্থ জ্বালামুখ বা ফাঁটল দিয়ে বাইরে নির্গত হয়ে ক্রমে ঠান্ডা হয়ে যে শিলা গঠিত হয় তাইই বহি:জ আগ্নেয়শিলা। যেমন- ব্যাসল্ট, পিউমিস। এই শিলা আবার দুই প্রকার। যথা–

i) **বিস্ফোরক ঃ** অগ্নুৎপাতের সময় কিছু পদার্থ প্রচন্ড বেগে বাইরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পতিত হয় এবং পরে জমাট বেঁধে শিলায় একে বিস্ফোরক আগ্নেয়শিলা বলে।

ii) **শান্ত ঃ** অগ্নুৎপাতের সময় অপেক্ষাকৃত ভারী গলিত পদার্থ ধীরে ধীরে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়ে শিলায় পরিণত একে শান্ত আগ্নেয়শিলা বলে।

খ) **অন্ত:জ আগ্নেয়শিলা -** কোন কোন সময় তরল ম্যাগমা ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছতে না পেরে পৃথিবীর অভ্যন্তরেই জমাট বেঁধে অন্ত:জ শিলা গঠন করে। একে অন্ত:জ আগ্নেয় শিলা বলে। এই শিলা আবার দুই প্রকার। যথা–

i) **পাতালিক ঃ** ভূ-পৃষ্ঠের বহু নীচে অবস্থিত এই শিলা সম্পূর্ন কেলাসিত। যেমন- গ্যাব্রো।

ii) **উপ-পাতালিক ঃ** ভূ-গর্ভস্থ ম্যাগমা উপরে আসার সময় ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি এসে জমাট বেঁধে এই শিলা গঠন করে। যেমন- ডলোরাইট।

পাঠসংক্ষেপ

ভূ-অভ্যন্তরে উত্তপ্ত ম্যাগমা শীতল ও কেলাসিত হয়ে আগ্নেয়শিলা গঠিত হয়। পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার শুরুতেই এর বর্হিবিভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত ও গলিত অবস্থায় ছিল বলে ধারণা করা হয়। আগ্নেয় শিলার প্রধান উপাদান হল ম্যাগমা। ম্যাগমা খুব দ্রুত শীতল ও কেলাসিত হয় বলে খুব মিহি বুনটের শিলা গঠন করে। আগ্নেয় শিলার শ্রেণীবিভাগ করা হয় উৎপত্তি ও গঠন ভেদের উপর এবং খনিজ পদার্থের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে।

পাঠোত্তর ময়ল্যায়ন- ২.৫

১। শূন্যস্থানগুলো পূরণ করুণ ঃ (সময় ৩ মিনিট)

১.১ প্রচন্ড বেগে যে বহি:জ আগ্নেয় শিলা পতিত হয় তাকে ______________ বলে।

১.২ মেকিক আগ্নেয় শিলার উদাহরণ হল ___________________।

১.৩ উচ্চ মাত্রার মেকিক আগ্নেয় শিলার উদাহরণ হল __________________।

উত্তর ঃ ১.১ বিষ্ফোরক ১.২ ব্যাসল্ট ১.৩ পেরিডোটাইট

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিলার বুনট বলতে কি বুঝায়?
২. আগ্নেয় শিলার কয় ধরণের বুনট দেখা যায়?
৩. আগ্নেয় শিলার বুনটসমূহ কি কি?
৪. গঠনকারী উপাদানের উপর ভিত্তি করে আগ্নেয় শিলাকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
৫. উৎপত্তি ও গঠনভেদে আগ্নেয় শিলাকে প্রধাণত কয় ভাগে ভাগ করা যায়? এগুলো কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. আগ্নেয় শিলা কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যাবলী লিখুন।
২. উৎপত্তি ও গঠন ভেদে র আগ্নেয় শিলার শ্রেণী বিভাগের বর্ণনা করুন।

পাঠ ২.৬ ঃ পাললিক শিলা - গঠন, প্রকৃতি, শ্রেণীবিন্যাস, উৎপত্তি, গুরুত্ব

এই পাঠ শেষে আপনি—

- পাললিক শিলা কি তা বলতে পারবেন;
- পাললিক শিলার উৎপত্তি, প্রকৃতি ও শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে ধারণা পাবেন এবং
- পাললিক শিলার গুরুত্ব বলতে পারবেন।

পাললিক শিলা (Sedimentary Rocks)

ভূ-পৃষ্ঠের প্রাথমিক শিলাগুলো যুগ যুগ ধরে রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ সাগর তরঙ্গ প্রভৃতির নানা প্রকার ঘাত প্রতিঘাত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং খন্ড বিখন্ড ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বালি, কাঁকর, কাদা প্রভৃতিতে পরিণত হয়। ক্ষয়িত এই অংশগুলি নদী প্রবাহ বৃষ্টির পানিধারা বায়ু প্রবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা বাহিত হয়ে বিভিন্ন সমুদ্র, হ্রদ বা অন্য কোন নিম্নভূমিতে পলিরূপে সঞ্চিত হতে থাকে। এভাবে বহু বৎসর ধরে পলি জমা হয়ে স্তরের সৃষ্টি করে। কালক্রমে উপরিভাগের বিশাল পানিরাশি ও পলিস্তরের ভয়ানক চাপে, ভূ-গর্ভের তাপে ও রাসায়নিক প্রকৃয়ায় নিম্নস্থ স্তরগুলি ক্রমশ জমাট বেঁধে শিলায় পরিণত হয়। পলি দ্বারা গঠিত হয় বলে একে পাললিক শিলা (Sedimentry Rock) বলে। আবার এই জাতীয় শিলা স্তরে স্তরে গঠিত হয় বলে একে স্তরীভূত শিলা ও (Stratified) বলে।

পাললিক শিলা তৈরীর প্রক্রিয়া কি?

পাললিক শিলার উদাহরণ

চুনাপাথর, বেলে পাথর, পাথুরিয়া কয়লা, সৈন্ধব লবন, খড়িমাটি প্রভৃতি পাললিক শিলার উদাহরণ।

চিত্র ২.৬.১ ঃ 'ঝুলন্ত তরঙ্গ চিত্র' (Climbing ripplemarked). ক্যালির্ফোনিয়ার কলোরাডো নদীর তলায় পললায়নে গঠিত পাললিক শিলা।

পাললিক শিলার বৈশিষ্ট্য

(ক) স্তরীভূত ঃ পাললিক শিলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এরা স্তরীভূত অর্থাৎ এরা স্তরে স্তরে অবস্থান করে। তাই একে স্তরীভূত শিলাও বলে। এই স্তরগুলো সাধারণত আনুভূমিকভাবে সজ্জিত থাকে। এই স্তর স্থুল কিংবা সুক্ষ্ণ হতে পারে।

(খ) জীবাশ্মবিশিষ্ট ঃ পাললিক শিলাস্তরে জীবাশ্মের উপস্থিতি এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে সকল জীব এই শিলাঞ্চলে বাস করে তাদের মৃতদেহ কালক্রমে পলির নীচে চাপা পড়ে। এর ফলে উহাদের দেহের কঠিন অংশ প্রস্তরীভূত হয়ে জীবাশ্মে পরিণত হয়। তাই পাললিক শিলা জীবাশ্ম বিশিষ্ট।

(গ) অকেলাসিত ঃ ইহা অকেলাসিত (Non-crystalline) শিলা। কারণ ইহা কখনও উত্তপ্ত অবস্থা হতে শীতল হয়ে সৃষ্টি হয় না।

(ঘ) তরঙ্গচিহ্ন ঃ ইহা তরঙ্গ চিহ্নযুক্ত শিলা। জলভাগের তলদেশে এই জাতীয় শিলার সৃষ্টি হয় বলে ইহার মধ্যে তরঙ্গচিহ্ন (Ripple marks) বর্তমান থাকে। আবার বায়ু দ্বারা গঠিত পাললিক শিলায়ও বাতাসের দ্বারা তরঙ্গ চিহ্নের সৃষ্টি হয়।

(ঙ) কোমলতা ঃ আগ্নেয় শিলার ভগ্নাংশ সঞ্চিত হয়ে পাললিক শিলার সৃষ্টি হয় বলে এই শিলা অন্য শিলা থেকে অপেক্ষাকৃত কোমল থাকে।

পাললিক শিলায় জীবাশ্ম থাকে না। হ্যাঁ অথবা না।

ভূ-পৃষ্ঠের প্রাথমিক শিলাগুলি ক্রমে রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ, প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নদী, বায়ুপ্রবাহ, হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা বাহিত হয়ে সমুদ্র, হ্রদ বা কোন নিম্নভূমিতে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে থাকে। এভাবে সঞ্চিত শিলাসমূহ উপরের স্তরের এবং ভূ-গর্ভের চাপে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জমাট বেঁধে যে শিলার সৃষ্টি হয় তাকে পাললিক শিলা বলে। পলি দ্বারা গঠিত বলে একে পাললিক শিলা বলে।

পাললিক শিলার প্রকৃতি

পলি সুদৃঢ় বা জমাটবদ্ধ হয়ে যে শিলা গঠন করে তাকেই পাললিক শিলা বলে। পলি পাললিক শিলার বিশেষ উপাদান। এটি বিভিন্ন পর্যায়ের সংমিশ্রণে হতে পারে। যেমন-

১. অন্য শিলা বা খনিজের টুকরা, যেমন- নদীবাহিত নুড়ি।
২. রাসায়নিক অব:ক্ষেপন, যেমন- লবন, চুন ইত্যাদি।
৩. জৈব পদার্থ, যেমন- প্রবাল, জলজ উদ্ভিদ।
৪. এ সমস্ত পদার্থ সবই পলি দ্বারা গঠিত এবং পাললিক শিলায় পরিণত হতে পারে।
৫. পাললিক শিলার পুরানো পলির বয়স নিম্ন স্তরে বেশী এবং উপরের দিকের স্তরে কমতে থাকে।

ভালভাবে লক্ষ্য করলে স্তরগুলোতে দেখা যায়–

১. পাললিক শিলা বিভিন্ন স্তরে সজ্জিত;
২. প্রতিটি স্তর কি পরিবেশে গঠিত তা প্রতিফলিত হয়;
৩. প্রতিটি স্তরের পলি ভিন্নধর্মী।

পাললিক শিলা স্তরে সুদূর অতীতকালের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষ জলবায়ু, ক্ষয় প্রক্রিয়া এবং প্রাচীন ভূমিরূপের চিহ্ন সংরক্ষিত থাকে, যা জীবাশ্ম নামে পরিচিত। এ সমস্ত জীবাশ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতের প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

পাললিক শিলার স্তরগুলিতে কি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়?

পাললিক শিলার শ্রেণী বিভাগ

পাললিক শিলা গঠনকারী উপাদানের আকৃতি, আকার এবং গঠণগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গঠিত পাললিক শিলা, যেমন- বেলেপাথর
২. রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠিত পাললিক শিলা; যেমন- চুনাপাথর
৩. জৈবিক উপায়ে গঠিত পাললিক শিলা।

৪. **যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গঠিত পাললিক শিলা** ঃ এই পলি দুই ধরণের হতে পারে। যেমন- আগ্নেয় শিলার লাভাজাত এবং পূর্ববর্তী পাললিক বা রূপান্তরিত শিলার ক্ষয়িতচূর্ন। এ জাতীয় পলিসমূহের আকার ও শিলা গঠনকারী খনিজে অনেক তারতম্য লক্ষ্য করা যার।

৫. **রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠিত পাললিক শিলা** ঃ রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট পলি অবক্ষেপ থেকে এ শিলার উদ্ভব হয়। এ প্রক্রিয়ায় পানিতে দ্রবিভূত অবস্থায় থাকা পদার্থসমূহ বিভিন্ন অজৈব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরাসরি তলায় পতিত হয় এবং অবশেষে জমাটবদ্ধ হয়। যেমন কোথাও আটকে পড়া পানি বাষ্পীভূত হলে এর সাথে দ্রবিভূত লবন থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে বাষ্পায়ন একটি অজৈব প্রক্রিয়া এবং থিতানো লবনকে পলি হিসেবে ধরা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পানিতে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রাণীর দেহাবশেষ জৈব পলি হিসেবে জমা হয় এবং শেষে জমাটবদ্ধ হয়ে রাসায়নিক অবক্ষেপন পাললিক শিলায় রূপ নেয়। যেমন- চুনাপাথর, ক্যালসাইট, ডোলোমাইট, জিপসাম ইত্যাদি।

সারণি ২.৬.১ ঃ যান্ত্রিক প্রক্রিয়াজাত পলির শ্রেণী বিভাগ

পলি	পলির নাম	আকার মি: মি:	শিলা
গ্রাবেল	বড় পাথর	২৫৬	
	মাঝারি পাথর	৬৪	
	নুড়ি পাথর	৪	কংগ্লোমারেট
	পাথুরে দানা/কুঁচি	২	
	অত্যন্ত মোটা বালি	১	
বালি	মোটা বালি	০.৫	
	মধ্যম বালি	০২৫	বেলেপাথর
	মিহি বালি	০.১২৫	
	অত্যন্ত মিহি বালি	০.৬২৫	
	সিল্ট		পলিপাথর
কর্দম	কাদা	০.০০৩১	শেল

সারণি ২.৬.২ ঃ রাসায়নিক অবক্ষেপ জনিত ও জৈব পলিজাত খনিজ উপাদান ও শিলা

পলির ধরণ	প্রধান খনিজ	উপাদন	শিলা
রাসায়নিক	ক্যালসাইট	ক্যালসিয়াম কার্বনেট	চুনাপাথর
অবক্ষেপন জনিত পলি	ডলোমাইট	ক্যালসিয়াম	ডলোমাইট
		ম্যাগনেসিয়াম	
		কার্বনেট	
	জিপসাম	হাইড্রাস-ক্যালসিয়াম	জিপসাম
		সালফেট	
	হেলাইট	সোডিয়াম ক্লোরাইড	পাথুরে লবন
জৈব পলি	চার্ট	সিলিকনডাই অক্সাইড	ডায়াটম
	চুন	ক্যালসিয়াম কার্বনেট	চুনাপাথর, চক- কোকিনা
	উদ্ভিজ পদার্থ	কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন	কয়লা

৩। জৈব পলি (Organic Sediments) ঃ উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহাবশেষ জাত পলি থেকে এ শিলার উৎপত্তি হয়। চুনাপাথর এ জাতীয় পললিক শিলার উদাহরণ। জলজ পরিবেশে অতীতে যে গাছ পালা ছিল তা ভূ-প্রাকৃতিক কারণে ভূ-অভ্যন্তরে চাপা পড়ে যায় এবং ওপরের পলির প্রচন্ড চাপে এর পরিবর্তন হয় এবং কালক্রমে কয়লায় পরিণত হয়। বাংলাদেশের জামালগঞ্জের কয়লা এবং গোপালগঞ্জের পিট কয়লা এ জাতীয় শিলার উদাহরণ।

নতুন শব্দ ঃ বাষ্পায়ন, থিতানো দেহাবশেষ।

পাললিক শিলার উৎপত্তি (Origin of Sedimentary Rocks)

ভূ-পৃষ্ঠে ক্রিয়ারত বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াই পাললিক শিলার উৎপত্তির জন্য দায়ী। যে সমস্ত প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সেগুলো নিম্নরূপঃ

১. **বিচূর্ণীভবন (Weathering)** ঃ সৌরতাপ যে প্রক্রিয়ায় ভূ-ত্বকের উন্মুক্ত শিলার উপর কাজ করে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ বা রাসায়নিকভাবে গলিয়ে দেয় তাকেই বিচূর্ণীভবন বলে। বিচূর্ণীত শিলা পানিপ্রবাহ, বায়ু, হিমবাহ ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে অন্যত্র সঞ্চিত হয়।

২. **পরিবহন (Transportation)** ঃ বর্ষায় নদীর অববাহিকা অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এর ফলে শিলা ক্ষয়ে বিপুল পরিমাণে পলির সৃষ্টি হয়। আবার বিচূর্নী ভবন প্রক্রিয়ায় ক্ষয় প্রাপ্ত নদীর এক পাড়ের পলি পানির স্রোতে অন্য পাড়ে সঞ্চিত হয়। নদীর স্রোতের সাহায্যে পরিবাহিত পলি বিভিন্ন স্থানে সঞ্চিত হয় এবং পাললিক শিলা গঠিত হয়।

চিত্র ২.৬.২ ঃ পাললিক পরিবেশ

৩. **সঞ্চয়ন (Deposition)** ঃ পলি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া পাললিক শিলার গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম। পলি বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক, রাসায়নিক ও জৈব পরিবেশে স্থল ও জলভাগে সঞ্চিত হয়। এ সমস্ত পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্থানে সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পাললিক শিলার ভূমি গড়ে ওঠে। যেমন, পাহাড়ের পাদদেশে পলল পাখা, নদীর মাঝে চর, প্লাবনভূমি, সমুদ্র মোহনার দ্বীপ, উপকূলীয় সমভূমি ও বালিয়াড়ি ইত্যাদি।

চিত্র ২.৬.৩ ঃ পলল পাখা, চর, সমুদ্র মোহনায় দ্বীপ

৪. **সুদৃঢ়করণ ও জোড়ন (Compaction and Cementation)** ঃ সুদৃঢ়করণ প্রক্রিয়ায় আলগা ও অসংগঠিত পলিকনাসমূহ ওপরে সঞ্চিত পলির ওজনের চাপে সুসংহত এবং পলি কণার ফাঁকে আটকে পড়া পানি ধীরে ধীরে বের হয়ে যায়। জোড়ন প্রক্রিয়ায় চুঁয়ানো পানির মাধ্যমে পলি কণার ফাঁকে চুণ সিলিকা, লোহা-অক্সাইড কণা সঞ্চিত হয়ে ফাঁকা জায়গা ভরাট করে এবং কণাসমূহ দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়। বেশীরভাগ পাললিক শিলা গঠনের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া আলাদাভাবে কাজ করে, তবে কখনও উভয় প্রক্রিয়া একত্রেও শিলা গঠন সম্পন্ন করে থাকে।

নতুন শব্দ ঃ পলল পাখা, প্লাবনভূমি, বালিয়াড়ি।

পাললিক শিলার গুরুত্ব

পাললিক শিলা আমাদের শিল্প, সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নে একটি নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। আদি মানব জাতি অস্তিত্বের জন্য পাললিক শিলা থেকে প্রাপ্ত উপাদান দ্বারা বিভিন্ন হাতিয়ার তৈরী করেছে। বর্তমান সভ্যতার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু খনিজ পদার্থ পাললিক শিলা থেকে পাওয়া যায়। যেমন- কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ও প্রেট্রোলিয়াম। তা ছাড়া দালান-ইমারত, রাস্তা-ঘাট, পুল-ব্রীজ ইত্যাদি নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত গ্রাভেল, ইট, বালি, সিমেন্ট সবই আসে পাললিক শিলা থেকে। কোয়ার্টজ বালি দ্বারা গ্লাস শিট তৈরী করা হয়। শিলা, দস্তা, লোহা এ শিলায় পাওয়া যায় যা বহুবিধ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চুনাপাথর দিয়ে গ্রীক ও রোমানরা ভাস্কর্য তৈরী করেছে যা এখনও দর্শনীয় বস্তু হিসাবে স্বীকৃত।

পাললিক শিলা কি কি কাজে লাগে?

পাঠসংক্ষেপ

ভূ-পৃষ্ঠের প্রাথমিক শিলাগুলি ক্রমে রৌদ্র, বৃষ্টি, তাপ, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নদী, বায়ু প্রবাহ হিমপ্রবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা বাহিত হয়ে সমূদ্র, হ্রদ বা কোন নিম্নভূমিতে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হতে থাকে। এভাবে সঞ্চিত শিলাসমূহ উপরের স্তরের চাপে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জমাট বেঁধে যে শিলার সৃষ্টি হয় তাকে পাললিক শিলা বলে। পাললিক শিলার উৎপত্তির মধ্যেই এর গঠন ও প্রকৃতি এবং শ্রেণীবিভাগ বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক দিন–

১.১ পাললিক শিলা-
i) সম্পূর্ন শিলা ii) খনিজের টুকরা iii) কোনটি নয়।

১.২ পাললিক শিলা-
i) স্তরিভূত ii) দানাদার iii) শীটের ন্যায়

১.৩ পাললিক শিলায়-
i) জীবাশ্ম পাওয়া যায় ii) তেল পাওয়া যায় iii) কয়লা পাওয়া যায়।

১.৪ পাললিক শিলা উৎপত্তি হয়-
i) বিচুর্নীভবনে ii) কেলাসনে iii) বাষ্পায়নের মাধ্যমে

উত্তর ঃ ১.১ ii) খনিজের টুকরা ১.২ ii) স্তরিভূত ১.৩ i) জীবাশ্ম ১.৪ i) বিচুর্নীভবনে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ (সময় ৫×২=১০ মিনিট)

১. পাললিক শিলার স্তর লক্ষ্য করলে কি দেখা যায়?
২. যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সঞ্চিত পলি কত প্রকার?
৩. রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সঞ্চিত পলির উদ্ভব কি থেকে?
৪. জৈব পলির উৎপত্তি হয় কোথা থেকে?
৫. ভূ-পৃষ্ঠে ক্রিয়ারত যে সকল প্রক্রিয়া পাললিক শিলা উৎপত্তির জন্য দায়ী সেগুলো কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পাললিক শিলা কাকে বলে? পাললিক শিলার প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ করুন।
২. পাললিক শিলার উৎপত্তি ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. পাললিক শিলার বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করুন।

পাঠ ২.৭ ঃ রূপান্তরিত শিলা-উৎপত্তি, রূপান্তর প্রক্রিয়া, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব

এই পাঠ শেষে আপনি—

- রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
- রূপান্তরিত শিলার গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- রূপান্তরিত শিলার বন্টন দেখাতে পারবেন;
- রূপান্তরিত শিলার রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

রূপান্তরিত শিলা (Metamorphic Rocks)

আগ্নেয় এবং পাললিক এই উভয় প্রকার শিলা অত্যধিক তাপ ও চাপে পরিবর্তিত হয়ে নুতন এক প্রকার শিলায় পরিণত হয়। এই শিলাকে রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত শিলা বলে। ভূ-আন্দোলন, অগ্ন্যুৎপাত ভূমিকম্পের সময় উর্ধ্বস্তরের চাপে, রাসায়নিক ক্রিয়ায় কিংবা ভূ-গর্ভস্থ চাপের প্রভাবে মাঝে মাঝে আগ্নেয়শিলা ও পাললিক শিলা রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয়।

উদাহরণ ঃ চুনাপাথর (limestone) পরিবর্তিত হয়ে মার্বেল (marble)
বেলেপাথর (sandstone) কোয়ার্টজাইটে (Quartgite)
কাদা (clay) স্লেটে (slate)
গ্রানাইট (granite) নীসে (gneiss)
কয়লা (coal) গ্রাফাইটে (Graphite) পরিণত হয়।

আগ্নেয় অথবা পাললিক শিলা তাপ, চাপ এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এর খনিজ উপাদান ও বুনটের পরিবর্তন হয়ে যে শিলার সৃষ্টি হয় তাকে রূপান্তরিত শিলা বলে এবং যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত শিলার সৃষ্টি হয় তাকে রূপান্তরায়ন (Metamorphism) বলে।

রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্য

(ক) কেলাসিত ঃ তাপ ও চাপে আগ্নেয় ও পাললিক শিলার পরিবর্তন হয়ে রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয় বলে উহা সাধারণত কেলাসিত।

(খ) কাঠিন্য ঃ আগ্নেয় ও পাললিক শিলা তাপ ও চাপে পরিবর্তিত হয়ে রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয় বলে এর কাঠিন্যতা বৃদ্ধি পায়। ফলে অন্যান্য শিলার তুলনায় রূপান্তরিত শিলা বেশি শক্ত ও মজবুত হয়।

(গ) জীবাশ্মবিহীন ঃ ইহা জীবাশ্মবিহীন শিলা। আগ্নেয়জাত শিলা থেকে রূপান্তরিত শিলার সৃষ্টি হলে জীবাশ্মের কোন প্রশ্নই ওঠেনা। তবে পাললিক শিলা অতিরিক্ত তাপ ও চাপে রূপান্তরিত হবার সময় উহার মধ্যকার জীশ্মগুলির অস্তিত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিলুপ্ত হয়।

(ঘ) সমান্তরাল গঠন ঃ সমান্তরাল গঠন এই শিলার একটি বৈশিষ্ট্য। কারণ ইহার উপাদানগুলি সাধারণত সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। এই সমান্তরাল অবস্থান আনুভূমিক, তির্যক বা বক্র যে কোন ভাবেই হতে পারে।

(ঙ) তরঙ্গ চিত্র ঃ তাপ ও চাপে এই জাতীয় শিলার সৃষ্টি হয় বলে এতে তরঙ্গ চিহ্ন (Ripplemarks) থাকে না।

রূপান্তরিত শিলার উৎস কি?

নতুন শব্দ ঃ পীড়ন, শ্লেট, পিট, সি।

শিলার এ রূপান্তর মূলত: ভূ-ত্বকের গভীর তলদেশে (প্রায় ২০ কি. মি. অভ্যান্তরে) তিন ধরণের পরিবেশে সংঘটিত হয়।

ক. ভূ-ত্বকের শিলা যেখানে ম্যাগমার সংস্পর্শে এসেছে
খ. ভূ-ত্বকের অভ্যন্তরে যেখানে পর্বত গঠন প্রক্রিয়া সক্রিয় ছিল এবং
গ. ভূ-ত্বকের গভীরে চ্যুতি বরাবর।

শিলা রূপান্তরায়নের সময় যে দিকে চাপ কম থাকে সেদিকে নতুন খনিজ সৃষ্টি হয়। ফলে একটি সমতল শিলা কাঠামো (Plane rock structure) তৈরী হয় যা পত্রায়ন (Foliation) নামে পরিচিত। রূপান্তরিত শিলা সাধারণত কঠিন ও শক্ত এবং উচ্চ আপেক্ষিক ঘনত্ব সম্পন্ন। তাছাড়া, অতি চাপে সৃষ্টি হওয়ার কারণে শিলার ভিতর কোন ফাঁকা স্থান থাকে না।

রূপান্তরিত শিলার গুরুত্ব ও বন্টন

রূপান্তরিত শিলা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ন কারণ এটি আগ্নেয়াশিলার সঙ্গে একত্রে ভূ-ত্বকের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ গঠন করেছে। ভূ-ত্বাত্ত্বিক সময় ব্যাপী মহাদেশের যে সঞ্চারণ এবং উত্থান-পতন হয়েছে এ শিলা থেকে তা জানা যায়। এ শিলা সুদূর অতীত কালের প্লেট সঞ্চারণের স্বাক্ষী বহন করে। রূপান্তরিত শিলা বহু মূল্যবান খনিজ পদার্থ ধারণ করে থাকে। যেমন- মার্বেল পাথর, গার্নেট, শ্লেট ইত্যাদি। স্থালভাগের উন্মুক্ত পুরোনো শিল্ড সমূহের (যেমন- কানাডীর সিল্ড) ব্যাপক এলাকা জুড়ে রূপান্তরিত শিলা দেখা যায় (নিচের চিত্র দেখুন)। তাছাড়া, স্থির প্লাটফরম (Stable Plat Form) সমূহের ওপরের পাললিক শিলার তলদেশে গভীর কূপ খনন করে জানা গেছে যে এ স্তরটি রূপান্তরিত শিলায় গঠিত। ক্ষয়প্রাপ্ত পর্বতের তলদেশে এ শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে।

চিত্র ২.৭.১. ঃ রূপান্তরিত শিলার বন্টন-পুরোনো শিল্ড এলাকা

রূপান্তরিত শিলা কোন কোন খনিজ পদার্থ ধারণ করে?

রূপান্তরিত শিলার রূপান্তর প্রক্রিয়া

(Metamorphic Processes)

শিলার রূপান্তরায়নে তাপ, চাপ ও রাসায়নিক ক্রিয়া প্রধান ভূমিকা রাখে ।

তাপ ঃ শিলার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে খনিজ কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় পরিবর্তন হতে শুরু করে। এ অবস্থায় শিলার ভিতর তরলের পরিমাণ বাড়তে থাকে। আরও তাপ বৃদ্ধি পেলে তরলের পরিমাণও বাড়ে এবং সেই সাথে রাসায়নিক ক্রিয়াও ত্বরান্বিত হয়। এ অবস্থায় স্ফটিকের (Crystal) আদি গঠন কাঠামো ভেঙে যায় এবং নতুন করে সম্পূর্ন ভিন্নভাবে তা সংঘটিত হতে থাকে। এ ভাবেই নতুন খনিজের সৃষ্টি হয়।

চাপ ঃ ভূ-পৃষ্ঠস্থ শিলার ভারে এর তলদেশের শিলার চাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে শিলার খনিজ সমূহ সংকুচিত হয়। এ অবস্থায় খনিজ আবার কেলাসিত হয় এবং আরও ঘনসন্নিবেসিত পরমাণু কাঠামো বিশিষ্ট্য নতুন খনিজ সৃষ্টি হয়।

রাসায়নিক ক্রিয়া ঃ রাসায়নিক রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নিম্ন তাপমাত্রা সম্পন্ন খনিজসমূহ গলতে শুরু করে। এ অবস্থায় পরমাণু সহজেই এ সমস্ত তরলের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হতে পারে। যদিও শিলার বেশীর ভাগ অংশই কঠিন অবস্থায় থাকে,

অধিকতর তাপ ও চাপ-এর কারণে খনিজের বহু পরমাণু কেলাস কাঠামো থেকে মুক্ত হয় এবং সমস্ত পরমাণু খনিজ কণায় তরলের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। পরমাণুর এ স্থানান্তর প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলতে থাকে। এ অবস্থায় পুরোনো কেলাস কাঠামো ভেঙে নতুন কেলাস কাঠামো গঠিত হয়। এ ভাবেই খনিজের রূপান্তর কাজ সম্পন্ন হয়।

পাঠসংক্ষেপ

আগ্নেয় অথবা পাললিক শিলা তাপ, চাপ ও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এর খনিজ উপাদান ও বুনটের পরিবর্তন হয়ে যে শিলার সৃষ্টি হয় তাকে রূপান্তরিত শিলা বলে। যে ক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত শিলার সৃষ্টি হয় তাকে রূপান্তরায়ন বলে। রূপান্তরিত শিলা শক্ত, মজবুত এবং সমতল হয়। মার্বেল পাথর, শ্লেট বা গার্নেট হল রূপান্তরিত শিলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। নিচের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিন–

১.১ তাপ, চাপ, রাসায়নিক ক্রিয়ায় পরিবর্তীত হয়-
i) আগ্নেয় শিলা ii) পাললিক শিলা iii) সবগুলি

১.২ রূপান্তরিত শিলা গঠন প্রক্রিয়াকে বলে–
i) কেলসিফিকেশান ii) সেডিমেন্টেশান iii) মেটামরফিজম

১.৩ রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্য হল–
i) শক্ত, মজবুত, পাতলা ii) হালকা, কর্দমাকার iii) শুষ্ক, দানাদার

১.৪ ভূ-ত্বকের কত শতাংশ রূপান্তরিক্ত শিলা?
i) ৪৫% ii) ৬৫% iii) ৮৫%

উত্তর ঃ ১.১) iii ১.২) iii ১.৩) i ১.৪) iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ (২×২=৪ মিনিট)

১. রূপান্তরিত শিলার রূপান্তরের পরিবেশ কয় ধরণের।
২. রূপান্তরিত শিলার রূপান্তরে কি কি প্রধান ভূমিকা রাখে।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রূপান্তরিত শিলা কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্য কি? রূপান্তরিত শিলার গুরুত্ব ও বন্টন বর্ণনা করুন।
২. কি প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত শিলা গঠিত হয় তার বিষদ বিবরণ দিন।
৩. রূপান্তরিত শিলার রূপান্তর প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিন।

ইউনিট ৩

ভূ-আলোড়ন (DIASTROPHISM)

পাঠ- ৩.১ ঃ ভূ-আলোড়নকারী শক্তি

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভূ-আলোড়ন শক্তির উৎস বলতে পারবেন ;
- ভূ-আলোড়ন শক্তির ভাগ সমূহ সম্পর্কে ধারণা পাবেন এবং
- এই শক্তি গুলো কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রচন্ড তাপ ও চাপের ফলে কোন কোন সময় ভূ-অভ্যন্তরে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয়। এর ফলে ভূ-অভ্যন্তরে প্রবল শক্তির উদ্ভব হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে উদ্ভুত শক্তি ভূ-ত্বককে বা ভূ-পৃষ্ঠে আঞ্চলিক বা মহাদেশীয় ভূ-গঠন কাঠামোর যে পরিবর্তন ঘটায় তাকে ভূ-আলোড়ন (Tectonic Movement) বলে। ভূ-আলোড়ন জনিত শক্তির অন্যতম উৎস ভূ-অভ্যন্তরস্থ তাপ। এই শক্তি ধীর ও মৃদুভাবে বিস্তৃত এলাকা ব্যাপী অথবা দ্রুত ও সজোরে সীমিত এলাকার ভূ-গঠন কাঠামোর পরিবর্তন ঘটায়। ভূ-আলোড়নজনিত শক্তি যে সমস্ত প্রক্রিয়ায় ভূ-গঠন কাঠামোর পরিবর্তন ঘটায় তার একটি ছক নীচে দেয়া হল ঃ

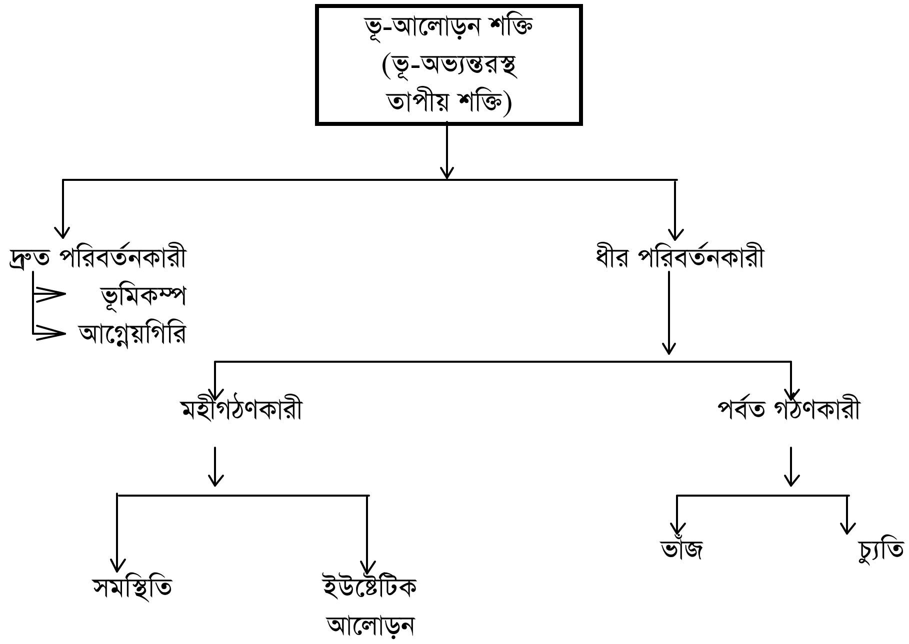

ছক ঃ ৩.১.১ ভূ-আলোড়নজনিত শক্তি ও প্রক্রিয়াসমূহ

ছক অনুযায়ী এই ভূ-আলোড়নজনিত শক্তি প্রধানত: দুই ভাগে বিভক্ত ঃ

(ক) দ্রুত পরিবর্তনকারী শক্তি
(খ) ধীর পরিবর্তনকারী শক্তি

(ক) দ্রুত পরিবর্তনকারী শক্তি ঃ এই শক্তির আওতাভূক্ত ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে ইউনিট ৪ ও ইউনিট ৫ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ভূ-কম্পন, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত ইত্যাদি দ্রুত পরিবর্তনকারী শক্তি। এই শক্তিসমূহ ভূ-ত্বকের ধীর পরিবর্তনের পটভূমি তৈরী করে। দ্রুত পরিবর্তনকারী শক্তির ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায়, প্রাকৃতিক

কারণে পৃথিবীর কঠিন ভূ-ত্বক সময়ে সময়ে ক্ষণিকের জন্য হঠাৎ কেঁপে ওঠে। এই কম্পনের ফলে ভূ-ত্বকের গঠনে অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তন আসে। কোথাও কোথাও শিলারাশি ধ্বসে পড়ে ভূ-ত্বকের পরিবর্তন ঘটায়। বিশেষভাবে ভূ-ত্বকে চ্যুতি গঠনে কাজ করে। এছাড়া পর্বত গঠণকারী এলাকা সমূহে ভূ-কম্পন ও আগ্নেয়গিরি উভয় প্রক্রিয়া সক্রিয় দেখা যায়।

দ্রুত পরিবর্তনকারী শক্তির বৈশিষ্ট্য

(ক) প্রাকৃতিক কারণবশত: হয়ে থাকে।
(খ) হঠাৎ অল্প সময়ে ভূ-ত্বকে ব্যাপক পরিবর্তন আনে ।
(গ) দ্রুত পরিবর্তনকারী ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরি উভয় প্রক্রিয়াই ভূ-ত্বকের তলদেশে শিলার গঠণে বিকৃতি ঘটায়।
(ঘ) ভূ-পৃষ্ঠে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিরূপ তৈরী করে।
(ঙ) দ্রুত পরিবর্তনকারী শক্তি ধীর পরিবর্তনের পটভূমি তৈরী করে।

উদাহরণ

i) ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট ভূ-অভ্যন্তরস্থ গঠন বিকৃতি ঃ শিলা ভাঁজ, চ্যুতি।
ii) আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে সৃষ্ট ভূ-অভ্যন্তরস্থ শিলাস্তূপ ঃ ব্যাথোলিথ, ল্যাকোলিথ, ডাইক ও সিল অন্যতম।
iii) ভূ-পৃষ্ঠস্থ আগ্নেয়জাত ভূমিরূপের মধ্যে আগ্নেয় পর্বত ও লাভা প্রবাহ অন্যতম।

ধীর পরিবর্তনকারী শক্তি ও দ্রুত পরিবর্তনকারী শক্তির উদাহরণ দিন।

খ) **ধীর পরিবর্তনকারী শক্তি ঃ** ভূ-ত্বকের পরিবর্তনে ধীর পরিবর্তনকারী শক্তি সমূহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় (i) পর্বত গঠনকারী শক্তি এবং (ii) মহাদেশ গঠনকারী শক্তি।

(i) পর্বতগঠনকারী শক্তি ঃ পর্বত গঠনকারী শক্তি সাধারণত শিলা ভাঁজ ও চ্যুতি এই দুই ভাবে প্রকাশিত হয়। শিলা ভাঁজ ও চ্যুতি সম্পর্কে ইউনিট ৩ এর পাঠ ২ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখন ভাঁজ ও চ্যুতির সাথে সম্পর্কযুক্ত ভূ-গঠন প্লেট সম্পর্কে আগে জানা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন অশ্মমন্ডল বা শিলামন্ডল অনেকগুলো খন্ডে বিভক্ত। এগুলো এক একটি প্লেট নামে পরিচিত (চিত্র - ৩.১.১)।

এগুলো হ'ল

১. উত্তর আমেরিকান প্লেট
২. দক্ষিণ আমেরিকান প্লেট
৩. আফ্রিকান প্লেট
৪. ইউরেশিয়ান প্লেট
৫. ভারত অষ্ট্রেলিয়া প্লেট
৬. প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট
৭. এন্টার্কটিক প্লেট।

চিত্র ৩.১.১ ঃ ভূ-গঠন প্লেটসমূহ

এ সমস্ত প্লেট ভূ-ত্বক ও গুরুমন্ডলের উর্ধ্বাংশ দ্বারা গঠিত। পৃথিবীকে প্রধানত ৭টি প্লেটে ভাগ করা যায়। এই সমস্ত প্লেট সমূহ গতিশীল অবস্থায় আছে। ভূ-অভ্যন্তরস্থ আঁঠালো ম্যাগমার ওপর এগুলো মৃদু ভাসমান।

পর্বত গঠন শক্তি সম্পর্কিত মতবাদ

ভূ-আলোড়ন হতে সৃষ্ট শক্তি কি প্রক্রিয়ায় পর্বত গঠনে কাজ করে এ সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মতবাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন বিজ্ঞানী। তবে তার বেশীর ভাগই গ্রহণযোগ্য হয়নি জোরাল যুক্তি ও প্রমাণের অভাবে। বর্তমানে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতবাদটি হচ্ছে প্লেট সঞ্চারণ মতবাদ (Plate Tectonic Theory)। প্লেট সঞ্চারণ মতবাদটি চালু হয় ১৯৬০-৭০ দশকে। প্লেট সঞ্চারণ মতে বলা হয়, ভূ-গঠনকারী প্লেট সমূহকে ভূ-অভ্যন্তরের তাপজনিত পরিচলন স্রোত শক্তি **প্লাস্টিকের** এসথেনোস্ফেয়ার স্তরের ওপর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ভূ-অভ্যন্তরের তাপজনিত ম্যাগমার পরিচলন স্রোত সম্পর্কিত মতবাদটি ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আর্থার হোমস চালু করেন। তিনি মনে করেন, ভূ-অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত গলিত পদার্থ গুরুমন্ডল থেকে পরিচলন স্রোতের মত উপরে উঠে যায়। পরবর্তীতে তাপ হ্রাস পাবার কারণে আবার এই স্রোত নিম্নগামী হয়। এভাবে ভূ-অভ্যন্তরে উত্তপ্ত গলিত পদার্থের উর্ধ্ব ও নিম্ন গমণের ফলে পরিবহন সেলের সৃষ্টি হয়। ধারণা করা হয় পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি পরিচলন স্রোতের সেল বিপরীত দিক থেকে ওপরে উঠে এসে মুখোমুখী হয়ে আবার নিম্নগামী হয় (চিত্র ৩.১.২)। এ নিম্নগামী স্রোতরে ফলে ভূ-পৃষ্ঠ বরাবর যে টানের সৃষ্টি হয় তাতে ভূ-পৃষ্ঠে ভূ-অধ:ভাঁজ (Geosyncline) সৃষ্টি হয়। পরবর্তী পর্যায়ে এ নিম্ন অধ:ভাঁজের উভয় দিকে পরিচলন স্রোতের চাপের ফলে ভাঁজের সৃষ্টি হয়ে তলদেশ আরো গভীরে গিয়ে পর্বতের ভিত্তি তৈরী করে।

চিত্র ৩.১.২ ঃ ভূ-অভ্যন্তরে ম্যাগমার পরিচলন স্রোত

প্লেট সঞ্চারণ মতবাদ কে দেন ? প্লেট সঞ্চারণ মতবাদ অনুযায়ী ভূ-অভ্যন্তরে কোন স্রোতের উদ্ভব হয়?

ii) মহাদেশ গঠনকারী শক্তি

প্রাকৃতিক নিয়মে ভূ-ত্বকের শিলাস্তরের অবস্থানের সময় একটি সাম্য অবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা চলে যা সমস্থিতি (Isostasy) নামে পরিচিত। এটি বিস্তৃত এলাকাব্যাপী ভূ-ত্বকের উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী অবস্থান নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। কম ঘনত্ব বিশিষ্ট ভূ-ত্বক বেশী ঘনত্ব বিশিষ্ট শিলাস্তরের উপর ভাসে। মহাদেশীয় ভূ-ত্বক সমুদ্র তলদেশের ভূ-ত্বকের তুলনায় কম ঘনত্ব সম্পন্ন। ফলে এই মহাদেশীয় ভূ-ত্বক সহজেই ভেসে থাকে। ভূ-ত্বকের ক্ষয়কার্যের ফলে অবক্ষেপনসমূহ ঢাল বেঁয়ে সমুদ্রের তলদেশে জমা হয়। স্থলভাগের ক্ষয়ের ফলে মহাদেশের ভূ-ত্বক এর ওজনহ্রাস পায় ফলে এটি উপরে উঠে আসে। আবার সমুদ্রে এই অপক্ষেপনগুলো সঞ্চিত হয়ে এর ওজন বৃদ্ধি করে। তাই এর শিলাস্তর কিছুটা নিচু হয়। এভাবে সমস্থিতি মতবাদ অনুযায়ী প্রাকৃতিক ভাবে ভূ-ত্বকের শিলাস্তরের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে (চিত্র ৩.১.৩)।

চিত্র ৩.১.৩ ঃ ক) কম ঘনত্ব বিশিষ্ট ব্লক সমূহ পানিতে ভাসছে এবং ভারি ব্লকসমূহ উঁচু ও তলদেশ নীচে নেমে আছে।
খ) উঁচু পর্বত সমূহের তলদেশ অনেক গভীরে নিমজ্জিত।

চিত্র থেকে বলা যায়, মহাদেশের উচু পর্বতসমূহ ভূ-ত্বকের অনেক গভীরে নিমজ্জিত এবং এর পার্শ্ববর্তী স্বল্প উচ্চতা সম্পন্ন এলাকাগুলো ভূ-অভ্যন্তরের স্বল্প গভীরতায় নিমজ্জিত। মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় উভয় ভূমিরূপই এ ভাসমান অবস্থায় সমস্থিতি বজায় রাখে।

বিজ্ঞানীদের মতে গত প্রায় বিশ লক্ষ বছরে পৃথিবীর সমুদ্র তলে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবী বেশ কয়েক বার দীর্ঘ সময় ব্যাপী বরফে ঢেকে যায় এবং বরফের আবরণ মুক্ত হয়। বরফাবৃত হওয়ার সময় সমুদ্র সমতল অনেক নিচে নেমে যায়। আবার বরফ যখন গলতে শুরু করে তখন সমুদ্র সমতল উপরে উঠে আসে। এইরূপ পৃথিবী ব্যাপী সমুদ্র সমতলের ওঠা নামাকে ইউস্টেসি (Euostasy) বলে। এর ফলে পৃথিবীব্যাপী সমুদ্র উপকূলের বেশ কিছু অংশ সমূদ্রে নিমজ্জিত হয়।

প্লাইস্টোসিন যুগের (প্রায় ১ লক্ষ বছর আগে) শেষে মহাদেশীয় অংশের বরফ গলতে শুরু করে। তখন ভূমিও সাথে সাথে উপরের দিকে উঠতে শুরু করে। অনুমান করা হয় বাংলাদেশের মধুপুর চত্বর ও বরেন্দ্রভূমি প্লাইস্টোসিন যুগের বরফ গলে যাওয়ার পর এভাবে আস্তে আস্তে উপরে উঠে যায়। এ ধরণের উত্থানকে গ্লাসিয়াল রিবাউন্ড (Glacial rebound) বলে।

ক) সমস্থিতি মতবাদ কি?
খ) ইউস্টেটিক মতবাদ কি?
গ) গ্লাসিয়াল রিবাউন্ড কি?

পাঠসংক্ষেপ

ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রচন্ড তাপ ও চাপের ফলে প্রচন্ড শক্তির উদ্ভব হয়। এই শক্তির ক্রিয়ার ফলে ভূ-পৃষ্ঠে বা মহাদেশীয় ভূ-গঠণ কাঠামোতে বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটায়। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটিই ভূ-আলোড়ন প্রক্রিয়া। এই ভূ-আলোড়ন সাধারণতঃ দু'ভাবে হয়। দ্রুত পরিবর্তনকারী ও ধীর পরিবর্তনকারী। দ্রুত পরিবর্তন শক্তির কারণে হঠাৎ করে কোন অঞ্চলে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। যেমন ভূমিকম্প, ২০০১ সালে ২৫শে জানুয়ারীর ভূমিকম্পে ভারতের গুজরাটের বাহর পুরোটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। এ ছাড়া ধীর পরিবর্তনকারী শক্তির ক্রিয়া পর্বত গঠণকারী ও মহাদেশ গঠণকারী হিসেবে কাজ করে। এই প্রক্রিয়া অনেকসময় ধীরে পরিবর্তন সাধন করে বলে এটা ধীর পরিবর্তনকারী শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ভূ-আলোড়ন ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের আকৃতিগত পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১.১. ভূ-আলোড়ন জনিত শক্তির অন্যতম উৎস ভূ-অভ্যন্তরস্থ
ক) তাপ খ) চাপ
গ) কাঠিন্য ঘ) গ্যাসীয় পদার্থ

১.২. ভূ-আলোড়ন জনিত শক্তি কত প্রকার ?
ক) দুই খ) তিন
গ) চার ঘ) পাঁচ

১.৩. ধীর পরিবর্তনকারী শক্তির মধ্যে অন্যতম
ক) মহাদেশীয় ও মহাসমূদ্র গঠণকারী শক্তি খ) মহাসমূদ্র ও মালভূমি গঠণকারী শক্তি
গ) মহাদেশ ও পর্বত গঠণকারী শক্তি ঘ) পর্বত ও নিম্নভূমি গঠণকারী শক্তি

১.৪. দ্রুত পরিবর্তনকারী শক্তি
ক) অল্প সময়ে ব্যাপক পরিবর্তন আনে খ) মৃদু পরিবর্তন আনে
গ) পরিবর্তন আনে না ঘ) উপরের সবগুলোই

১.৫. পৃথিবীকে কয়টি প্লেটে ভাগ করা যায়
ক) ৬টি খ) ৫ টি
গ) ৪টি ঘ) ৭ টি

১.৬. পর্বত গঠনকারী শক্তি সম্পর্কীয় বর্তমানের সবচেয়ে জোরাল মতবাদটি হচ্ছে
ক) প্লেট সঞ্চারণ মতবাদ খ) ভূ-অধঃভাঁজ মতবাদ
গ) সমস্থিতি মতবাদ ঘ) ইউস্টেসি মতবাদ

১.৭. প্লেট সঞ্চারণ মতবাদটি কখন চালু হয়?
ক) ৪০-৫০ এর দশকে খ) ৫০-৬০ এর দশকে
গ) ৬০-৭০ এর দশকে ঘ) ৭০-৮০ এর দশকে

উত্তর ঃ ১.১. ক ১.২. ক ১.৩. গ ১.৪. ক ১.৫. ক ১.৬. ক ১.৭. গ.

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (সময় ৬×২=১২ মিনিট)

১। ভূ-আলোড়ন কাকে বলে?
২। ভূ-আলোড়ন জনিত শক্তি যে সমস্ত প্রক্রিয়ায় ভূ-গঠণ কাঠামোর বিকৃতি ঘটায় তার ছকটি উপস্থাপন করুন।
৩। ভূ-আলোড়নের ফলে দ্রুত পরিবর্তনকারী শক্তির দুটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৪। পর্বত গঠনকারী শক্তি সাধারণত কোন ভাবে প্রকাশিত হয়।
৫। পৃথিবীর প্লেটসমূহের নাম লিখুন।
৬। সমস্থিতি মতবাদ কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ভূ-আলোড়ন কাকে বলে ? ভূ-আলোড়নকারী শক্তি সমূহের বর্ণনা দিন।
২। পর্বত গঠনকারী শক্তি সম্পর্কীয় মতবাদ বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৩.২ ঃ ভূ-আলোড়নে সৃষ্ট ভূমিরূপ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভূ-আলোড়নের ফলে ভূমিতে কিভাবে ভাঁজের সৃষ্টি হয় তা বলতে পারবেন;
- সাধারণ বক্রতা কি তা বলতে পারবেন;
- ফাঁটল কি বলতে পারবেন; এবং
- চ্যুতি কি এবং এর দ্বারা সৃষ্টভূমিরূপ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

ভূ-অভ্যন্তরীণ তাপ বিচ্ছুরিত হয়ে ভূ-অভ্যন্তরে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি করে। এর ফলে ভূ-অভ্যন্তরে যে প্রবল শক্তির উদ্ভব হয় তার ফলে ভূ-ত্বকে আলোড়ন ঘটে। এই আলোড়ন দুই প্রকার যথা: মহীভাবক আলোড়ন ও গিরিজনি আলোড়ন। মহীভাবক আলোড়ন ভূ-পৃষ্ঠে লম্বভাবে কাজ করে। ফলে ভূমি উপরে বা নীচে ওঠানামা করে। গিরিজনি আলোড়ন ভূ-পৃষ্ঠে আনুভূমিকভাবে কাজ করে। ফলে গিরিজনি আলোড়ন ভূ-পৃষ্ঠে উঁচু নীচু ভাঁজের সৃষ্টি করে।

ভূ-আলোড়নে সৃষ্ট ভূমিরূপ

ভূ-আলোড়নের ফলে সৃষ্ট ভূ-ত্বকের শিলাসমূহের পরিবর্তনকে চার ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

i) ভাঁজ

ii) সাধারণ বক্রতা

iii) ফাঁটল এবং

iv) চ্যুতি

এই ভাগগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানবার আগে দুটো বিষয় সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকা প্রয়োজন।

নতি বা ডিপ (DIP) ঃ একটি আনুভূমিক স্তর কত ডিগ্রী কোন সৃষ্টি করেছে এবং কোনটি কোনদিকে ঢালু হয়েছে তা বুঝায়।

আয়াম বা ষ্ট্রাইক (Strike) ঃ শব্দটি দিয়ে কোন স্থানে একটি উর্ধ্ব উৎপত্তি ভূ-খন্ড একটি আনুভূমিক সমতলকে ছেদ করেছে তা বুঝায়। আয়ামকে কোন স্তরের অনুভূমিক লাইন বরাবর বিস্তারও বলা যেতে পারে। আয়াম নতির দিকের সাথে সমকোণে অবস্থান করে। আয়াম ও নতি কিলোমিটারের সাহায্যে মাপা হয়।

চিত্র - ৩.২.১ ঃ শিলা স্তরের আয়াম ও নতি

i) ভাঁজ ঃ (Fold)

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়ে সংকুচিত হয় এবং ফলের খোসার মত কুঞ্চিত হয়ে ভাঁজের সৃষ্টি করে। এই ভাঁজের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার এক ইঞ্চি হতে কয়েক মাইল পর্যন্ত হয় (চিত্র ৩.২.২)। ভাঁজ সাধারণত গিরিজনি আলোড়নের ফলে হয়ে থাকে। ভাঁজ কয়েক প্রকারের হতে পারে যেমন : সরল ভাজ, সুষম ভাঁজ, বিষম ভাঁজ, হেলান ভাঁজ, শায়িত ভাঁজ ইত্যাদি।

চিত্র ৩.২.২ ঃ ভাঁজ, সুইজারল্যান্ডের ইরা পর্বত

(ক) সরল ভাঁজ (Simple Fold) ঃ একটি অগ্রবর্তী কোণ ও অবনমিত ভূ-ভাগ বিশিষ্ট শিলা স্তরকে সরল ভাঁজ বলে।

চিত্র ৩.২.৩ ঃ সরল ভাঁজ

(খ) সুষম ভাঁজ (Symmetrical Fold) ঃ কোন ভাঁজের দুই পার্শ্ব বাহু যদি সমান কোণে দুই দিকে হেলে থাকে তখন তাকে সুষম ভাঁজ বলে।

(গ) বিষম বা প্রতিসম ভাঁজ (Asymmetrical Fold) ঃ কোন ভাঁজের এক পার্শ্বেস্থ বাহু যদি অপর পার্শ্বস্থ বাহু অপেক্ষা অধিক খাড়া হয় অর্থাৎ দুই পার্শ্বস্থ বাহু যদি অসমান কোণে দুদিকে হেলে থাকে তখন তাকে বিষম বা প্রতিসম ভাঁজ বলে।

চিত্র ৩.২.৪ঃ সুষম ও বিষম ভাঁজ

(ঘ) হেলান ভাঁজ (Inclined Fold) ঃ কোন ভাঁজের চাপ অধিক হলে ভাঁজগুলো পরস্পর গায়ে লেগে যায় এবং যে পাশে চাপের পরিমান কম সে দিকে ভাঁজগুলো বেঁকে যায়। একে হেলান ভাঁজ বলে। এই ভাঁজ একটি অপরটির মাঝে ঢুকে গেলে তাকে শায়িত ভাঁজ বলে।

বিষম ভাঁজ, উর্ধ্বভঙ্গ ও অধঃভঙ্গ

চিত্র ৩.২.৫ ঃ হেলান ভাঁজ, শায়িত ভাজ

(ii) সাধারণ বক্রতা

গিরিজনি আলোড়নের ফলে অনেক সময় পৃথিবীর এক বিরাট অংশ বক্র ভাবে উর্ধ্বদিকে ও নিম্নদিকে অবস্থান করে। এই উত্থিত ও অবনত বক্রতার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার কয়েক মাইল হতে কয়েক শত মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই বক্রতার উর্ধ্বে উত্থিত অংশকে উর্ধ্বভঙ্গ (Anticline) এবং নিম্নে অবনত অংশকে অধঃভঙ্গ (Syncline) বলে।

চিত্র ৩.২.৬ ঃ সাধারণ বক্রতা

(iii) ফাঁটল

ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে বহু ফাঁটলের সৃষ্টি হতে পারে। এই ফাঁটল খাড়া বা হেলানভাবে হতে পারে। এই ফাটল বরাবর চ্যুতি গঠিত হয়। বিপরীত দিকে গমনকারী দুটি প্লেট সীমানায় ভূ-ত্বকে ফাঁটল সৃষ্টি হয়, এ ফাঁটল বরাবর ভূ-অভ্যন্তর থেকে ম্যাগমা উপরে উঠে আসে এবং ভূ-ত্বকের সম্প্রসারণ ঘটে।

চিত্র ৩.২.৭ ঃ ফাঁটল

(iv) চ্যুতি

ভূ-আলোড়নে সৃষ্ট ফাঁটলের একদিকের অংশ স্থানচ্যুত হয়ে ভূ-গর্ভে বসে যায়। একে চ্যুতি বলে। চ্যুতির ফলে নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধরণের ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় ঃ

ধাপ চ্যুতি ঃ কখনও কখনও অনেকগুলি স্বাভাবিক চ্যুতি একত্রে অবস্থান করে সিঁড়ির ন্যায় যে ধাপের সৃষ্টি করে তাকে ধাপচ্যুতি বলে।

পরিখা চ্যুতি ঃ দুটি ধাপচ্যুতি দুই পার্শ্ব থেকে একসাথে মিলিত হয়ে যে সরু পরিখার ন্যায় ভূমির সৃষ্টি হয় তাকে পরিখাচ্যুতি বলে।

স্রস্ত উপত্যকা ঃ পরিখাচ্যুতি অধিক বড় হলে তাকে স্রস্ত উপত্যকা বলে। আবার দুটি চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ নীচে বসে গিয়েও স্রস্ত উপত্যকা সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে উর্ধো উত্থিত ভূমিরুপকে হোর্স্ট (Horst) বলে।

ভ্রষ্ট উপত্যকা ঃ কোন শিলাস্তরের উভয় পার্শ্ব উপরে উঠলে মেঝের অবনত অংশকে ভ্রষ্ট উপত্যকা বলে।

স্তূপ পর্বত ঃ কখনও কখনও দুই চ্যুতির মধ্যবর্তী শিলা উর্ধ্বপার্শ্বে বা পার্শ্বচাপে পর্বতের মত উচ্চ হয়ে স্তূপ পর্বতের সৃষ্টি করে।

চিত্র ৩.২.৮ ঃ ধাপ চ্যুতি

চিত্র ৩.২.৯.ঃ স্রস্ত উপত্যকা

চিত্র ৩.২.১০. ঃ স্তূপ পর্বত

পাঠসংক্ষেপ

ভূ-অভ্যন্তরে প্রবল তাপ ও চাপের জন্য ভূ-আলোড়ন ঘটে থাকে। গভীর সমুদ্র খাত বা সমুদ্র হতে শুরু করে সুউচ্চ পর্বত পর্যন্ত এ ভূ-আলোড়নের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তবে আজকের পাঠের আলোচ্য ভূমিরূপসমূহ ভূ-আলোড়নের ফলে সৃষ্ট প্রধান ভূমিরূপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন

১.১ ভূ-আলোড়ন দুই প্রকার ________________ ও ____________________ ।

১.২ ভূ-আলোড়নের ফলে সৃষ্ট ভূ-ত্বকের শিলাসমূহের পরিবর্তনকে ____________ ভাগে ভাগ করা যায়।

১.৩ আয়াম নতির দিকের সাথে ______________ অবস্থান করে।

১.৪ ভাঁজ এর একটি ভাগ __________________ ।

১.৫ ভূ-আলোড়নে সৃষ্ট ফাটলের একদিকের অংশ ________________ হয়ে ভূ-গর্ভে বসে গিয়ে চ্যুতি সৃষ্টি করে।

উত্তর ঃ ১.১ মহীগঠন, গিরিজনি ১.২ চার ১.৩ সমকোণে ১.৪ সরল ভাঁজ ১.৫ স্থানচ্যুত

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন -

১. ভাঁজ কি?

২. সাধারণ বক্রতার সজ্ঞা দিন?

৩. ফাঁটল কি?

৪. চ্যুতি কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ভূ-আলোড়নের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ বর্ণনা করুন।

২। বিভিন্ন প্রকার চ্যুতির বর্ণনা দিন।

পাঠ- ৩.৩ ঃ পর্বত

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ♦ পর্বত কাকে বলে বলতে পারবেন;
- ♦ পর্বতের শ্রেনী বিভাগ সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- ♦ বিভিন্ন প্রকার পর্বতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

ভূ-পৃষ্ঠের অতি উচ্চ, সুবিস্তৃত এবং খাড়া ঢাল বিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। পর্বত সাধারণত ৬০০ মিটারের বেশী উচ্চতা বিশিষ্ট হয়। তবে পর্বতের উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কোন কোন পর্বত বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে। যেমন- পূর্ব আফ্রিকার কিলিমানজারো। কিছু পর্বত ব্যাপক এলাকা জুড়ে অবস্থান করে। এ ধরণের পর্বত সাধারণত ঢেউয়ের ন্যায় ভাঁজ বিশিষ্ট হয়। যেমন : হিমালয় পর্বত। এই পর্বত পশ্চিমে পামীর মালভূমি থেকে শুরু করে পূর্বে প্রায় পাপুয়া নিউগিনি পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়াও উত্তর আমেরিকার রকি ও অ্যাপোলেসিয়ান, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ, ইউরোপের আল্পস্, ইউরাল ও ককেশাস, এশিয়ার ফুজিয়ামা উল্লেখযোগ্য বৃহৎ আকৃতির পর্বত।

ভাঁজ বিশিষ্ট পর্বতের উদাহরণ দিন।

পর্বত গঠনে বিভিন্ন প্রক্রিয়া একসঙ্গে কাজ করে। একে ওরোজেনেসিস বলে। গ্রীক শব্দ 'অরোস' অর্থ পর্বত এবং জেনেসিস অর্থ সৃষ্টি হওয়া। ভূ-অভ্যন্তরস্থ বিপুল শক্তির কারণে এর বৈশিষ্ট্যপূর্ন অবয়বের সৃষ্টি হয় যেমন এর উচ্চতা, এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাঁজ ও চ্যুতি, দুমড়ানো মোচড়ানো অবস্থা ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরণের ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে পর্বত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নানারূপ ভূমিরূপ এর সৃষ্টি হয় । এই ক্ষয়ক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রভাবক কাজ করে যেমনঃ পানির প্রবাহ, হিমবাহ প্রভৃতি।

পৃথিবীর প্রতিটি পর্বত দেখতে বাহ্যিকভাবে স্বতন্ত্র হলেও উৎপত্তিগত ও গঠণ প্রকৃতির দিক দিয়ে এদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্বতকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

ক) ভঙ্গিল পর্বত (Folded mountiains) ;
খ) আগ্নেয়জাত পর্বত (Lava mountains);
গ) চ্যুতি স্তূপ পর্বত (Fault-block mountains);
ঘ) উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত (Residual mountains)।

ক) ভঙ্গিল পর্বত ঃ পাললিক শিলাস্তর আনুভূমিক আলোড়ন বা মহাদেশীয় পর্বতের সংকোচনের ফলে কুঞ্চিত হয়ে ঢেউয়ের আকারে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি করে। চার ধরণের পর্বতের মধ্যে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি সবচেয়ে জটিল এবং বেশী জায়গা জুড়ে আছে।

ভঙ্গিল পর্বতের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ

১। অভিসারী প্লেট সীমানায় সংকোচন জনিত চাপে এ ধরণের পর্বত গঠিত হয়।
২। এর শিলা কাঠামো ভাঁজ ও চ্যুতিযুক্ত।
৩। সাধারণত ভঙ্গিল পর্বত পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত। তবে উৎপত্তির বিভিন্ন পর্যায়ে আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলাও এই পর্বতে দেখা যায়।
৪। প্রধানত তিন ধরণের পরিবেশে ভঙ্গিল পর্বত গঠিত হয়। যথা ঃ

ক) দুটি মহাদেশীয় প্লেটের সংঘাতপূর্ন এলাকায়।
খ) মহাদেশ ও সমুদ্র তলদেশীয় সীমানা বরাবর যেখানে সামুদ্রিক শিলাস্তর মহাদেশীয় প্লেটের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।
গ) বিচ্ছিন্ন শিলামন্ডল মহাদেশীয় প্লেট সীমানা বরাবর।

বিভিন্ন পর্যায়ে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি

ভূ-বিজ্ঞানিগন ভঙ্গিল পর্বত গঠনে কয়েকটি পর্যায় দেখিয়েছেন।

প্রথম পর্যায় ঃ সমুদ্র খাতের উভয় দিক থেকে সংকোচনের ফলে নিম্ন অংশ অবনমিত হয় বা নীচে নেমে যায়।

চিত্র ৩.৩.১. ঃ ১ম পর্যায়

২য় পর্যায় ঃ সমুদ্র খাতের অবনমিত অংশে পলি জমা হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে পলির ভারে নিচের দিকে নেমে যায় । ফলে ভূ-অধ:ভাঁজের সৃষ্টি হয়।

চিত্র ৩.৩.২. ঃ ২য় পর্যায়

৩য় পর্যায় ঃ অবনমিত খাতের তলদেশ রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয় এবং আগ্নেয়শিলা পলির ভিতরে প্রবেশ করে।

চিত্র ৩.৩.৩. ঃ ৩য় পর্যায়

চূড়ান্ত পর্যায় ঃ এ পর্যায়ে সংকোচন হ্রাস পায় এবং সম্পূর্ন খাত ওপরে উত্থিত হয়ে পর্বত মালা গঠন করে (Selby 1967)।

উদাহরণ ঃ এশিয়ার হিমালয়, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ, উত্তর আমেরিকার রকি এবং ইউরোপের আল্পস্।

ভঙ্গিল পর্বত উৎপত্তির পর্যায় সমূহ কি কি?

(খ) আগ্নেয় পর্বত (Volcanic Mountains)

ভূ-অভ্যন্তরস্থ ক্রিয়াকলাপের জন্য ম্যাগমা লাভা হিসাবে উদগিরিত হয়ে জমে, ঠান্ডা হয়ে যে শিলা স্তূপের সৃষ্টি করে তাই আগ্নেয় পর্বত। লাভার প্রকৃতির ওপর আগ্নেয় পর্বতের বিস্তৃতি ও আকৃতি নির্ভর করে। কোন কোন আগ্নেয় পর্বত খাড়া ঢাল বিশিষ্ট এবং স্বল্প স্থান জুড়ে থাকে। আবার স্বল্প ঢাল সম্পন্ন কিন্তু বিস্তৃত এলাকা জুড়েও এ পর্বত হতে পারে।

কিসের ওপর আগ্নেয় পর্বতের বিস্তৃতি ও আকৃতি নির্ভর করে?

চিত্র ৩.৩.৫ ঃ আগ্নেয় পর্বত

আগ্নেয় পর্বতের উৎপত্তি

কোন কোন ক্ষেত্রে ভূ-আলোড়নের জন্য ভূ-ত্বকের দুর্বল অংশ ফেটে যায়। ঐ ফাটলের মধ্য দিয়ে ভূ-গর্ভস্থ উত্তপ্ত লাভা, নানা প্রকার গ্যাস ও বাষ্প, ছাই, ধাতু ইত্যাদি প্রবল বেগে বেরিয়ে আসে। এই উত্তপ্ত লাভা ফাটলের চারদিকে সঞ্চিত হয়। এইভাবে বার বার ঐ সব পদার্থ ফাটলের চারদিকে সঞ্চিত হতে হতে উঁচু পর্বতের সৃষ্টি করে।

উদাহরণ ঃ জাপানের ফুজিয়ামা ও হাওয়াই দ্বীপের মওনালোয়া, মওনাকেয়া আগ্নেয়গিরি, ইতালির বিসুভিয়াস, আফ্রিকার কিলিমানজারো ইত্যাদি।

আগ্নেয় পর্বতের উদাহরণ দিন।

গ) চ্যুতি স্তূপ পর্বত (Fault-Block Mountains)

প্রবল ভূ-আলোড়নের ফলে শিলাস্তরে সংকোচন ও প্রসারণ চাপের সৃষ্টি হয়। এর ফলে ভূ-ত্বক অনেক সময় খাড়াভাবে ফেঁটে যায়। যে রেখা বরাবর ফাঁটল সৃষ্টি হয় তাকে চ্যুতি রেখা বলে। দুটি ফাঁটলের মাঝের অংশ অনেক সময় উপরে উঠে গিয়ে বা নীচে বসে গিয়ে ভূমির ওপর স্তূপের আকারে দাড়িয়ে থাকে তাই একে চ্যুতি স্তূপ পর্বত বলে।

চ্যুতি স্তূপ পর্বত কাকে বলে?

চ্যুতি-স্তূপ পর্বতের উৎপত্তি

তিন ধরণের পরিস্থিতিতে চ্যুতি স্তূপ পর্বত সৃষ্টি হতে পারে।

i) শিলাস্তরে টান জনিত চাপের কারণে

ভূ-ত্বকের শিলাস্তরে টানজনিত চাপের কারণে ফাঁটলের সৃষ্টি হয়। এ ফাঁটল বরাবর একটি শিলাস্তর পাশের স্তরের চেয়ে ওপরের দিকে উঠে গেলে বা নিচের দিকে নেমে গেলে অথবা পাশে সরে গেলে চ্যুতি স্তূপ পর্বতের সৃষ্টি হতে পারে (চিত্র ৩.৩.৪)।

চিত্র ৩.৩.৬ ঃ চ্যুতি স্তূপ পর্বত সৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থা

বিপরীত টানজনিত চাপের জন্য উভয় পাশের শিলাস্তরে অনেকগুলো ফাটলের সৃষ্টি হয়। এই ফাটল বরাবর খন্ডিত ভূ-ত্বকের একপাশ নিচের দিকে নেমে যায় এবং অন্য পাশ পূর্বের অবস্থানে থাকে। ফলে অনেকগুলো পাশাপাশি অবস্থিত খন্ডিত ভূ-ত্বক পর্বতের ন্যায় উঁচু ভূমি সৃষ্টি করে। এগুলো চ্যুতি স্তূপ পর্বত নামে পরিচিত।

উদাহরণ ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেভাডা, নিউ মেক্সিকো, ক্যালিফোর্নিয়া এবং ইউটাহ্ (Utah) রাজ্যের বেসিন ও রেঞ্জ অঞ্চলে এ ধরণের স্তূপ পর্বত দেখা যায়।

ii) শিলাস্তর উর্ধ্বে উত্থিত হওয়ার ফলেঃ শিলাস্তরের বিস্তৃত অংশ উর্ধ্বে-উত্থিত হওয়ার ফলে এ ধরণের চ্যুতি-স্তূপ পর্বত সৃষ্টি হয়। ভূ-ত্বকের কোন অংশ ভূ-অভ্যন্তরস্থ কারণে ওপরের দিকে উঠতে থাকলে পার্শ্ববর্তী শিলায় যে টানের সৃষ্টি হয় তার ফলে ফাঁটল দেখা যায়। এই ফাঁটল বরাবর দুপাশের শিলাস্তর নিচের দিকে নেমে যায় এবং মাঝের উর্ধ্বগামী শিলাস্তূপকে চ্যুতি স্তূপ পর্বতের মত দেখায় (চিত্র ৩.৩.৪)।

উদাহরণ ঃ পূর্ব আফ্রিকার স্রস্ত উপত্যকার পার্শ্ববর্তী উঁচু পার্বত্য স্তূপ এ ধরণের চ্যুতি স্তূপ পর্বত।

চিত্র ৩.৩.৭ ঃ শিলাস্তরের উর্ধ্বে উত্থিত হওয়ার ফলে গঠিত স্রস্ত উপত্যকা

iii) কোন কারনে ভূ-ত্বকের এক অংশ খাড়াভাবে পাশের সমভূমির ওপরে উঠে গেলে চ্যুতি-স্তূপ পর্বতের সৃষ্টি হয়।

উদাহরণ ঃ জার্মানির ব্লাক ফরেষ্ট, ফ্রান্সের ভোঁজ পর্বত এবং ভারতের বিন্ধ্যা ও স্তপুরা পর্বতদ্বয় চ্যুতি-স্তূপ পর্বতের উদাহরণ।

চ্যুতি স্তূপ পর্বত এর তিন ধরণের গঠন প্রক্রিয়া কি?

ঘ) উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত

ভূ-পৃষ্ঠের নরম শিলাসমূহ বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত ও অপসারিত হলে কঠিন শিলাসমূহ উঁচু হয়ে পর্বতের ন্যায় অবস্থান করে। একে উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত বলে। যেমন- এ্যাপোলেশিয়ান পর্বত।

উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত কি?

উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বতের উৎপত্তি

ভূ-আলোড়নের কারণে সুদূর অতীতকালে ভূ-অভ্যন্তরস্থ ম্যাগমা উত্থিত হওয়ায় শিলাস্তর ওপরের দিকে উঠে যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে খাঁড়াচ্যুতি বরাবর শিলাস্তূপ উর্ধ্বগামী হয়। পরবর্তীতে এ সমস্ত উচ্চভূমির উপরিভাগ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে নিচের আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা উন্মুক্ত হয়। পার্শ্ববর্তী ভূমির চেয়ে এ সুউচ্চ ভূমিরূপকে উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত বলে।

i) আদি পর্যায় ঃ পর্বতের কিয়দংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি। উপত্যকায় হ্রদ তৈরী হয়েছে।

ii) পরবর্তী পর্যায় ঃ পর্বতসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।

উদাহরণ ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্লাক হিলস, কলোরাডোর ফ্রান্ট রেঞ্জ (কলোরাডো) এবং বিগ হর্ন (ওয়াইওমিঙ্গ)।

পাঠসংক্ষেপ

আলোচ্য পাঠে পর্বতের সজ্ঞা ও শ্রেনীবিভাগ সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম। ভূ-পৃষ্ঠের অতিউচ্চ, সুবিস্তৃত এবং খাড়া ঢাল বিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। পর্বত সাধারণতঃ ৬০০ মিটারের বেশী উচ্চতা বিশিষ্ট হয়। তবে এই উচ্চতা সমূদ্র সমতল থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। হিমালয় পর্বত, উত্তর আমেরিকার রকি ও ন্যাপোলেশিয়ান, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ, ইউরোপের আল্পস্, ইউরাল, ককেশাস, এশিয়ার ফুজিয়ামা এগুলো উল্লেখযোগ্য পর্বতের উদাহরণ। উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্বতকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, ভঙ্গিল পর্বত, আগ্নেয়জাত পর্বত, চ্যুতিস্তূপ পর্বত ও ক্ষয়জাত পর্বত। উক্ত শ্রেনী বিভাগগুলোর বর্ণনা, বৈশিষ্ট্য, উৎপত্তি এবং উদাহরণ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পেলাম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন

১.১. পর্বত সাধারণত ______________ মিটারের বেশী উচ্চতা বিশিষ্ট হয় ।

১.২. পর্বত গঠনে বিভিন্ন প্রক্রিয়া একসঙ্গে কাজ করলে তাকে _______________ বলে।

১.৩. উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্বতকে __________________ ভাগে ভাগ করা যায়।

১.৪. কোন কোন পর্বত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে, যেমন __________________ ।

উত্তর ঃ ১। ১.১. ৬০০ ১.২. ওরোজেনেসিস ১.৩. চার ১.৪. পূর্ব আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

২.১. পর্বত কাকে বলে?

২.২. উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্বতকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ?

২.৩. ভঙ্গিল পর্বত কাকে বলে?

২.৪. চ্যুতি স্তূপ পর্বতের সংঙ্গা দিন।

২.৫. উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পর্বত কাকে বলে? পর্বত গঠণের প্রক্রিয়াসমূহ বর্ণনা করুন।

২. চিত্রসহ পর্বতের শ্রেনীবিভাগ দেখান।

পাঠ- ৩.৪ ঃ মালভূমি

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভূ-আলোড়নের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন ভূমিরূপের অন্তর্গত মালভূমির উৎপত্তির কারণ বলতে পারবেন;
- মালভূমির প্রকারভেদ বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন প্রকার মালভূমির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারনা পাবেন।

সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চ বিস্তীর্ন সমভূমিকে মালভূমি বলে। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে এর উচ্চতা কয়েক শত মিটার হতে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ভূ-অভ্যন্তরস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কারণে মালভূমির সৃষ্টি হতে পারে। যেমন : পাত সঞ্চালন, ভূ-আন্দোলন, ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন, আগ্নেয় তৎপরতা ও লাভা সঞ্চয়ের মাধ্যমে ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মালভূমি গঠিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর মোট ভূমির শতকরা পাঁচ ভাগ মালভূমি।

উৎপত্তির ভিত্তিতে মালভূমিকে প্রধানত: পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় ঃ
(ক) মহাদেশীয় শিল্ডস;
(খ) চ্যুতি বিশিষ্ট মালভূমি
(গ) পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি
(ঘ) ক্ষয়জাত মালভূমি এবং
(ঙ) আগ্নেয় মালভূমি।

(ক) মহাদেশীয় শিল্ডস ঃ প্রাচীন শিলাস্তুপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিস্তৃত এলাকা ব্যাপী এই মালভূমির সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের শিল্ড সমূহের উচ্চতা সাধারণত সমতল থেকে কয়েক'শ মিটার উচুঁতে হয়। এই শিল্ডে প্রায়শই অত্যন্ত কঠিন শিলা ৫০ থেকে ১০০ মিটার খাড়া শিলা স্তুপের ন্যায় থাকে।

উৎপত্তির কারণ ঃ প্রাচীন ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাস্তুপ থেকে এ ধরণের উচ্চভূমি সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক নানারূপ কারণে উপরের ভঙ্গুর নরম শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এক সময় নগ্নীভবণের মাধ্যমে সরে গিয়ে কঠিন শিলা স্তুপ বেরিয়ে পড়ে এ ধরণের মালভূমির সৃষ্টি করে।

বৈশিষ্ট্য

১. সাধারণ সমতল থেকে অল্প উচ্চতা বিশিষ্ট
২. এ মালভূমিতে কঠিন শিলাস্তুপ খাড়া হয়ে থাকতে দেখা যায়
৩. এর গঠন কাঠামো জটিল;
৪. এর শিল্ডে শিলা কেলাসিত হয়;
৫. ভূ-ত্বকের অভ্যন্তরে কয়েক কিলোমিটার ব্যাপী এর অবস্থান হতে পারে এবং
৬. উপরের নরম শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে শিলা উন্মুক্ত হয়।

উদাহরণ ঃ কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার শিল্ড।

(খ) চ্যুতি বিশিষ্ট মালভূমি ঃ চ্যুতির ফলে কোন এলাকার বিরাট অংশ অসমানভাবে ওপরে উঠে গিয়ে এ ধরণের মালভূমির সৃষ্টি করে।

উৎপত্তি ঃ ভূ-পৃষ্ঠের কোন বিস্তৃত স্থান যদি কখনো দুটি নাজুক অবস্থার মাঝে অবস্থান করে এবং ভূ-অভ্যন্তরস্থ কোন কারনে প্রবল চাপে মধ্যবর্তী বিস্তৃত এলাকা অসমানভাবে উপরে উঠে যায় তখন এই মালভূমির সৃষ্টি হয়।

চিত্র ৩.৪.১ ঃ চ্যুতি মালভূমি

বৈশিষ্ট্য

১। চ্যুতির কারণে এ মালভূমির সৃষ্টি হয়;
২। বিস্তৃত এলাকা চ্যুতি বরাবর উপরে উঠে যায়।

উদাহরণ ঃ স্পেনের মেসেটা।

গ) পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি

ভঙ্গিল পর্বত গঠিত হবার সময় পর্বত দ্বারা বেষ্টিত নিম্নস্থান সমূহ উঁচু হয়ে যে মালভূমির সৃষ্টি করে তাই পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি। এ ধরনের মালভূমির উচ্চতা সাধারণত ৩০০০-৫০০০ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

উৎপত্তি ঃ সংকোচনজনিত চাপের ফলে ভঙ্গিল পর্বতের মাঝে এ ধরণের মালভূমি সৃষ্টি হয়। এছাড়া পাত সঞ্চালন এবং ভূ-আলোড়নের সময় কখনও কখনও ভূ-পৃষ্ঠের ভঙ্গিল পর্বত শ্রেণী তাদের মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থানসমূহকে ওপরে তুলে আনে এবং মালভূমিতে পরিণত করে। এভাবে গঠিত মালভূমি পর্বত বেষ্টিত থাকে বলে একে পর্বতবেষ্টিত মালভূমি বলে।

উদাহরণ ঃ তিব্বতের মালভূমি। উত্তরে কুনলুন ও দক্ষিনে হিমালয় পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চল জুড়ে তিব্বত মালভূমি অবস্থিত। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ও উচ্চতম মালভূমি। তিব্বত মালভূমির গড় উচ্চতা ৪০০০ মিটারের বেশি। এর আয়তন প্রায় ৫২ লক্ষ বর্গকিলোমিটার।

চিত্র ৩.৪.২ঃ তিব্বতের মালভূমি - পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমির

এছাড়া এশিয়ার আল তিতাগ ও তিয়েনশান পর্বতমালার মধ্যে তারিম মালভূমি, এলবুর্জ ও জাগ্রোস পর্বত শ্রেণীর মধ্যে ইরানের মালভূমি পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমির উদাহরণ।

> পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি সৃষ্টি হয় কোন ধরণের পর্বত সৃষ্টির সময়?

বৈশিষ্ট্য

১. সংকোচনজনিত চাপের ফলে ভঙ্গিল পর্বতের মাঝে এ ধরণের মালভূমি সৃষ্টি হয়।
২. মালভূমির উচ্চতা সাধারণত ৩০০০ থেকে ৫০০০ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

(ঘ) ক্ষয়জাত মালভূমি

কোন পার্বত্য অঞ্চল বা উঁচু ভূ-খন্ড নদী, হিমবাহ, বৃষ্টিপাত, বায়ু প্রবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তার উচ্চতা হ্রাস পায় এবং মালভূমিতে পরিণত হয়। এই প্রকার মালভূমিকে ক্ষয়জাত বা অবশিষ্ট মালভূমি বলে। মালভূমির উপরিভাগ খাড়া ভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

উৎপত্তি ঃ এই মালভূমি পুরাতন উঁচু ভূ-ভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টি হয়। শিলার প্রকৃতি এর বন্ধুরতা নিয়ন্ত্রণ করে। যেখানে ক্ষয়কাজ বেশী হয় সেখানে ভূমির বন্ধুরতা বেশী দেখা যায়।

বৈশিষ্ট্য

১. ক্ষয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়;
২. সাধারণত এই মালভূমি স্বল্প উচ্চতা বিশিষ্ট হয়;
৩. সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাসমূহ ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন ক্ষয়জাত ভূমিরূপ দেখা যায়। যেমন ঃ মেসা, পিলার, বুটি, পিনাকল (চিত্র ৩.৪.৩)।

চিত্র ৩.৪.৩ ঃ (i) মালভূমির উপরিভাগ খাড়াভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত

চিত্র ৩.৪.৪ ঃ (ii) ক্ষয় প্রক্রিয়ার কারনে বিচ্ছিন্ন খন্ডিত ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়, যা মেসা ও বুটি নামে পরিচিত।

উদাহরণ ঃ দক্ষিণ ভারতের মালভূমি, সৌদি আরবের মালভূমি, সাইবেরিয়ার পূর্ব মালভূমি, আফ্রিকার দক্ষিন মালভূমি ক্ষয়জাত মালভূমি। ইউরোপের ক্যালিডোনিয়ান পর্বতশ্রেণী ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ফিজেল্ড মালভূমির সৃষ্টি করেছে।

এই ধরণের মালভূমিতে যে ক্ষয়জাত ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়, তার উদাহরণ কি কি?

(ঙ) আগ্নেয়জাত মালভূমি ঃ আগ্নেয় লাভা প্রবাহ থেকে এধরণের মালভূমির সৃষ্টি।

উৎপত্তি ঃ ভূ-ত্বকের কোন ফাটল বা আগ্নেয় গিরির ছিদ্রপথে ভূ-গর্ভ হতে লাভা প্রবাহ ভূ-পৃষ্ঠে উঁচু হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমশ: ঠান্ডা ও কঠিন হয়ে এ জাতীয় মালভূমির সৃষ্টি করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এ জাতীয় মালভূমি লক্ষ্য করা যায়।

চিত্র ৩.৪.৫ ঃ পৃথিবীর প্রধান লাভাজাত মালভূমির বন্টন

বৈশিষ্ট্য

১. অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট হয়;
২. বিস্তীর্ণ এলাকায় লাভা ছড়িয়ে পড়ে এ ধরণের মালভূমির সৃষ্টি হয়;
৩. এ ধরণের মালভূমির উপরিভাগ বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি সম্পন্ন;
৪. শুষ্ক জলবায়ুর আওতাভূক্ত থাকায় জনবসতি খুব কম;
৫. আগ্নেয়জাত লাভা দ্বারা গঠিত তাই ক্ষয় ক্রিয়ার মাধ্যমে উর্বর মৃত্তিকা সৃষ্টি করে;
৬. এই প্রকার মালভূমিতে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ যেমন টিন, তামা ইত্যাদি পাওয়া যায়।
৭. মালভূমির খরস্রোতা নদীতে বাঁধের মাধ্যমে পানিবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

উদাহরণ ঃ ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। উর্বর মৃত্তিকার কারণে এখানে তুলা ভারতের সবচাইতে বেশী উৎপাদন হয়।

আগ্নেয়জাত মালভূমিতে মৃত্তিকা কেমন ধরণের?

পাঠসংক্ষেপ

সমূদ্র সমতল থেকে উচ্চ বিস্তীর্ণ সমভূমিই মালভূমি। সমূদ্র পৃষ্ট হতে এর উচ্চতা কয়েক মিটার হতে কয়েক হাজার মিটার হতে পারে। কিন্তু এর উপরিভাগ প্রায় সমতল। ভূ-অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ফলে মালভূমির সৃষ্টি হয়। মালভূমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। তবে উৎপত্তি গত দিক দিয়ে মহাদেশীয় শিল্ডস, চ্যুতি বিশিষ্ট পর্বত, ক্ষয়জাত ও আগ্নেয় মালভূমি এই চার ভাগে ভাগ করা। মালভূমি পৃথিবীর অভ্যন্তরের ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি একপ্রকার ভূমিরূপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূরন করুন।

১.১ মহাদেশীয় শিল্ড-এর উৎপত্তি ____________ শিলাস্তূপ থেকে।

১.২ মালভূমির উচ্চতা সমূদ্রপৃষ্ঠ থেকে ______________ মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

১.৩ স্পেনের মেসেটা ____________ বিশিষ্ট মালভূমির উদাহরণ।

১.৪ _________________ জনিত চাপের ফলে ভঙ্গিল পর্বতের মাঝে পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমির সৃষ্টি।

১.৫ পুরাতন উঁচু ভূ-ভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ______________ মালভূমি সৃষ্টি হয়।

উত্তর ঃ ১.১. প্রাচীন ক্ষয় প্রাপ্ত ১.২. হাজার ১.৩. চ্যুতি ১.৪. সংকোচন ১.৫. ক্ষয়প্রাপ্ত

২। টিক চিহ্ন (Ö) দিন

২.১ শিল্ডসমুহের উচ্চতা অপেক্ষকৃত (কম/বেশী)

২.২ চ্যুতি বিশিষ্ট মালভূমির উদাহরণ (পামীর মালভূমী/স্পেনের মেসেটা) মালভূমি।

২.৩ পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি সাধারণত উচ্চতা (৫০ থেকে ১০০ মিটার/৩০০০-৫০০০ মিটার)

২.৪ মেসা, পিলার, বুটি, পিনাকল প্রভৃতি ভূমিরূপ (ক্ষয়জাত/চ্যুতি) মালভূমির উদাহরণ।

২.৫ লাভা ছড়িয়ে সৃষ্টি হয় (আগ্নেয়জাত/শিল্ড) মালভূমির।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. উৎপত্তির ভিত্তিতে মালভূমিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
২. মহাদেশীয় শীল্ড এর উৎপত্তির কারণ কি?
৩. চ্যুতি বিশিষ্ট মালভূমির উদাহরণ কি?
৪. পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি কিভাবে সৃষ্টি হয়?
৫. ক্ষয়জাত মালভূমির বৈশিষ্ট্য কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মালভূমি কাকে বলে? মালভূমির শ্রেনীবিভাগ উল্লেখ করে এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

পাঠ- ৩.৫ ঃ সমভূমি

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ♦ সমভূমি কি তা বলতে পারবেন;
- ♦ সমভূমির শ্রেণীবিভাগ জানতে পারবেন ;
- ♦ বিভিন্ন প্রকার সমভূমির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

সমুদ্র সমতলের প্রায় সম উচ্চতায় সুবিস্তৃত স্থলভাগকে সমভূমি বলা হয়। সমভূমির উপরিভাগ প্রায় সমান বা ক্রমশঃ নিম্ন অথবা সামান্য উঁচু নীচু তরঙ্গায়ীত হয়। সাধারণতঃ সমতলভূমিতে কোন সুবিস্তৃত নিম্নভূমি বা উচ্চভূমি থাকে না।

ভূমির গঠন, ক্ষয়কার্য, সঞ্চয়কার্য, প্রভৃতির ফলে সাধারণত সমভূমির উৎপত্তি হয়। উৎপত্তির দিক হতে পৃথিবীর সমভূমিগুলোকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন ঃ

১. ক্ষয়জাত সমভূমি (Residual Plains)
২. সঞ্চয়জাত সমভূমি (Depositional Plains) এবং
৩. উপকূলীয় সমভূমি (Coastal Plain)

১। ক্ষয়জাত সমভূমি ঃ বায়ুপ্রবাহ, সূর্যতাপ, বৃষ্টিপাত, পানি স্রোত, হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা উচ্চভূমি ক্রমশঃ ক্ষয় হয়ে সমভুমিতে পরিণত হলে তাকে ক্ষয়জাত সমভূমি বলে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়জাত সমভূমি গঠিত হয় বলে ইহাকে নিম্নের কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন ঃ

(ক) নদী বিধৌত সমভূমি ঃ নদীর ক্ষয় কার্যের দরুণ কোন উচ্চভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমভূমিতে পরিণত হলে তাকে নদী বিধৌত সমভূমি বলা হয়। সাধারণতঃ নদীর ক্ষয়চক্রের মাধ্যমে এইরূপ ভূমি গঠিত হয়। যেমনঃ উত্তর আমেরিকার হাডসন উপসাগর তীরবর্তী সমভূমি নদী বিধৌত সমভূমি।

(খ) হৈমবাহিক সমভূমি ঃ হিমবাহ ঢাল বেয়ে নীচের দিকে নামার সময় উহার প্রচন্ড ঘর্ষণে অসমতল ভূমিভাগকে ক্ষয় করে অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও সমতল ভূমিতে পরিণত করে। এই জাতীয় সমভূমিকে হৈমবাহিক সমভূমি (Glacial Plain) বলে। যেমন ঃ ফিনল্যান্ড, পূর্ব কানাডা ও সুইডেনের বিভিন্ন অঞ্চলের সমভূমি।

(গ) তরঙ্গ কর্তিত সমভূমি ঃ সমুদ্র উপকূল ভাগ তরঙ্গের আঘাতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে সমভূমিতে পরিণত হলে তাকে তরঙ্গ কর্তিত সমভূমি (Wave cut Plain) বলে। নরওয়ের উপকূলে এই জাতীয় সমভূমি আছে।

(ঘ) মরু সমভূমি ঃ মরু অঞ্চলে বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে নিম্নভূমি ভরাট হয়ে সমভূমি গঠিত হলে তাকে মরু সমভূমি বলা হয়। আলজেরিয়া, লিবিয়া ও মিসরে এই জাতীয় সমভূমি দেখতে পাওয়া যায়।

২। সঞ্চয় জাত সমভূমি ঃ নদী, হিমবাহ, বায়ু প্রবাহ প্রভৃতির দ্বারা পলি কাঁকর, বালুকা, ধুলিকণা প্রভৃতি কোন নিম্ন অঞ্চলে সঞ্চিত হতে হতে কালক্রমে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে সঞ্চয়জাত সমভূমি বলে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা এই জাতীয় সমভূমি গঠিত হয় বলে উহাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগ করা যায়।

(ক) পলল সমভূমি ঃ নদীবাহিত পলি, বালি, কাঁকর প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সমভূমি গঠিত হয়। এইরূপ পলি গঠিত সমভূমিকে পলল সমভূমি (Alluvial Plain) বলে। সঞ্চয়ের স্থান অনুযায়ী এই জাতীয় সমভূমি তিন প্রকার হয়।

i) পাদদেশীয় পলল সমভূমি ঃ অনেক সময় পাহাড়িয়া নদীর দ্বারা পলি সঞ্চিত হয়ে পাহাড়ের পাদদেশে নূতন সমভূমি গড়ে উঠে। এরূপ সমভূমিকে পাহাড়ের পাদদেশীয় পলল সমভূমি (Peidmont Alluvial Plain) বলে। যেমন ঃ বাংলাদেশের রংপুর ও দিনাজপুরের অধিকাংশ স্থান এই জাতীয় সমভূমি।

ii) প্লাবন সমভূমি ঃ নদীর পরিণত অবস্থাতে বন্যার সময় পানিস্রোতের সাথে বালি, পলি, কাকর প্রভৃতি উহার গতি পথের দুইদিকে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে জমা হয়ে যে সমভূমি সৃষ্টি হয় তাকে প্লাবন সমভূমি (Flood Plain) বলে। যেমন ঃ বাংলাদেশের রংপুর ও দিনাজপুরের অধিকাংশ স্থান এই জাতীয় সমভূমি।

চিত্র ৩.৫.১ ঃ প্লাবন সমভূমি নদীবাহিত পলির সঞ্চয়নে সৃষ্ট

(iii) ব-দ্বীপ সমভূমি ঃ নদী বাহিত পলি, বালি, কাঁকর প্রভৃতি নদীর মোহনায় সঞ্চিত হতে হতে অগভীর সমুদ্রে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে ব-দ্বীপ সমভূমি (Deltaic Plain) বলে। যেমন ঃ গঙ্গার ব-দ্বীপ সমভূমি পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ স্থান অধিকার করেছে।

(খ) হৈমবাহিক সমভূমি ঃ হিমবাহ পর্বতের হিমরেখার নীচে নেমে গলে যাবার ফলে গলিত পানি ধারা কাদা, বালি, নুড়ি, কাঁকর প্রভৃতি বহন করে বৃহৎ অঞ্চল ব্যাপি সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে হৈমবাহিক সমভূমি (Glacial Plain) বলে। উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশে এই জাতীয় সমভূমি দেখতে পাওয়া যায়।

(গ) লোয়েস সমভূমি ঃ নদী, হিমবাহ প্রভৃতির ন্যায় বায়ুও একস্থানের সূক্ষ্ম ধূলিকণা, বালুকা প্রভৃতি বহন করে অন্য কোন স্থানে সঞ্চয় করতে থাকে এবং কালক্রমে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে লোয়েস সমভূমি (Loess Plain) বলে। যেমন ঃ সাহারা মরুভূমির 'আগ' এই জাতীয় সমভূমি।

(ঘ) হ্রদ সমভূমি ঃ দীর্ঘকাল নদীবাহিত পলি, বালি, কাঁকর ও অন্যান্য আবর্জনা দ্বারা হ্রদের তলদেশ ভরাট হয়ে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে হ্রদ সমভূমি (Lake Plain) বলে। আমেরিকার বৃহৎ হ্রদ সমুহকে ঘিরিয়া হ্রদ সমভূমি দেখা যায়।

সঞ্চয়জাত সমভূমি কি কি?

৩. উপকূলীয় সমভূমি ঃ ভূ-আন্দোলনের ফলে মহীসোপান বা মহীঢাল ধীরে ধীরে উত্থিত হয়ে উপকূলবর্তী এলাকায় নিম্ন সমভূমি গঠিত হয়। এই জাতীয় সমভূমিকে সৈকত সমভূমি (Coastal Plain) বলে। যেমন ঃ মেক্সিকো উপসাগরের উপকুলে এই জাতীয় সমভূমি দেখা যায়।

চিত্র ৩.৫.৪ ঃ বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয়জাত সমভূমি

পাঠসংক্ষেপ

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরণের ভূমিরূপ পরিবর্তনকারী নিয়ামক দেখতে পাওয়া যায়। ফলে সমভূমিগুলোরও বিভিন্নতা সেই অনুসারে হয়ে থাকে। কাজেই বিভিন্ন নিয়ামক যেমন- নদী, বায়ু, পানি, হিমবাহ, সূর্যতাপ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির ক্রিয়াকলাপের ফলে নানা ধরণের সমভূমি গড়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূরণঃ

১.১ প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা উচ্চভূমি ক্রমশ: ______________হয়ে সমভূমিতে পরিণত হলে তাকে ক্ষয়জাত সমভূমি বলে।

১.২ নদীর ক্ষয়কার্যের জন্য উচ্চভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমভূমিতে পরিণত হলে তাকে ______________ সমভূমি বলে।

১.৩ নরওয়ের উপকূলে ___________________ সমভূমি আছে।

১.৪ ব-দ্বীপ সমভূমি ______________ সমভূমির একটি প্রকার।

১.৫ বায়ু দ্বারা সৃষ্ট সমভূমির নাম ____________________ সমভূমি।

উত্তর ঃ ১.১. ক্ষয়প্রাপ্ত ১.২. নদী বিধৌত ১.৩. তরঙ্গকর্তিত ১.৪. পলল ১.৫. লোয়েস

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

ক) সমভূমি কাকে বলে?

খ) সমভূমির বৈশিষ্ট্য কি কি?

গ) উৎপত্তির দিক হতে সমভূমি কত প্রকার?

ঘ) ক্ষয়জাত সমভূমি কাকে বলে?

ঙ) উপকুলীয় সমভূমি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সমভূমি কাকে বলে? সমভূমির শ্রেনীবিভাগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

ইউনিট ৪

ভূমিকম্প (Earth Quake)

পাঠ ৪.১ ঃ ভূমিকম্পের সংজ্ঞা ও কারণ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভূমিকম্প কি তা বলতে পারবেন;
- ভূ-কম্প তরঙ্গের উৎপত্তি ও গতি বলতে পারবেন;
- ভূমিকম্পের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

ভূমিকম্প ভূ-পৃষ্ঠে দ্রুত পরিবর্তন সাধনকারী প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে অন্যতম। ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই এর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সভ্যতার বহু ধ্বংশলীলার কারণ হিসেবে ভূমিকম্পকে সরাসরি দায়ি করা যায়। ধারণা করা হয়, গত ৪০০০ বছরে ভূমিকম্পের ধ্বংশলীলায় পৃথিবীর প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ লোক মারা গেছে। ভূমিকম্প সম্পর্কে অতীতের চেয়ে বিজ্ঞানীরা এখন অনেক বেশী তথ্য জানেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ ভূমিকম্প থেকে নিজেদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে এখনও প্রায় অসমর্থ। এর অন্যতম কারণ, ভূমিকম্প কখন সংঘটিত হবে তা পূর্ব থেকেই সঠিকভাবে এখনও অনুমান করা সম্ভব হয়নি। কোন ধরণের পূর্ব লক্ষণ ছাড়াই তা সংঘটিত হয় বা হতে পারে। তাছাড়া ভূমিকম্প যেমন জানমালের ক্ষতি করে তেমনি অত্যন্ত স্বল্প সময়ে ভূ-পৃষ্ঠে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। তাই ভূমিকম্প ভূবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং প্রথমেই জানা যাক, ভূমিকম্প কি ?

ভূ-অভ্যন্তরে কোন কারণে বিপুল শক্তি মুক্ত হওয়ায় ভূ-পৃষ্ঠে যে প্রবল ঝাঁকুনি বা কম্পনের সৃষ্টি হয় তাকে ভূমিকম্প বলে। একটি শান্ত পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যে ঢেউ-এর সৃষ্টি হয় তা পুকুরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একইভাবে ভূমিকম্পের ক্ষেত্রেও ভূ-অভ্যন্তরের যেখানে শক্তি মুক্ত হয় সেখান থেকে পানির ঢেউয়ের মত শক্তি শিলায় তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং তা দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভূ-অভ্যন্তরে যেখানে শক্তিমুক্ত হয় তাকে কেন্দ্র বলে। কেন্দ্র থেকে লম্বালম্বিভাবে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিস্থিত বিন্দু উপকেন্দ্র নামে পরিচিত।

ভূ-কম্পনকেন্দ্র থেকে দূরত্ব বৃদ্ধির সাথে ভূ-কম্পন শক্তি হ্রাস পায়। ভূ-কম্পন শক্তি সম্পন্ন এলাকাকে যুক্ত করে মানচিত্রের উপর যে রেখা পাওয়া যায় তাকে সমভূ-কম্পন রেখা (Isoseisimal line) বলে।

চিত্র ৪.১.২ ঃ ভূমিকম্পকেন্দ্র, উপকেন্দ্র, তীব্রতা ও সমভূকম্পন রেখা

ভূ-কম্প তরঙ্গের উৎপত্তি ও গতি

সাধারণত: ভূত্বকের কয়েক মাইল নীচেই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় এবং সেখান থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র হতে এই কম্পন প্রথমে উপকেন্দ্রে পৌঁছে। এই কম্পন কোন এক নির্দিষ্ট এলাকায় শেষ হয়ে যায় না। কয়েক হাজার মাইল পার হয়ে এই কম্পন মূল উৎস হতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্পের এই কম্পন যত দূরে পৌঁছাবে ততই এর তীব্রতা হ্রাস পাবে। বর্তমানে মানুষ ভূমিকম্প লিখ (Seismograph) নামক যন্ত্রের সাহায্যে মৃদুতম কম্পনও ধরতে সক্ষম হয়েছে।

ভূমিকম্পের কারণ

নানাবিধ কারণে ভূমিকম্প হয়। সাধারণত: প্রাকৃতিক ভূমিকম্প আভ্যন্তরীন ও কৃত্রিম ভূমিকম্প বাহ্যিক কারণে হয়। বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করে ভূমিকম্পের নিম্নলিখিত কারণসমূহ নির্ণয় করেছেন-

১. কোন কারণে ভূ-অভ্যন্তরে বড় রকমের শিলাচ্যুতি ঘটলে ভূমিকম্প হয়। চ্যুতির ফলে কোন অংশ নীচে ধ্বসে যায় বা উপরে উঠে আসে। নীচের অংশ যতই তলদেশে যায় ততই তাপে গলে শক্তি বের হয়ে ফাটল সৃষ্টি করে বলে উপরের অংশে কম্পণ হয়।

২. ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-অভ্যন্তরে প্রবল ফ্রিকশান (friction) হয়ে কতক অংশ ধসে পড়ে (land slip), ফলে ভূ-ত্বক কেঁপে ওঠে এবং ভূমিকম্প হয়।

৩. ভূ-অভ্যন্তর উত্তপ্ত। তাই তাপ বিকিরণ করে সংকুচিত হচ্ছে। ফলে শিলাস্তর ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য স্থান পরিবর্তন করলে ভূ-ত্বক কম্পিত হয়।

৪. ভূ-গর্ভে সঞ্চিত বাষ্প-চাপ বেশী হলে নিম্নভাগে প্রবলভাবে ধাক্কা দেয়, এতে ভূমিকম্প হয়।

৫. ভূ-গর্ভে চাপ হ্রাস পেলে এর অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত কঠিন পদার্থ গলে নিচের দিকে অপসারিত ও আলোড়িত হতে থাকে, এতে ভূ-ত্বক কেঁপে ওঠে।

৬. Elastic Rebound এর কারণে শিলাস্তর নিচের দিকে পতিত হলেও ধাক্কা খেয়ে পূর্বের স্থানে ফিরে ভূত্বক-এ ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে।

৭. আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের সময় বহির্মুখী বাষ্পরাশির চাপে ভূমিকম্প হয়।

৮. পাহাড় পর্বত থেকে বড় রকম শিলাচ্যুতি হলে ভূমিকম্প হয়।

৯. হিমবাহ অঞ্চলে হিমানী সম্প্রপাত হলে (Analanche) তুষার খন্ডের আঘাতে ভূমিকম্প হয়।
১০. ভূ-ত্বকের পানি ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পে পরিণত হয় এবং এই বাষ্পের উর্ধমুখী চাপের ফলে ভূকম্পন হয়।
১১. খনি অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠের নিম্নের কতক অংশ হঠাৎ ধ্বসে পড়লে ভু-কম্পন হয়।
১২. ভূ-গর্ভস্থ্ আগ্নেয় পদার্থের উর্ধমুখী চাপের ফলে ভূকম্পন হয়।

উপরের কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে প্রধানত: দুটি কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।
যেমন-
ক. প্লেট সমূহের সংঘর্ষের ফলে ভূ-ত্বকে যে ফাটলের সৃষ্টি হয় তা ভূকম্পন ঘটিয়ে থাকে।
খ. ভূ-অভ্যন্তরে বা ভূ-ত্বকের নীচে ম্যাগমার সঞ্চারণ অথবা চ্যুতি রেখা বরাবর চাপ মুক্ত হওয়ায় ভূ-কম্পন হয়ে থাকে।

জন্ হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ববিদ H. F. Reid ১৯০৬ সালে সানফ্লান্সিস্কো শহরে যে ভূমিকম্প হয় তার বিস্তারিত জরিপ শেষে ভূমিকম্প কিভাবে সংঘটিত হয় সে সম্পর্কে একটি মতবাদ প্রকাশ করেন। এই মতবাদ ইলাষ্টিক রিবাউন্ড (Elastic Rebound) মতবাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদ অনুসারে-

কোন স্থানের শিলার উপর প্রাকৃতিক কারণে উভয় দিক থেকে বিপরীতমূখী চাপ প্রয়োগ হয়। এই কারণে প্রয়োগকৃত চাপ অনুভূমিক ভাবে পরস্পর বিপরীত দিকে অথবা উলম্বভাবে পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল হয়। ফলে ঐ স্থানের শিলা প্রয়োজনমত আকার পরিবর্তন করে এই চাপ সহ্য করে যতক্ষন না চাপ পিড়নমাত্রা অতিক্রম করে। শিলাস্তরগুলি খুব শক্তভাবে বিন্যাস্ত থাকে বলে যথেষ্ঠ চাপ সহ্য করতে পারে। কিন্তু চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকলে দুই বিপরীতমুখী চাপ শিলার যে স্থানে সমান হয় সেখানে চ্যুতি (Fault line) তৈরী হয়। চাপ যখন পীড়নমাত্রা অতিক্রম করে তখন হঠাৎ চ্যুতির স্থান বরাবর শিলা স্তর বিযুক্ত হয়ে যায় এবং এক স্তর উপরে এবং অন্য স্তর নিচে নেমে আসে। শিলার এই বিযুক্ত হওয়ার সময় নির্গত শক্তিই ভূমিকম্প ঘটায়। চ্যুতির ফলে সংঘটিত ভূমিকম্পের সময় আমরা দেখি যে কিছুক্ষণ পরপর বেশ কয়েকবার ভূমিকম্প হয়। কারণ কোন স্থানে শিলাচ্যুতির ফলে চ্যুতিরেখা বরাবর পার্শ্ববতী স্থানে বিপরীত মুখী চাপ বাড়ে এবং চ্যুতি দীর্ঘায়িত হয়। এই চ্যুতির ফলে শিরাস্তরের স্তর বিন্যাস একই থাকে শুধু স্থান পরিবর্তীত হয় মাত্র।

চিত্র ৪.১.৩ঃ ইলাস্টিক রিবাউন্ড মতবাদ ভিত্তিক শিলায় স্থিতিস্থাপক শক্তি মুক্তির বিভিন্ন ধাপ

(i) কোন স্থানের শিলাস্তরের উপর বিপরীত দিক থেকে চাপ প্রয়োগ করা হলে। এই চাপ আনুভূমিক বা উলম্ব হতে পারে।
(ii) শিলাস্তরের আকার পরিবর্তনের মাধ্যমে চাপকে পীড়ন মাত্রা পর্যন্ত ঠেকানো যায়। এরপর যে স্থানে শক্তির ভারসাম্য রক্ষিত হয় সে স্থানে চ্যুতি (Faultline) তৈরী হয়।
(iii) এখানে চ্যুতি সৃষ্টি হয় এবং নির্গত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ভূমিকম্পের ফলাফলঃ ভূ-ত্বকের আকস্মিক পরিবর্তনকারী প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে ভূমিকম্প একটি। ভূমিকম্পের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে এবং ভূ-অভ্যন্তরে নানারূপ পরিবর্তন দেখা দেয়। নীচে ভূমিকম্পের ফলাফল উল্লেখ করা হ'ল।

i) ভূমিকম্পের ফলে ভূ-ত্বকে ভাঁজের সৃষ্টি হতে পারে;
ii) নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হতে পারে;
iii) ভূ-ত্বকে ফাঁটল ও চ্যুতির সৃষ্টি হতে পারে;
iv) সমূদ্র তলের পরিবর্তন হতে পারে;
v) ভূমির উত্থান ও পতন হতে পারে;
vi) হিমানী সম্প্রপাত হতে পারে;
vii) ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, কল-কারখানা ধ্বংস হতে পারে;
viii) জীবজন্তু ও গাছপালার ধ্বংস হতে পারে;
ix) জন-জীবনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

পাঠসংক্ষেপ

ভূমিকম্প ভূ-পৃষ্ঠে দ্রুত পরিবর্তন সাধনকারী একটি প্রক্রিয়া। এটি একটি প্রাকৃতিক দূর্যোগ। বর্তমানে মানুষ এই ভূমিকম্প সম্পর্কে অতীতের চেয়ে অনেক বেশী তথ্য জানতে পেরেছেন এবং সচেতনও হয়েছেন। তবুও ভূমিকম্প থেকে নিজেদের রক্ষা করতে আমরা প্রায় অসমর্থ। এর অন্যতম কারণ ভূমিকম্পের পূর্বাভাস সঠিকভাবে জানা আজও সম্ভব হয়নি। ভূমিকম্পের ফলে একদিকে যেমন জান মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় অন্যদিকে ভূ-পৃষ্ঠে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। তাই ভূ-বিজ্ঞানে এর গুরুত্ব অনেক বেশী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
সঠিক উত্তর দিন

১.১) ভূমিকম্প ভূ-পৃষ্ঠে পরিবর্তন ঘটায়
i) ধীর গতিতে ii) দ্রুত গতিতে iii) অতি দ্রুত গতিতে

১.২) ভূ-কম্পনের সঠিক পূর্বাভাস জানা
i) সম্ভব ii) সম্ভব হয়নি iii) কোনটি নয়

১.৩) দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে ভূ-কম্পন মাত্রা
i) কমে ii) বাড়ে iii) দুটিই

১.৪) ভূমিকম্প মাপন যন্ত্রের নাম
i) Lithograph ii) Radiograph iii) Siesmograph

উত্তর ঃ ১.১) iii ১.২) ii ১.৩) i ১.৪) iii

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ভূমিকম্প বলতে কি বুঝেন?
২. ভূমিকম্প কেন হয়?
৩. ভূ-তরঙ্গ কি?
৪. ইলাস্টিক ও রিবাউন্ড মতবাদ কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ভূমিকম্প কি ? ভূ-কম্প তরঙ্গের উৎপত্তি ও গতি আলোচনা করুন।
২। ভূমিকম্পের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন।

পাঠ ৪.২ ঃ ভূ-কম্পন তরঙ্গ, এর প্রকারভেদ, তীব্রতা ও পরিমাপ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভূ-কম্পন তরঙ্গের প্রকার ও ভিন্নতা বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন তরঙ্গের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
- ভূ-কম্পের তীব্রতা ও শক্তি বলতে পারবেন;
- ভূমিকম্প পরিমাপক যন্ত্রের গঠন প্রণালী ও কার্যাবলী জানতে পারবেন এবং
- ভূ-কম্প স্কেল সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

ভূ-কম্পন তরঙ্গ

পুকুরের মাঝে পাথর ছুঁড়লে তরঙ্গ যেমন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক একইভাবে ভূমিকম্পের তরঙ্গগুলি তার মূল উৎস থেকে সবদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ভূ-কম্পন থেকে তিন ধরণের তরঙ্গের সৃষ্টি হয় (চিত্র- ৪.২.১)-এর প্রতিটি তরঙ্গ বিভিন্ন গতিবেগে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ফলে ভূমিকম্প তরঙ্গ কেন্দ্র থেকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভূমিকম্পলেখ যন্ত্রে এসে পৌঁছে।

ভূমিকম্পের পূর্বের অবস্থা

ক) প্রাথমিক তরঙ্গের মাধ্যমে ভূ-কম্পন হয়। ঢেউ বরাবর বস্তুর সংকোচন ও প্রসারণ হয়। প্রাথমিক তরঙ্গ ভূমির যে কোন স্তর অতিক্রম করতে পারে।

খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ S এর মাধ্যমে ভূ-তরঙ্গ কম্পন হয়। তরঙ্গ ঢেউ বরাবর সমকোনে বস্তুকে আগে পিছে আন্দোলিত করে থাকে। এ তরঙ্গ শুধুমাত্র কঠিন পদার্থ ভেদ করে থাকে।

গ) পৃষ্ঠ তরঙ্গ বা L তরঙ্গের মাধ্যমে গতি সৃষ্টি হয়। বস্তু ভূ-পৃষ্ঠে চক্রাকারে আন্দোলিত হয়। গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমূদ্র তরঙ্গের ন্যায় গতি হ্রাস পায়।

চিত্র ৪.২.১ ঃ ভূ-কম্পনে সৃষ্ট বিভিন্ন তরঙ্গের প্রকৃতি

ভূমিকম্প পরিমাপক যন্ত্র ও ভূ-কম্পন তরঙ্গ ঃ ভূমিকম্প লেখ (Siesmograph) যন্ত্রের মাধ্যমে ভূ-কম্পন তরঙ্গ পরিমাপ করা যায়। যন্ত্রটি একটি ভারি আড় দন্ডের সঙ্গে মুক্তভাবে ওপরে ঝুলানো থাকে এবং এর তলদেশ ভূমির সঙ্গে যুক্ত থাকে। যখন ভূকম্পন তরঙ্গ এ যন্ত্রে পৌঁছে তখন ঐ ভারি ঝুলন্ত বস্তুর স্থিতি জড়তা (Inertia) বস্তুটিকে স্থির রাখে, কিন্তু

ভূমি এবং আড়কাঠি দুলতে থাকে। ঝুলন্ত বস্তুর মাথায় সহজে দাগ কাটা যায় এমন একটি কলম লাগান থাকে এবং গ্রাফ কাগজ ভূমির কম্পন অনুযায়ী দাগ কাটতে থাকে। গ্রাফে অঙ্কিত এ দাগ থেকে ভূ-কম্পনবিদগণ ভূ-কম্প শক্তি পরিমাপ করে থাকেন।

এই তরঙ্গগুলি উৎস থেকে গন্তব্য স্থানের দিকে তিনটি ভিন্ন ধাপে গমন করে।

এই তরঙ্গ গুলি হচ্ছে—

i) প্রাথমিক তরঙ্গ

ii) গৌন তরঙ্গ এবং

iii) পৃষ্ঠ তরঙ্গ বা দীর্ঘ তরঙ্গ

i) **প্রাথমিক তরঙ্গ** (Primary Wave) ঃ এই তরঙ্গকে সংক্ষেপে p-wave বা p-তরঙ্গ বলে। p-তরঙ্গ ভূমিকম্প কেন্দ্র থেকে প্রথমেই ভূ-কম্পলেখ যন্ত্রে এসে পৌঁছে। প্রথমেই পৌঁছে বলে একে প্রাথমিক তরঙ্গ বলে। এই প্রকার তরঙ্গ সাধারণত ধাক্কা প্রদান করে। এটা মাটির মধ্য দিয়ে সোজা পথে গমন করে। এ তরঙ্গ আনুভূমিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে আন্দোলিত হয়। এর ফলে শিলার সামান্য স্থান পরিবর্তন হয়।

প্রাথমিক তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য সমূহ কি?

আমরা জানি যে কোন তরঙ্গই হোকনা তার জন্য মাধ্যমের কোন স্থানান্তর হয় না। মাধ্যমের সাহায্যে এরা বাহিত হয় মাত্র। ভূমিকম্পের পরে যে কোন স্থানে এই তরঙ্গ আগে পৌঁছায়। এই তরঙ্গের গতিবেগ ঘনত্বের সাথে সমানুপাতিক। তাই মহাদেশীয় ভূ-ত্বকে এর গতিবেগ উপরি ভূ-ত্বকে ৬.১ কি.মি./সেকেন্ড, নিম্ন ভূ-ত্বকে ৬.৯ কি.মি./সেকেন্ড, সামুদ্রিক ভূ-ত্বকে ৮ কি.মি./সেকেন্ড। স্বল্প বেগের স্তরে (low velocity layer) এর গতি ৭.৮ কি.মি./সেকেন্ড। মেন্টাল এ ১১ কি.মি./সেকেন্ড।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে ঘনত্বের তারতম্যের মাধ্যমে কতগুলো অঞ্চল (Zone) বা স্তরের (layer) সৃষ্টি হয় এবং এই তরঙ্গ ঘনত্বের পার্থক্য সোজাসুজি পার হয়ে যেতে পারে না বিধায় উপকেন্দ্রের সাথে ১০৩°-১৪২° পর্যন্ত এই p-wave সোজাসুজি পৌঁছাতে পারে না। একে Shadow zone for direet p-wave বলে। মাধ্যম সমূহ হলে এই তরঙ্গ সোজাসুজি চলতে পারে নতুবা এটা পৃথিবীর কেন্দ্রের সাথে উত্তল আকারে চলে।

ii) **গৌন তরঙ্গ** (Secondary Wave)

এই তরঙ্গকে S-wave বা দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গও বলে। প্রাথমিক তরঙ্গ P এর পরই দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ ভূমিকম্প তরঙ্গ কেন্দ্র থেকে ভূ-কম্পলেখ যন্ত্রে এসে পৌঁছে। এই তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য P-wave এর মতই হবে। প্রধান পার্থক্য যে এই তরঙ্গ P-wave এর তুলনায় ধীর গতি সম্পন্ন এবং এটা তরল মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। এ তরঙ্গ ঢেউ বরাবর বস্তুকে সামনে পিছনে সমকোণে দোলাতে থাকে। তাছাড়া এই তরঙ্গ উত্তল পথে প্রতিফলিত এবং প্রতিসরিত হতে পারে। তরলের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না বিধায় উপকেন্দ্রের ১৪২°-২১৮° পর্যন্ত সরাসরি এই তরঙ্গ যেতে পারে না। একে shadow zone for direct S-wave বলে। এছাড়া P-wave এর মত একই কারণে S-wave (১০০°-১৪২°) সরাসরি যেতে পারে না। একেও সাধারণ Shadow zone for direct P & S wave বলে। তবে প্রতিফলিত হয়ে ঐ জায়গায় যেতে পারে। ভূ-কম্পলেখ যন্ত্র শক্তিশালী কম্পন চিহ্ন রেকর্ড করে। S তরঙ্গ দালানের কাঠামোর জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতির কারণ হয়।

গৌন তরঙ্গের প্রবাহ কেমন?

iii) পৃষ্ঠ তরঙ্গ (Surface wave)

সাধারণ তরঙ্গের মধ্যে এই তরঙ্গ সবচেয়ে কম গতিবেগ সম্পন্ন। এই তরঙ্গকে দীর্ঘ তরঙ্গ (Long wave বা L-wave) বলে। এর বিশেষ ধর্ম হচ্ছে যে এটা শুধুমাত্র পৃথিবীর উপরিভাগ বা বহিরাবরণ দিয়ে চলতে পারে। তাই এর গতিবেগও অত্যন্ত কম অর্থাৎ ৪.৮-৬.২ কি.মি./সেকেন্ড। এই তরঙ্গ তরল মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চলতে পারে না এবং মাধ্যমের ঘনত্বের

পার্থক্যে প্রতিসরিত বা প্রতিফলিত হতে পারে না। গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় এই তরঙ্গের গতি হ্রাস পায়।

পৃষ্ঠ তরঙ্গের প্রবাহ কেমন?

প্রাথমিক তরঙ্গ, গৌন তরঙ্গ এবং পৃষ্ঠ তরঙ্গ এই তিন ধরণের তরঙ্গকে একসাথে ভূমিকম্প তরঙ্গ (Earth Quake Wave) বলে। এই তরঙ্গ সমূহের মাধ্যমেই পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ সম্পর্কে নানা রকম তথ্য পাওয়া গেছে। তা না হলে মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মাত্র ২- ২ $\frac{১}{২}$ কি.মি. এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

ভূ-কম্পন তীব্রতা ও শক্তি

একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে ভূমিকম্পের তীব্রতা নির্ভরকারী বিষয়গুলো হচ্ছে-

ক) কেন্দ্র থেকে মুক্তি প্রাপ্ত শক্তি মাত্রা;

খ) উপকেন্দ্র থেকে অবস্থানের দুরত্ব;

গ) শিলার ধরণ ও দৃঢ়তা।

সাধারণত নরম ও আলগা শিলার ক্ষেত্রে ভূমিকম্প অনেক বেশি ক্ষতিসাধন করে। যে কোন ভূমিকম্পের সময় ভূমিকম্প কেন্দ্র হতে যে পরিমাণ শক্তি মুক্তি পায় তাকে ভূ-কম্পন শক্তির মাত্রা (Magnitude of Earth Quake) বলে। এর পরিমাপ ভূমিকম্প তীব্রতার চেয়ে অনেক বেশী নির্ভর যোগ্য এবং পরিমাপ ভিত্তিক। ভূ-কম্পন তরঙ্গের বিস্তার এবং উপকেন্দ্র থেকে ভূ-কম্পলেখ যন্ত্রের অবস্থানের দূরত্বের ভিত্তিতে একটি ভূমিকম্প থেকে কি পরিমান শক্তি মুক্ত হয়েছে তা পরিমাপ করা যায়।

স্কেল

ভূমিকম্পের কারণে ভূ-পৃষ্ঠে কম্পন বা ঝাঁকুনির সৃষ্টি হয়। এই কম্পন বা ঝাঁকুনির মাত্রাকে ভূ-কম্পন তীব্রতা বলে। ভূমিকম্প যে পরিমান ক্ষতি করে থাকে তার উপর নির্ভর করে এই মাত্রাগুলো ঠিক করা হয়ে থাকে। এগুলোকে প্রকাশের জন্য তাই স্কেল তৈরী করা হয়েছে।

কিসের ওপর নির্ভর করে ভূমিকম্পর মাত্রা ঠিক করা হয়?

এই স্কেল গুলোর মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য স্কেল হচ্ছে–

মারকেল্লী তীব্রতা স্কেল- ইতালীয় ভূকম্পবিদ জি, মারকেল্লী ভূ-কম্পন তীব্রতা পরিমাপের জন্য ১৯০২ সালে মারকেল্লী তীব্রতা স্কেল প্রবর্তন করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত মারকেল্লী তীব্রতা স্কেল সারনি নং ৪.২.১ এ দেয়া হল।

রিকটার স্কেল

ভূমিকম্পবিদগণ শক্তি পরিমাপের জন্য রিকটার স্কেল ব্যবহার করেন। চার্লস, এফ, রিকটার ১৯৩২ শালে ভূমিকম্প শক্তি পরিমাপের জন্য এ স্কেল ব্যবহার করেন। ভূমিকম্পের শক্তির মাত্রার মধ্যে ব্যাপক তারতম্য দেখা যায়। কাজেই এর মান প্রাকাশের জন্য সাধারণ স্কেল এর পরিবর্তে লগ বিশিষ্ট স্কেল ব্যবহার করা হয়।

এই স্কেলে তরঙ্গ বিস্তারের প্রতি ১০ গুন বৃদ্ধির জন্য ১ মাত্রার পরবর্তী উচ্চমান ধরা হয়। অর্থাৎ ২ মাত্রার ভূমিকম্প ১ মাত্রার চেয়ে ১০ গুন বেশি তরঙ্গ বিস্তার সৃষ্টি করবে। এছাড়া রিকটার স্কেলের মান প্রতি এক ইউনিট বৃদ্ধির জন্য প্রায় ৩০ গুন বেশি ভূ-কম্পন শক্তি যুক্ত হয়। এ স্কেল অনুযায়ী ২ মাত্রার শক্তি সম্পন্ন ভূমিকম্পে ১ মাত্রার চেয়ে ৩০ গুন বেশি শক্তি মুক্তি পায়। এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ শক্তি সম্পন্ন যে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে তার মান রিকটার স্কেলে ৮.৮। ধারণা করা হয় শিলা এর চেয়ে বেশি শক্তি ধারণ করতে পারে না। তার পূর্বেই ফেটে (fracture) যায়।

রিকটার স্কেলে তরঙ্গ বিস্তারের পর্যায় ক্রমটি ১ থেকে ২ এ কেমন?

সারণী ৪.২.১ ঃ ভূ-কম্পন তীব্রতা, শক্তি ও ভূমিকম্পের সংখ্যা

রিকটার স্কেলে মান	পরিমার্জিত মারকেল্লী স্কেল	বার্ষিক ভূমিকম্পের সংখ্যা
<২.০	সাধারণভাবে অনুভব করা যায় না কিন্তু রেকর্ড হয়।	৬০০,০০০
২.০-২.৯	অনুভব করার সম্ভাবনা থাকে।	৩০০,০০০
৩.০-৩.৯	কেহ কেহ অনুভাব করেন।	৪৯,০০০
৪.০-৪.৯	বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনুভব করা যায়।	৬,২০০
৫.০-৫.৯	ক্ষতিকর অনুভুতি হয়, লোক আতঙ্কগ্রস্ত হয়।	৮০০
৬.০-৬.৯	জনবহুল এলাকায় ক্ষতি হয়।	২৬৬
৭.০-৭.৯	বড় ধরণের ভূমিকম্প হয়। মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়।	১৮
≥৮.০ অর্থাৎ ৮ (অর্থাৎ ৮ এর বেশি বা এর সমান)	মহা প্রলয় জাতীয় ভূমিকম্প, উপকেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকা পুরোপুরি ধ্বংস হয়।	১.৪

পাঠসংক্ষেপ

ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপক যন্ত্রের নাম ভূমিকম্প লেখ (Siesmograph)। গ্রাফে অঙ্কিত দাগ থেকে ভূ-কম্পনবিদগণ ভূ-কম্প শক্তি পরিমাপ করে থাকনে। ভূকম্পন থেকে তিন ধরণের তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এগুলো হচ্ছে প্রাথমিক তরঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ এবং প্রষ্ঠ তরঙ্গ। ভূ-কম্পন তীব্রতা পরিমাপের জন্য ১৯০২ সালে ইতালীয় ভূকম্পবিদ জি, মারকেল্লীর প্রবর্তিত মারকেল্লী তীব্রতা স্কেল এবং ১৯৩২ স্যার চার্লস, এর প্রবর্তিত রিকটার স্কেল ব্যবহার করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দিন

১.১) যখন ভূমিকম্প তরঙ্গ ভূমিকম্পলেখ যন্ত্রে পোঁছে তখন কোনটি বস্তুটিকে স্থির রাখে।
(ক) স্থিতি জড়তা (খ) গতি জড়তা (গ) সরণ (ঘ) বেগ

১.২) ভূ-কম্পন থেকে কয় ধরণের তরঙ্গের সৃষ্টি হয়?
(ক) এক (খ) দুই
(গ) তিন (ঘ) চার

১.৩) চার্লস, এফ, রিকটার কত সালে ভূমিকম্প শক্তি পরিমাপক স্কেল দেন?
(ক) ১৯৩২ (খ) ১৮৩২
(গ) ১৭৪২ (ঘ) ১৮২৩

১.৪) অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগের চেয়ে ভূমিকম্পের প্রকৃতি আলাদা কারণ।
(ক) অকস্মাৎ ক্ষণস্থায়ী ও ভূ-অভ্যন্তরে ঘটে থাকে (খ) ধীর গতিতে হয়
(গ) অনেক সময় ধরে হয় (ঘ) উৎস পৃথিবীর বাইরের দিকে

উত্তর ঃ ১.১. ক) স্থিতি জড়তা ১.২. গ) তিন ১.৩. ক (১৯৩২) ১.৪. ক) অকস্মাৎ ক্ষণস্থায়ী ও ভূ-অভ্যন্তরে ঘটে থাকে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কি থেকে ভূমিকম্পবিদগণ ভূ-কম্প শক্তি পরিমাপ করে থাকেন?
২। ভূমিকম্পের তরঙ্গ গুলোকে কি কি সংক্ষিপ্ত সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা যায়?
৩। ভূ-কম্পন তীব্রতা কাকে বলে?
৪। রিক্টার স্কেল কি?
৫। অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে ভূমিকম্পের প্রকৃতি আলাদা কিভাবে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভূকম্পন তরঙ্গের প্রকার ও ভিন্নতা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
২. ভূমিকম্পের মাত্রা বলতে কি বুঝেন? মারকেল্লী ও রিকটার স্কেল সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

পাঠ ৪.৩ ঃ ভূমিকম্প অঞ্চল, ভূমিকম্পক্রিয়া এবং পূর্বাভাস

এই পাঠে শেষে আপনি—

- ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ভূমিকম্প ক্রিয়া কি তা বলতে পারবেন;
- ভূমিকম্পের পূর্বাভাস সম্পর্কে ধারনা পাবেন।

পূর্বের পাঠ থেকে আমরা জেনেছি পৃথিবীর সর্বত্র ভূমিকম্পের প্রকোপ সমান নয়। অবস্থানিক এবং গঠণ গত কারনেই কিছু কিছু এলাকায় ভূমিকম্প বেশী হয়।

ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল

পৃথিবীতে বেশ কিছু স্থান আছে, যেখানে ভূমিকম্পের প্রবণতা বেশী। বেশির ভাগ ভূমিকম্প (শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ) পৃথিবীর অল্প কিছু জায়গায় সংঘটিত হয়, এগুলো আয়তনে দীর্ঘ ও সরু। এদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য এলাকাগুলো হল পৃথিবীর বৃত্ত চাপীয় দ্বীপমালা যেমন ফিলিপাইন, জাপান ইত্যাদি। এছাড়াও নবীন ভঙ্গিল পর্বতমালা ও সামুদ্রিক শৈলশিরা সমূহ এ অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এখন আমরা সেগুলো সম্পর্কে জানব।

i) প্রশান্ত মহাসাগরীয় অংশ

প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটের বাইরের দিকের সীমানা বরাবর ভূমিকম্প প্রবণতা সবচাইতে বেশী। এটি একটি মালার মত এই প্লেটকে ঘিরে আছে। এই অংশের আওতায় জাপান, ফিলিপাইন, চিলি, অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, আলাস্কা প্রভৃতি প্রধান ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল। এ সমস্ত অঞ্চলে অগভীর, মাঝারি ও গভীর কেন্দ্র বিশিষ্ট ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের আওতায় কোন দেশসমূহ পড়ে?

ii) ভূ-মধ্যসাগরীয় হিমালয় অংশ

এই অংশের বেশীর ভাগই স্থল ভাগ। এই অংশটি আল্পস পর্বত থেকে শুরুকরে ভূ-মধ্যসাগরের উত্তর তীর হয়ে ককেশাস, ইরান, হিমালয়, ইন্দোচীন ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হয়ে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। অগভীর ও মাঝারী কেন্দ্র বিশিষ্ট ভূমিকম্প এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ধরণের ভূমিকম্প বিশেষত স্থলভাগে দেখা যায়।

iii) মধ্য আটলান্টিক ভারত মহাসাগরীয় শৈলশিরা অংশ

উত্তর-দক্ষিণ বরাবর মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা এবং ভারত মহাসাগরীয় শৈলশিরা মিশে তা আফ্রিকার লোহিত সাগর বরাবর ভূমধ্যসাগরীয় অংশের সঙ্গে মিশেছে। এই অংশের ভূমিকম্প প্রায় সবই অগভীর কেন্দ্র সম্পন্ন। এ সমস্ত অগভীর ভূমিকম্প কেন্দ্র বেশিরভাগ স্বাভাবিক চ্যুতিতে (Normal fault) সংঘটিত হয়।

মধ্য আটলান্টিক ভারত মহাসাগরীয় শৈলশিরার অংশে ভূমিকম্পের গভীরতা কেমন?

চিত্র ৪.৩.১ ঃ পৃথিবীর ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল

ভূমিকম্পপক্রিয়া

পৃথিবীতে সংঘটিত সব ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ভূমিকম্প অন্যতম। চীনে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে এক নম্বর প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রায় ২০টি বড় মাপের ভূমিকম্প প্রতিবছর পৃথিবীতে ঘটে থাকে। এর থেকে ১টি বা ২টি মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। বিশেষ করে বড় ধরণের ভূমিকম্পে ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

পৃথিবীতে কয়টি বড় মাপের ভূমিম্প বছরে সংঘটিত হয়?

ভূমিকম্পের প্রচন্ড শক্তি ভূ-পৃষ্ঠে প্রচন্ড ঝাঁকুনির সৃষ্টি করে। এতে করে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই ধরণের ঝাঁকুনির তীব্রতা, স্থায়ীত্ব ও এতে যে শক্তি ব্যয়িত হয় তার পরিমাণের ওপর কোন এলাকার ধংসের মাত্রা নির্ভর করে। এছাড়াও ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার ধ্বংসের মাত্রা নির্ভর করে ঐ এলাকার শিলার প্রকৃতি, ঘরবাড়ি তৈরীর সামগ্রী ও কাঠামোর ওপর। এছাড়াও ভূমিকম্পের প্রভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এগুলো সম্পর্কে এখন আমরা জানব।

ফাঁটল ও চ্যুতির সৃষ্টি

ভূমিকম্পের ফলে ভূ-ত্বকে অসংখ্য ফাঁটল ও চ্যুতির সৃষ্টি হয়। এই ফাটল এর মধ্য দিয়ে কাঁদা, উষ্ণ পানি, বালু প্রভৃতি নির্গত হয়। চ্যুতির সৃষ্টি হলে দুই চ্যুতির মধ্যবর্তী ভূমি বসে গিয়ে স্রস্ত উপত্যকা (Rift valley) এবং উঠে যাওয়ায় হর্স্ট (Horst) বা স্তুপ পর্বত সৃষ্টি হয়।

স্রস্ত উপত্যকা কিভাবে সৃষ্টি হয়?

ভাঁজের সৃষ্টি

ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে অনেক সময় ভূ-পৃষ্ঠে ভাঁজের সৃষ্টি হয়। এই ভাঁজ সাধারণত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হয় না।

ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে সাধারণত কেমন এলাকা জুড়ে ভাঁজ হয়?

নদ-নদীর গতিপথে পরিবর্তন

নদ-নদীর গতির ওপর ভূমিম্পের প্রভাব ব্যাপক। ভূমিকম্পের ফলে মাটি, বালু, পাথর প্রভৃতি জমা হয়ে নদীর গতি পরিবর্তিত হয়। অনেক সময় নদী শুকিয়েও যায় বা জলাভূমির সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ১৭৮৭ সালে ভারতের

আসাম রাজ্যে যে ব্যাপক ভূমিকম্প হয় এর ফলে পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র নদীর তলদেশ কিছুটা উঁচু হয়ে যায়। ফলে বাংলাদেশে নদীটি তার গতিপথ পাল্টে বর্তমান যমুনা খাত দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে।

ভূমিকম্পে বাংলাদেশে কোন নদীর গতিপথ কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে?

সমুদ্র তলের পরিবর্তন

ভূমিকম্প সমুদ্র তলদেশে সংঘটিত হলে তখন সেখানে ভূমি নিচু হয়ে যায় বা উঁচু হয়ে উঠে। যেমন ১৯২৩ সালে জাপানের সাগামী উপসাগরের আংশিক ২১৫ মিটার ওপরে উঠে যায়। এর ফলে সাগরে অত্যন্ত উঁচু ঢেউয়ের সৃষ্টি করে, যা উপকূলে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছিল। ভূ-কম্পন সৃষ্ট এ সমুদ্র ঢেউ 'সুনামী' নামে পরিচিত। এই সুনামী লোকালয়ে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি করে। যেমন ১৭০৩ সালে সুনামী থেকে জাপানের উপকূলে যে বন্যা হয়েছে তাতে প্রায় ১০০,০০০ এর বেশী লোক প্রাণ হারায়।

ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রের তলদেশের পরিবর্তনে কি কি ক্ষয়ক্ষতি হয়?

ভূমির উত্থান ও পতন

ভূমিকম্পের ফলে ভূমির উত্থান ও পতন হয়। যেমন কখনো কখনো উচ্চভূমি সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হয় অথবা সমভূমি অঞ্চল বসে গিয়ে সেখানে পানি জমে হ্রদের সৃষ্টি হয়। আবার সমুদ্রের তলদেশের কোন কোন স্থান উঁচু হয়ে সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের সৃষ্টি হয়।

হিমানি সম্প্রপাত

ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে পর্বতের গা থেকে বড় বড় বরফের খন্ড হঠাৎ নিচে পড়ে এবং পর্বতের পাদদেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

ধ্বংশলীলা

ভূমিকম্প কোন জনবহুল এলাকায় হলে তা ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, পানি, গ্যাস সরবরাহ এবং অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ভূমিকম্পের ফলে অসংখ্য ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। গাছ-পালা নষ্ট হয়। অগনিত জীবজন্তু ও মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যেমন ১৯৩৪ সালে বিহার প্রদেশে, ১৯৩৫ সালে বেলুচিস্তানের কোয়েটা শহরে এবং ১৯৫০ সালে আসামে ব্যাপক ভূমিকম্প হয়েছিল। এতে বহু গ্রাম ও নগর ধ্বংস হয় এবং কয়েক হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে। ১৯৩৯ সালে চিলিতে, ১৯০৬ সালে সানফ্রান্সিস্কোতে এবং ১৯০৮ সালে মদীনাতে যে ভূমিকম্প হয় তাতে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে জুলাই মাসে ইন্দোনেশিয়ার ভূমিকম্পে প্রায় ৫ হাজার লোক মারা যায়। ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ইরানের বাম শহরে ভূমিকম্পে প্রায় ত্রিশ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে।

ভূমিকম্পর ফলে সংঘটিত ধ্বংসলীলার কয়েকটি উদাহরণ দিন।

নিম্নের সারণিতে পৃথিবীতে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য কিছু ভূমিকম্পের তালিকা দেয়া হলঃ

সারণী ৪.৩.১ ঃ কিছু উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্পের তালিকা

সাল	অবস্থান	মৃতের সংখ্যা	রিকটার মান	মন্তব্য
১২৯০	চিলি (হুপেই), চীন	১০০,০০০		
১৫৫৬	সেনসি, চীন	৮৩০,০০০		
১৭৩৭	কলকাতা, ভারত	৩০০,০০০		
১৭৫৫	লিসবন, পর্তুগাল	৭০,০০০		সুনামী ব্যাপক ক্ষতি করে
১৯০৬	সানফ্রন্সিসকো, ইউ.এস.এ.	৭০০	৮.২৫	ব্যাপক অগ্নিকান্ড ঘটে
১৯২০	কেনসু, চীন	১৮০,০০০	৮.৫০	
১৯২৩	টোকিও, জাপান	১৫০,০০০	৮.২	অগ্নিকান্ডই বেশি ক্ষতি করে

সাল	অবস্থান	মৃতের সংখ্যা	রিকটার মান	মন্তব্য
১৯৩৫	কোয়েটা, পাকিস্তান	৬০,০০০		
১৯৫০	আসাম, ভারত	১,৫৩০	৮.৭	ভূমিধ্বস ঘটায়
২৯৬০	দক্ষিণ চিলি	৫,৭০০	৮.৫-৮.৭	
১৯৭০	পেরু	৬৬,০০০	৭.৮	ব্যাপক ভূমিধ্বস ঘটায়
১৯৭৬	তেংশান, চীন	৬৫০,০০০	৭.৬	
১৯৯০	উঃ পঃ ইরান	৪০,০০০	৭.৭	
১৯৯২	পূর্ব তুরস্ক	৪,০০০	৬.০-৬.২	
১৯৯৩	কিলারী (মহারাষ্ট্র), ভারত	২৫,০০০		
১৯৯৪	কওকা, কলম্বিয়া	১,০০০	৬.৮	
১৯৯৫	কোবে, জাপান	৬,০০০		ব্যাপক অগ্নিকান্ড ঘটে

ভূমিকম্প পূর্বাভাস (Earthquake Prediction) ঃ কোন ধরণের প্রাকৃতিক দূর্যোগ সম্পর্কে যদি আগে থেকে জানা যায় তবে ঐ প্রাকৃতিক দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। বিশেষ করে দুর্যোগের উৎপত্তির স্থল, সময়, স্থায়ীত্বকাল এবং এর শক্তি মাত্রা ও সম্ভাব্য কবলিত এলাকা সম্পর্কে সঠিক পূর্বাভাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিকম্পও একটি প্রাকৃতিক দূর্যোগ। বিজ্ঞানীরা পূর্বে থেকে এ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছেন । তবে অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে এই দূর্যোগের প্রকৃতি একটু ভিন্ন। এটির হঠাৎ করে আবির্ভাব ঘটে। বিশেষত এটি অকস্মাৎ সংঘটিত হয়, খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং ভূ-অভ্যন্তরে ঘটে থাকে। তাই এটি সরাসরি পর্যবেক্ষণের উপায় নেই। তবুও কিছু পদক্ষেপ বিজ্ঞানীরা নিয়েছেন যার মাধ্যমে ভূমিকম্প সম্পর্কে অনুমান করা সহায়ক হবে।

ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল চিহ্নিতকরণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর প্রধান ভূগঠন প্লেটসমূহের মানচিত্র প্রনয়ণ করেছে। এই মানচিত্রে পৃথিবীর প্রধান ভূ-কম্পন প্রবণ অঞ্চল এবং এ সমস্ত অঞ্চলের ভূ-আলোড়নের প্রকৃতি দেখানো হয়েছে (চিত্র ৪.৩.২)।

চিত্র ৪.৩.২ ঃ ভূমিকম্প পূর্বাভাস মানচিত্র

এই মানচিত্র থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটসমুহের কোথায় সম্ভাব্য বড় মাপের ভূমিকম্প ভবিষ্যতে ঘটতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের পূর্বাভাস করতে গিয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?

বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন যে, যে সমস্ত অঞ্চলে গত ১০০ বছরে ভূমিকম্প হয়নি অথচ এগুলো ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত, সে সমস্ত অঞ্চলে ভূমিকম্প হবার সম্ভাবনা বেশী। এই স্থান গুলোর মধ্যে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া, মধ্য জাপান, মধ্য চিলি, তাইওয়ান, এবং সুমাত্রার পশ্চিম উপকূল উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত অঞ্চলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে রিকটার মানে উচ্চমাত্রার ভূমিকম্পের সম্ভাবনা রয়েছে।

পাঠসংক্ষেপ

ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এটি থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা মানব জাতির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। বিজ্ঞানীরা ক্রমাগতভাবে ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত দুর্যোগ মোকাবেলার কৌশলগুলো সময়মত প্রয়োগ করতে পারলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

নৈর্ব্যাক্তিক প্রশ্ন

১. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১.১. সব চাইতে ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হল
ক. বঙ্গোপসাগর খ. বৃত্ত চাপীয় দ্বীপ মালা গ. মধ্য এশিয়া

১.২. পৃথিবীতে প্রতি বছর মোট কতটি বড় মাপের ভূমিকম্প সংঘটিত হয়?
ক. ২৫ টি খ. ৩০ টি গ. ২০ টি

১.৩. বাংলাদেশের কোন নদীতে ভূমিকম্পের প্রভাব রয়েছে?
ক. রূপসা খ. যমুনা গ. মেঘনা

১.৪. ভূমিকম্প সৃষ্ট সমুদ্র ঢেউ এর নাম
ক. সায়র খ. যমুনা গ. সুনামী

উত্তর ঃ ১। ১.১) খ. (বৃত্ত চাপীয় দ্বীপমালা) ১.২) গ. (২০ টি) ১.৩) খ. (যমুনা) ১.৪) গ. (সুনামী)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. তিনটি ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার নাম লিখুন।
২. মদিনাতে কত সালে সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প হয়?
৩. উপত্যকা কিভাবে সৃষ্ট হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভূমিকম্প ক্রিয়ার বর্ণনা দিন।
২. ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল এবং ভূমিকম্পের পূর্বাভাস সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

ইউনিট ৫

আগ্নেয়গিরি (Volcanoes)

পাঠ ৫.১ ঃ আগ্নেয়গিরিঃ সংজ্ঞা, উৎপত্তি, শ্রেণীবিভাগ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- আগ্নেয়গিরি কি বলতে পারবেন;
- আগ্নেয়গিরির উৎপত্তির কারণ বলতে পারবেন;
- আগ্নেয়গিরির শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

আগ্নেয়গিরি কি?

ভূ-ত্বকের শিলাস্তর সর্বত্র সমান কঠিন বা গভীর নয়। তাই কোন কোন সময় ভূ-ত্বকের চাপ প্রবল হয়ে শিলা স্তরের কোন দুর্বল অংশ ফেটে ভূ-গর্ভ হতে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ পথের সৃষ্টি হয়। সে পথ দিয়ে ভূ-গর্ভস্থ বাষ্প, গলিত ধাতব পদার্থ, উত্তপ্ত প্রস্তর খন্ড, কর্দম, ধুম, ভস্ম ইত্যাদি প্রবল বেগে ভূ-পৃষ্ঠে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ছিদ্রপথ বা ফাটলের মুখের চারদিকে ক্রমশঃ জমাট বেঁধে উচুঁ মোচাকৃতি পর্বতের সৃষ্টি করে। সাধারণত এ ধরণের মোচাকৃতি আগ্নেয় পর্বতকে আগ্নেয়গিরি বলে।

নতুন শব্দ ঃ কর্দম, ধুম, ভস্ম আগ্নেয়গিরির সংজ্ঞা দিন।

চিত্র ৫.১.১ ঃ আগ্নেয়গিরি

আগ্নেয়গিরির উৎপত্তির কারণ

নিম্নলিখিত কারণগুলির দরুণ আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি হয়–

ক) ভূ-ত্বকে দুর্বল স্থান বা ফাঁটলের অবস্থান ঃ ভূ-ত্বকের সর্বত্র পুরুত্ব সমান নয়। পাতলা ভূ-ত্বক বা ফাটল থেকে ভূ-অভ্যন্তরের গলিত ম্যাগমা, ভস্ম, বাস্প, ধাতু, ধুম্র ইত্যাদি প্রবল বেগে বের হয়ে আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি হয়।

খ) ভূ-পৃষ্ঠের চাপের হ্রাস ঃ পৃথিবীর অভ্যন্তরে যতই যাওয়া যায় ততই উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। সাধারণত: ৩০ মি. গভীরতায় ১° সে. তাপ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ভূ-অভ্যন্তরের ৯৬০ কি. মি. গভীরতায় শিলাগুলো এত উত্তপ্ত হয় যে এরা গলিত অবস্থায় থাকবে বলে মনে হয়। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠের চাপের দরুণ শিলা গলিত অবস্থায় না থেকে স্থিতিস্থাপক অবস্থায় থাকে। আবার, ভূ-গর্ভে ক্রমবর্ধমান সঞ্চিত বাস্পরাশি সর্বদা বাইরে আসতে চায়। ফলে ভূ-ত্বকের তলদেশে প্রবল উর্ধ্বচাপ পড়ে। এর দরুণ উপরিস্থিত ভূ-ত্বক নিম্নস্থ কঠিন শিলার উপর যে চাপ দেয় তা বহুগুণে কমে যায়। এই হ্রাসমান চাপই অগ্নুৎপাতে সাহায্য করে।

গ) ভূ-অভ্যন্তরে পানির প্রবেশ ঃ কখনও কখনও ভূ-ত্বকের ফাঁটল দিয়ে নদী নালা খাল বিল এমনকি সমূদ্রের পানি ভূগর্ভে প্রবেশ করে সেখানে প্রচন্ড উত্তাপে ঐ পানি বাষ্পিভূত হয় ও আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে ভূ-ত্বক ফাটিয়ে তপ্ত আকারে প্রবলবেগে বহির্গত হয়ে আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করে।

ঘ) ভূ-গর্ভের চাপ বৃদ্ধি ঃ ভূ-গর্ভস্থ পদার্থ সমূহের আয়তন বৃদ্ধির ফলে ভূ-গর্ভে প্রচন্ড চাপের সৃষ্টি হয়। এর ফলে ভূ-ত্বক ফেটে গিয়ে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়।

ঙ) রাসায়নিক ক্রিয়া ঃ ভূ-গর্ভে নানা প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ার দরুণ গ্যাস ও তাপের সৃষ্টি হয়। এতে ভূ-অভ্যন্তরের পদার্থ সমূহ উত্তপ্ত হয়ে চাপের সৃষ্টি করে এবং আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়।

চ) তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রভাব ঃ রেডিয়াম, থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রচুর তাপের সৃষ্টি করে এবং গলে আয়তনে বৃদ্ধি পায়। ফলে অগ্নুপাতের সৃষ্টি হয়।

ছ) ভূ-আন্দোলন ঃ ভূ-আন্দোলনের ফলে পার্শ্বচাপে ভূ-ত্বকের দুর্বল অংশ ভেদ করে উত্তপ্ত তরল লাভা উপরে উঠে আসে।

জ) ভূ-পৃষ্ঠের তাপ বিকিরণ ঃ ভূ-পৃষ্ঠ সর্বদা তাপ বিকিরণ করে শীতল ও সংকুচিত হয়। এতে ভাঁজের সৃষ্টি হয়, চাপ হ্রাস পায় এবং ভূ-ত্বক ফেটে অগ্নুৎপাত ঘটায়।

আগ্নেয়গিরি উৎপত্তির বিভিন্ন কারণ গুলি পৃথক পৃথক ভাবে লিখুন।

আগ্নেয়গিরির উৎপত্তিতে ম্যাগমা

আগ্নেয়গিরির উৎপত্তির সঙ্গে ম্যাগমা সরাসরি জড়িত। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন ভূ-ত্বক ও গুরুমন্ডলের মাঝামাঝি যে আঠাল পদার্থ আছে তা নানা কারণে পৃথিবীর উপরিভাগে উঠে আসে। ম্যাগমা চার ধরণের ভূ-তাত্ত্বিক পরিবেশে ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে উঠে আসে।

ক) ভূ-গঠন প্লেটসমূহ, যেখানে পরস্পর সংঘাতপূর্ণ অবস্থায় আছে ঃ এক্ষেত্রে ভূ-ত্বকের একটি অংশ আর একটি প্লেটের তলদেশে সঞ্চারিত হতে থাকে। ফলে অবনমিত প্লেটের সম্মুখভাগ তলদেশের প্রচন্ড উত্তাপে গলে যায়। এসমস্ত গলিত শিলা ম্যাগমায় পরিণত হয়। এই ম্যাগমার ঘনত্ব পার্শ্ববর্তী শিলার চেয়ে কম হওয়ায় তা ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসে ও ভূ-ত্বকের ফাটল বরাবর ভূ-পৃষ্ঠে উদগিরিত হয়। এ পরিবেশে ব্যাসল্টিক এবং অ্যান্ড্রেসাইটিক ম্যাগমার সৃষ্টি হয়।

চিত্র ৫.১.২ ঃ প্লেট সংঘাত অবস্থা এবং বিপরীত গতি
(ক) কেন্দ্রাপসারী প্রান্ত (খ) কেন্দ্রাভিমুখী প্রান্ত (গ) পার্শ্বীয় প্রান্ত

খ) প্লেটসমূহ যেখানে পরস্পর থেকে বিপরীত দিকে অগ্রসরমান

প্লেটসমূহের বিপরীতমূখী সঞ্চয়নের ফলে ভূ-অভ্যন্তরের চাপ ঐ স্থানে হ্রাস পায়। ফলে ঐ স্থানের গলনাঙ্ক হ্রাস পায় ভূ-অভ্যন্তরের প্রচন্ড তাপে। এর ফলে যে ফাটলের সৃষ্টি হয় তা পুরণের জন্য ভূ-অভ্যন্তরের ম্যাগমা উপরে উঠে আসে। এতে করে ব্যাসল্টিক ম্যাগমা তৈরী হয়। চিত্র ৫.১.৩ এধরণের আগ্নেয় তৎপরতায় তৈরী হয়েছে আইসল্যান্ড দ্বীপ।

গ) পার্শ্বীয় সংঘাত

প্লেটসমূহ অনেক সময় বিপরীত দিকে পাশ্বীয় গতিতে নড়াচড়া করে। এমতাবস্থায় চিত্র ৫.১.২ (গ) সরে যাওয়া অংশে নাজুক অবস্থার সৃষ্টি করে। এই অংশ থেকে উত্তপ্ত গলিত ম্যাগমা বের হয়ে আসে।

ঘ) প্লেটের ভেতরের উত্তপ্ত অংশ

অনেকক্ষেত্রে প্লেটের অভ্যন্তরে আগ্নেয়গিরির অবস্থানের ফলে উক্ত স্থানগুলো অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। তখন গুরুমন্ডল থেকে তরল শিলার কুন্ডুলী উপরে উঠে আসে এবং গলিত ম্যাগমা বেরিয়ে আসে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

আগ্নেয়ক্রিয়তাঃ চিত্রের মাধ্যমে আগ্নেয়ক্রিয়তার একটি ধারাবাহিক রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

চিত্র ৫.১.৩ ঃ (ক) উর্ধ্বগামী ম্যাগমা কঠিন অশ্মমন্ডলে বহু ফাটলের সৃষ্টি করেছে
(খ) ভূ-ত্বক দু'দিকে সরে গিয়ে স্রস্ত উপত্যকার সৃষ্টি করেছে
(গ) আরো বিস্তৃত সংকীর্ণ সাগরের সৃষ্টি করেছে
(ঘ) পরবর্তীতে এক বিরাট সমুদ্রখাত

আগ্নেয়গিরির শ্রেণী বিভাগ

ভূবিজ্ঞানী ডানা (১৮৯১) উদ্‌গিরিণের ভিত্তিতে আগ্নেয়গিরিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- (১) উদবেদী (২) নিঃস্বারী এবং (৩) মাঝারি।

তারপর আরও পরিবর্তন এনে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আগ্নেয়গিরির শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যথা–

১। নির্গমণ পথ ও জ্বালামুখের উপর ভিত্তি করে।

২। কার্যকারীতার উপর ভিত্তি করে।

৩। উদ্‌গিরিত লাভার ধরণ ও গঠণের ওপর ভিত্তি করে।

আগ্নেয়গিরির শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিগুলি কি কি?

১। নির্গমন পথের উপর ভিত্তি করে শ্রেণী বিভাগ

ক) ফিসার আগ্নেয়গিরি;

খ) সিলিন্ডার আগ্নেয় গিরি।

২। কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে শ্রেণী বিভাগ

ক) সক্রিয়

i) অবিরাম, যেমন– ক্যালিফোর্নিয়ার আগ্নেয়গিরি।

ii) সবিরাম, যেমন– সিসিলি আগ্নেয়গিরি।

খ) সুপ্ত, যেমন– জাপানের ফুজিয়ামা আগ্নেয়গিরি।

গ) মৃত, যেমন– মেক্সিকোর পেরিকোটিন আগ্নেয়গিরি।

৩। উদ্‌গিরিত লাভার ধরণ এবং আগ্নেয়গিরির গঠণের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ-

ক) শেইল্ড আগ্নেয়গিরি ঃ এ জাতীয় আগ্নেয়গিরির লাভা বহুদূর ব্যাপী বিস্তৃত এবং দেখতে কিছুটা ব্যাঙের ছাতার মত বা গম্বুজাকৃতির। এর ঢাল সাধারণত: গোড়ার দিকে ৫° এবং ওপরের দিকে ১৫° এর বেশী হয়। এরূপ আগ্নেয়গিরি প্রধানত ব্যাসল্ট দিয়ে গঠিত। হাওয়াই দ্বীপের মনালোয়া, কিলাউয়া এর অন্যতম উদাহরণ।

খ) সিনডারকোন আগ্নেয়গিরি ঃ সিন্ডার কোন সাধারণত খাড়া ঢাল বিশিষ্ট (প্রায় ৩০°-৪০°) এবং আকারে ছোট হয় (৩০০মি. এর বেশী নয়)। প্রায়ই নিকটবর্তী বৃহৎ আগ্নেয়গিরির পাশে গঠিত হয়। মেক্সিকোর পেরিকোটিন এর উদাহরণ।

চিত্র ৫.১.৪ ঃ সিনডার কোন আগ্নেয়গিরি

গ) মিশ্র কোণ আগ্নেয়গিরি ঃ জাপানের ফুজিয়ামা এবং ফিলিপাইনের মাউন্ট মেওন এধরণের আগ্নেয়গিরি। এই শ্রেনীর আগ্নেয়গিরি আকারে বড়, প্রায় সমান পুরুত্ব বিশিষ্ট লাভা শিলা খন্ডের স্তূপে গঠিত। প্রথমে নিঃশব্দে চটচটে আঠালো জ্যান্ডেসাইটিক লাভা, পরে কঠিন শিলা টুকরা, ধুলিকণা, উত্তপ্ত গ্যাস এবং শেষে পুনরায় আঠালো লাভা এর ওপর জমা হয়। এ জন্য একে মিশ্র কোন আগ্নেয়গিরি বলে।

চিত্র ৫.১.৫ ঃ মিশ্র কোণ আগ্নেয়গিরি

সিন্ডার কোন আগ্নেয়গিরি কি?
মিশ্র কোন আগ্নেয়গিরিকে কেন এ নামে নামকরণ করা হয়?

পাঠসংক্ষেপ

ভূ-অভ্যন্তরে যে সমস্ত প্রক্রিয়া কর্মরত আছে তার মধ্যে আগ্নেয় তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। আগ্নেয় তৎপরতায় ভূ-অভ্যন্তরস্থ ম্যাগমা অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করে। ভূ-অভ্যন্তরের গুরুমন্ডল থেকে প্রচন্ড উত্তাপ নির্গত হয় এবং এই উত্তাপ অশ্মমন্ডলীয় শিলার নিম্নভাগ গলিয়ে ম্যাগমার সৃষ্টি করে। ভূ-অভ্যন্তরের এই গলিত শিলা বা ম্যাগমা অশ্মমন্ডলের ফাটল বা দুর্বল অংশ ভেদ করে ভূ-পৃষ্ঠে উদগিরন হয়। এই উদগিরিত পদার্থই লাভা। লাভা ঠান্ডা জমাটবদ্ধ হয়ে ফাঁটল বা উদগিরণ মুখের চারদিকে জমা হয়ে যে উচুঁ ভূমিরূপের সৃষ্টি করে তাকেই আগ্নেয়গিরি বলে। আগ্নেয়গিরি উৎপত্তির কতগুলো কারণ আছে। যেমন- ভূ-ত্বকে দুর্বল স্থান বা ফাঁটলের অবস্থান, ভূ-পৃষ্ঠের চাপের হ্রাস, ভূ-অভ্যন্তরে পানির প্রবেশ, ভূ-গর্ভের চাপ বৃদ্ধি, রাসায়নিক ক্রিয়া, তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রভাব, ভূ-আন্দোলন এবং ভূ-পৃষ্ঠের তাপ বিকিরণ। আগ্নেয়গিরির উৎপত্তিতে ম্যাগমার একটি ভূমিকা আছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আগ্নেয়গিরির শ্রেণী বিভাগ করা হয়। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে এই পাঠে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১.১. ভূ-ত্বকের শিলাস্তর সর্বত্র সমান কঠিন বা গভীর নয়।
১.২. পৃথিবীর অভ্যন্তরে যতই যাওয়া যায় ততই উষ্ণতা কমে।
১.৩. ভূ-গর্ভস্থ পদার্থ সমূহের আয়তন কমায় ফলে ভূ-গর্ভে প্রচন্ড চাপের সৃষ্টি হয়।
১.৪. ভূ-গর্ভে নানা প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ার দরুন গ্যাস ও তাপের সৃষ্টি হয়।
১.৫. তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রচুর তাপের সৃষ্টি করে।

উত্তর ঃ ১.১. স ১.২. মি ১.৩. মি ১.৪. স ১.৫. স

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১। তেজাস্ক্রিয় পদার্থের ফলে কি হয়?
২। ক্যালিফোর্নিয়ার এবং সিসিলির আগ্নেয়গিরি কি ধরণের আগ্নেয়গিরি?
৩। ভূ-অভ্যন্তরে পানি প্রবেশের ফলে কিভাবে আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হয়?
৪। আগ্নেয়গিরির শ্রেণী বিভাগের ভিত্তিগুলি কি কি?
৫। শেইল্ড এবং সিন্ডার কোন আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে যা জানুন লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আগ্নেয়গিরি কি? আগ্নেয়গিরির উৎপত্তির করণ বর্ণনা করুন।
২। আগ্নেয়গিরির উৎপত্তিতে ম্যাগমার প্রভাব কি? আগ্নেয়গিরির শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৫.২ ঃ আগ্নেয়জাত পদার্থ ও আগ্নেয়গিরি

এই পাঠ শেষে আপনি—

- এই পাঠে আগ্নেয়গিরি থেকে উদগিরিত পদার্থ লাভা, তার বিভিন্ন রূপ, আকার, আকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- এছাড়াও আগ্নেয়ক্রিয়তার ফলে যে বিভিন্ন রকম পদার্থ উদগিরিত হয় তাদের সম্পর্কেও জানতে পারবেন।

আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে সাধারণত গ্যাসীয়, তরল ও কঠিন এই তিন প্রকার পদার্থ নির্গত হয়। আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্গিরিত লাভায় বিপুল পরিমাণে অতি উত্তপ্ত শিলা টুকরা, বিস্ফোরন্মুখ লাভা, সূক্ষ ভস্ম, ও গ্যাসীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে। আগ্নেয়গিরির উদগিরণ প্রকৃতিতে বিভিন্নতা দেখা যায়। যেমন, প্রথমে ব্যাসল্ট জাতীয় লাভা, পরে অ্যান্ড্রেসাইট এবং শেষে শিলাটুকরা উদগিরিত হয়ে আগ্নেয়গিরি গঠন করে।

ম্যাগমার প্রকৃতি ও এর গ্যাসীয় মিশ্রণের ভিত্তিতে লাভাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে কি বের হয়?

ক) ব্লক লাভা (Block Lava) ঃ লাভা ঠান্ডা হওয়ার সময় এর গ্যাসীয় পদার্থসমূহ দ্রুত বের হয়ে যাওয়ায় খুবই এবড়ো থেবড়ো আকৃতির স্তূপ তৈরী হয় (চিত্র ৫.২.১)। হাওয়াই জাতীয় আগ্নেয়গিরির এ ধরণের লাভা ‘আ আ’ (Ah Ah) নামে পরিচিত।

চিত্র ৫.২.১ ঃ ব্লক লাভা, কলোরাডো

(খ) দড়ির ন্যায় লাভা **(Ropy Lava)**

গ্যাসীয় বুদবুদ বিশিষ্ট গলিত লাভা থেকে এর সৃষ্টি। এ সমস্ত লাভা যখন নিচের দিকে নামতে থাকে, তখন এ দ্রুত ঠান্ডা হয়ে কোঁকড়ান ভাঁজের সৃষ্টি হয়ে জমাট বাঁধে। একে তখন অনেকটা পাকানো দড়ির ন্যায় দেখায় (চিত্র ৫.২.২)। হাওয়াই দ্বীপে এ জাতীয় লাভাকে ’পা হো হো’ বলে। এগুলো দ্রুত জমে ব্যাসাল্টিক শিলায় পরিণত হয়।

চিত্র ৫.২.২ ঃ দড়ির ন্যায় লাভা

দড়ির ন্যায় লাভার সৃষ্টি কোথা থেকে?

গ) বালিসাকৃতির লাভা (Pillow lava) ঃ এক্ষেত্রে দড়ির ন্যায় লাভা পানির সংস্পর্শে এসে দ্রুত ঠান্ডা হওয়ায় বালিসের স্তূপের ন্যায় আকৃতি ধারণ করে। এই লাভা পানির নীচের আগ্নেয়গিরিতে বেশী দেখা যায় ।

চিত্র ৫.২.৩ ঃ হাওয়াইয়ের সমুদ্রতলের সমুদ্রতলের আগ্নেয়গিরি থেকে উদগিরিত বালিসাকৃতির লাভা।

কোন লাভা থেকে সাধারণত বালিসাকৃতির লাভা তৈরী হয়?

ঘ) দন্ডাকৃতির লাভা (Columnar Lava) ঃ দন্ডাকৃতির লাভা ব্যাসল্ট জাতীয় ম্যাগমা থেকে সৃষ্টি হয়। পুরু ম্যাগমা স্তুপ সমানভাবে ঠান্ডা ও সংকুচিত হয়ে দন্ড বা খুঁটির ন্যায় জমাট বাঁধে। চিত্রে কলাম্বিয়া নদীর কাছে মাউরি পর্বতের দন্ডাকৃতির লাভা দেখা যাচ্ছে।

চিত্র ৫.২.৪ ঃ দন্ডাকৃতির, লাভা

দন্ডাকৃতির লাভার সৃষ্টি কোন জাতীয় মাগমা থেকে?

(ii) বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে লাভাকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায় ঃ লাভার মূল উপাদান সিলিকা। বিভিন্ন লাভায় সিলিকার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে লাভাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(ক) অম্লীয় লাভা (Acidic Lava) ঃ জালকা বর্ণের (felgic) ম্যাগমায় গঠিত এই লাভার মধ্যে ৭০% ভাগের অধিক সিলিকা থাকে।

(খ) মধ্যবর্তী লাভা (Intermidiate lava) ঃ মধ্যম বর্ণের (intermediate) ম্যাগমায় তৈরী এ ধরণের লাভায় ৫০%-৭০% সিলিকা থাকে।

(গ) ক্ষারীয় লাভা ঃ গাঢ় বর্ণের ম্যাগমায় গঠিত এই লাভায় ৫০% এর কম সিলিকা থাকে।

সবচাইতে বেশী সিলিকা থাকে কোন লাভায়?

লাভা ছাড়াও আগ্নেয়গিরি থেকে যে সব পদার্থ নির্গত হয় সেগুলো নিম্নরূপঃ

অগ্নিমন্ডিত শিলা ঃ (Pyroclastics)

বিস্ফোরণমূলক (explosive) অগ্নুৎপাতের সময় লাভার সাথে আগ্নেয়গিরির নলের ভাঙ্গা টুকরা, জ্বালামুখের ভাঙ্গা অংশ এবং লাভার যে সব অংশ বাতাসের সংস্পর্শে এসে কঠিন আকার ধারণ করে তাদের অগ্নিমন্ডিত শিলা বলে। আকার ও গঠণ হিসাবে এদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়।

i) ব্লক (Block) ঃ এর ওজন কয়েকটন হতে পারে। এগুলো সাধারণত জ্বালামুখের কাছাকাছি পড়ে। তবে ইতালীর স্ট্রম্বলীর অগ্নুৎপাতের সময় ২০০০ কে. জি. ওজনের একটি ব্লক ৩.২ কিলোমিটার দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

ii) বম্ব (Bombs) উৎক্ষেপনের সময় ম্যাগমিয়া প্লাষ্টিক (Magnatic) এর মত থাকে। পরে উড়ন্ত অবস্থায় কঠিন আকার ধারণ করে। এটা সাধারণত: ৩.২ কি.মি. বা এর বেশী হয় না।

iii) ল্যাপিলী (Lapilli) ঃ এই সকল পাইরোক্লাস্ট ভঙ্গুর হয়। এদের ব্যাস ৪-৩২ মি.মি. হয়ে থাকে।

iv) সিন্ডার (Cinders) ঃ ছোট, ধাতুমল (slage) এর মত কঠিন টুকরা, প্লাগ বা কোনের ভাঙ্গা অংশ। এদের ব্যাস ৪-২০ মি. মি.।

v) ভস্ম (Ash) ঃ সূক্ষ আকৃতির হয়। ব্যাস সর্বোচ্চ ৪ মি. মি.। বাতাসের মাধ্যমে ১০০ কি. মি. পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে।

vi) ধুলা (Dust) ঃ ইহা ১/১৬ মি. মি. অপেক্ষা কম ব্যাস সম্পন্ন। ধুলা বাতাসের মাধ্যমে ভেসে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। এমনকি ইতালীর আগ্নেয়গিরির ধুলা উত্তর আমেরিকায় পাওয়া গেছে। অনেক সময় বাতাসের উর্ধ্বমুখী হওয়ার কারণে ধুলা উর্ধ্বমন্ডলে পৌঁছে যায় এবং সূর্যালোকের পথে বাঁধার সৃষ্টি করে। ১৯১২ সালে আলাস্কায় কাতমাই (Mountain katmai) এর নির্গত ধুলায় পৃথিবীতে সূর্যালোকের পরিমাণ ২০% কমে যায়।

বাতাসের বেগ বেশী হলে সকল পাইরোক্লাস্টই দূরে চলে যায়। নয়তো এগুলো আগ্নেয়গিরির মুখে কাছাকাছি অংশেই পড়ে। লাভায় পাইরোক্লাস্ট বেশী থাকলে আগ্নেয়গিরি খাড়া আকৃতির হয়।

vii) গ্যাস (Gas) ঃ প্রায় প্রত্যেক অগ্নুৎপাতের সময়ই বিপুল পরিমাণ আগ্নেয় গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস অগ্নুৎপাত বন্ধ হবার পর জ্বালামূখ বা পার্শ্বছিদ্র দিয়ে বের হয়ে আসে। এই গ্যাসে জলীয় বাস্পের পরিমাণই বেশী থাকে।

অগ্নিমন্ডিত শিলা কি?
৬টি অগ্নিমন্ডিত শিলার উদাহরণ কি?

পাঠসংক্ষেপ

আগ্নেয়ক্রিয়ার ফলে উদগিরিত পদার্থ প্রধানত লাভা। এই লাভা ভূ-অভ্যন্তর হতে নির্গত আঠালো পদার্থ। গরম অবস্থায় পৃথিবী পৃষ্ঠে বের হয়ে আসে। কাজেই এই লাভা ঠান্ডা হয়ে কঠিন হতে হতে নানারূপ আকার ধারণ করে। এছাড়া লাভা স্তুপ ভূ-অভ্যন্তরেও নানা আকারে জমা হয়ে ভূ-অভ্যন্তরে এবং বাইরে নানারূপ আকৃতি প্রাপ্ত হয়। ভূ-অভ্যন্তরের লাভা ছাড়াও নানারূপ পদার্থ যেমন ব্লক, বম্ব, ল্যাপিলী সিন্ডার, ভস্ম, ধুলা, গ্যাস প্রভৃতি পদার্থ উদগিরিত হয়। পদার্থগুলোকে অগ্নিমন্ডিত শিলা (pyroclastics) বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। টিক চিহ্ন দিন।

১.১. আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে সাধারণত বের হয়।
ক) কঠিন খ) তরল
গ) বায়বীয় ঘ) ক, খ ও গ

১.২. আ, আ লাভা কোন জাতীয়
ক) হাওয়াই জাতীয় খ) প্লিনীয়
গ) ভ্যালকানীয় ঘ) স্ট্রোম্বলীয় শ্রেণীর

১.৩. ‘পা হো হো’ লাভা-
ক) ব্লক আকৃতির খ) দড়ির ন্যায়
গ) বালিসাকৃতির ঘ) দন্ডাকৃতির

১.৪. লাভার মুল উপাদান-

ক) সিলিকা		গ) আয়রন

গ) ম্যাগনেশিয়াম		ঘ) এলুমিনিয়াম

১.৫. আকার গত দিক দিয়ে সবচাইতে ছোট

ক) ব্লক		খ) সিন্ডার

গ) ভস্ম		ঘ) ধুলা

উত্তর ঃ ১.১. খ   ১.২. ক   ১.৩. খ   ১.৪. ক   ১.৫. খ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১. ম্যাগমার প্রকৃতি ও এর গ্যাসীয় মিশ্রণের ভিত্তিতে লাভাকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

২. বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে লাভাকে কি কি ভাগে ভাগ করা যায়?

৩. ব্লক কি?

৪. ধুলা কি?

৫. বালিসাকৃতির লাভা কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আগ্নেয়গিরির আগ্নেয়ক্রিয়তার ফলে উদগিরিত পদার্থসমূহের বর্ণনা দিন।

পাঠ ৫.৩ ঃ আগ্নেয়জাত ভূমিরূপ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- আগ্নেয়গিরির প্রভাবে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিলাস্তূপ তৈরী হয় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নির্দিষ্ট কিছু ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় তাদের সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

আগ্নেয়জাত ভূমিরূপকে আমরা দুইভাবে দেখতে পারি। ভূ-অভ্যন্তরে ম্যাগমা ঠান্ডা হয়ে কি ধরণের ভূমিরূপ সৃষ্টি করে এবং আগ্নেয়গিরির ক্রিয়াকলাপে ভূ-পৃষ্ঠে কি ধরণের ভূমিরূপে সৃষ্টি হয়।

প্রথমত: ভূ-অভ্যন্তরে ম্যাগমা ঠান্ডা হয়ে কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিলাস্তূপ তৈরী করে সেগুলোর মধ্যে ব্যাথোলিথ, ল্যাকোলিথ, সিল ও ডাইক উল্লেখগোয্য।

ব্যাথোলিথ ঃ এটি কমপক্ষে ১০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট ম্যাগমা স্তূপ। কোন কোন ক্ষেত্রে এটি কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে থাকে। যেমন ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আইডাহো (Idaho) ব্যাথলিথ ৪০ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তন জুড়ে রয়েছে। ব্যাথোলিথের চেয়ে ছোট আকৃতির স্তূপ 'স্টক' নামে পরিচিত। এগুলোকে ব্যাথোলিথের একটি সম্প্রসারিত অংশ হিসাবে ধরা হয়।

চিত্র ৫.৩.১ ঃ উন্মুক্ত ব্যাথালিথ

ব্যাথোলিথ গ্র্যানাইট শিলার খনিজ উপাদানে গঠিত। তবে এ শিলায় অন্য ধরণের খনিজ উপাদানও থাকে। ব্যাথোলিথের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এটি পর্বতের ভিত্তি তৈরী করে। ভূ-অভ্যন্তরের অনেক ভেতরে হওয়ায় উপরের শিলা ক্ষয় হওয়ার পর ব্যাথোলিথ দেখা যায়।

ল্যাকোলিথ ঃ এটি সিলের ন্যায় ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাঠি পাললিক শিলাস্তরের মধ্যে অবস্থান করে। তবে এটি সিলের চাইতে ভিসকাস (viscous) পদার্থ দ্বারা গঠিত। এটি অনেক ভূ-অভ্যন্তরে থাকায় ওপরের শিলাস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গম্বুজাকৃতির (DOME) ভূমিরূপ সৃষ্টি করে।

চিত্র ৫.৩.২ ঃ ল্যাকোলিথ (ল)

সিল ঃ পাললিক শিলাস্তরের মধ্যে ম্যাগমা অনুপ্রবেশ করে সিল তৈরী করে। এগুলোর উপরিতল অনেকটা সমতল হয়ে থাকে। এগুলো সাধারণত আনুভূমিক ভাবে থাকে। তবে ভূ-আলোড়নের কারণে খাড়া বা হেলানো আকৃতিরও হতে পারে। এই প্রকৃতিতে 'প্রণবভূমি' বা এসকারপমেন্ট (Escarpment) তৈরী করে। এ গুলোও উপরের শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার পর দেখা যায় (চিত্র ৫.৩.২)। উত্তর ইংল্যান্ডের গ্রেট হুইল সিল এর উদাহরণ। সিল আড়াআড়ি ভাবে কোন নদী অতিক্রম করলে তা জলপ্রাপাতের সৃষ্টি করে।

চিত্র ৫.৩.৩ ঃ সিল

ডাইক ঃ ম্যাগমা পাললিক শিলাস্তরে আড়াআড়ি ভাবে অনেকটা দেয়ালের ন্যায় যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিরূপ গঠণ করে তাকে ডাইক বলে। এই শিলা ক্ষয়রোধী। তাই ওপরের শিলাক্ষয় প্রাপ্ত হলে উঁচু শিরার ন্যায় দান্ডায়মান থাকে (চিত্র ৫.৩.৪)। ডাইক খাড়া বা হেলানো হতে পারে। অনেক সময় অগভীর নিম্নভূমি তৈরী করে।

চিত্র ৫.৩.৪ ঃ ডাইক

এছাড়া ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে সৃষ্ট কিছু ভূমিরূপ এখন দেখব ঃ

১। আগ্নেয় মালভূমি ঃ অনেক সময় আগ্নেয়গিরি হতে নির্গত পদার্থের পরিমান এত বেশী হয় যে তা বহুদুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে মালভূমির সৃষ্টি করে। আবার কখনো নিম্নভূমিতে লাভা সঞ্চিত হয়ে মালভূমির সৃষ্ট করে। ভারতের দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকাময় মালভূমি এরূপ নির্গত লাভা দিয়ে গঠিত।

২। আগ্নেয় দ্বীপ ঃ সমুদ্রের তলদেশেও বহু আগ্নেয়গিরি আছে। এদের লাভা সঞ্চিত হয়ে দ্বীপের সৃষ্টি হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এর উদাহরণ।

সমুদ্রের তলদেশের আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ কি?

৩। আগ্নেয় গহবর ঃ আগ্নেয়গিরির ফলে ভূ-পৃষ্ঠের কোন অংশ ধ্বসে গভীর গহবরের সৃষ্টি করে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপের মধ্যবর্তী একটি দ্বীপে ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতে একদিনের মধ্যে দ্বীপটির প্রায় অর্ধেক অংশ উৎক্ষিপ্ত ও বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বাকি অংশে এক বিরাট গহবর দেখা যায়।

৪। আগ্নেয় হ্রদ ঃ মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে বৃষ্টির পানি জমে অনেক সময় হ্রদের সৃষ্টি হয়। নিকারাগুয়ার কোসেগায়না (coseguina) এবং আলাস্কার মাউন্ট কাটমাই আগ্নেয় হ্রদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৫। আগ্নেয় পর্বত ঃ আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে অনেক সময় ভূ-গর্ভ হতে নির্গত লাভা, শিলাদ্রব্য পর্বতের সৃষ্টি করতে পারে। এ জাতীয় পর্বতকে আগ্নেয় পর্বত বলে। ইতালীর বিসুভিয়াস এই শ্রেণীর আগ্নেয় পর্বত।

৬। আগ্নেয় সমভূমি ঃ অনেক সময় আগ্নেয়গিরির লাভা সঞ্চিত হয়ে নিচু সমভূমির সৃষ্টি করে। উত্তর আমেরিকার স্নেক নদীর লাভা সমভূমি এ জাতীয় সমভূমি।

পাঠসংক্ষেপ

আগ্নেয়গিরির আগ্নেয়ক্রিয়ার প্রভাবে নানারূপ শিলাস্তূপ তৈরী করে এগুলো নানারূপ আকৃতির হয়। এই ভূমিরূপ ভূ-অভ্যন্তরে এবং ভূ-পৃষ্ঠে হয়ে থাকে ভূ-অভ্যন্তরে ম্যাগমা ঠান্ডা হয়ে গঠিত ভূমিরূপ যেমন : ব্যাথোলিথ, ল্যাকলিথ, সিল এবং ডাইক। আবার ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে কিছু ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় যেমন- আগ্নেয় মালভূমি, আগ্নেয় দ্বীপ, আগ্নেয় পর্বত, আগ্নেয়হ্রদ প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

১। সঠিক উত্তর দিন। হ্যাঁ অথবা না

- ১.১. আগ্নেয়জাত ভূমিরূপকে দুই ভাবে দেখতে পারি।
- ১.২. ব্যাথোলিথ কমপক্ষে ১ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট ম্যাগমা স্তূপ।
- ১.৩. সিল আড়াআড়ি ভাবে কোন নদী অতিক্রম করলে তা জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে।
- ১.৪. মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে ভূ-অভ্যন্তরের পানি জমে আগ্নেয়হ্রদ গঠণ করে।
- ১.৫. আগ্নেয় মালভূমি ভূ-অভ্যন্তরে আগ্নেয়গিরি সৃষ্ট ভূমিরূপ।

উত্তর ঃ ১.১. হ্যাঁ ১.২. না ১.৩. হ্যাঁ ১.৪. না ১.৫. না

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১। আগ্নেয়জাত ভূমিরূপ কয়ভাবে সৃষ্টি হতে পারে?

২। সিল কি?

৩। আগ্নেয় হ্রদ কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আগ্নেয় জাত ভূমিরূপ বর্ণনা করুন।

পাঠ ৫.৪ ঃ আগ্নেয়গিরির ভৌগোলিক অবস্থান ও অগ্নুৎপাতের ফলাফল

এই পাঠ শেষে আপনি—

- আগ্নেয়গিরির ভৌগোলিক অবস্থান বলতে পারবেন;
- অগ্নুৎপাতের ফলাফল সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

আগ্নেয়গিরির ভৌগোলিক অবস্থান

অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি মহাদেশের উপকূলে অবস্থিত। আধুনিক ভঙিল পার্বত্য অঞ্চলে কিংবা সমূদ্রের তলদেশে অবস্থিত। কারণ এ স্থানগুলো ভূ-ত্বকের দূর্বল অংশ। যেখানে আগ্নেয়গিরিগুলো সজ্জিত আছে, তাকে আগ্নেয়গিরি মন্ডল বলে। পৃথিবীতে ২টি আগ্নেয়গিরি মন্ডল আছে। যথা–

ক) প্রথম মন্ডলটি দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণে হর্ন অন্তরীপ হতে আন্দিজ পর্বতমালা, মধ্য আমেরিকার পর্বতমালা ও উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতমালার মধ্য দিয়ে উত্তরে বিস্তৃত রয়েছে। এটি তৎপরে এলুশিয়ান, কামস্টস্কা, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করে পশ্চিমে বেঁকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। এর একটি শাখা নিউগিনি হয়ে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। এসব আগ্নেয়গিরি প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে রেখেছে বলে এদেরকে প্রশান্ত মহাসাগরের আগ্নেয়মালা নামে অভিহিত করা হয়।

চিত্র ৫.৪.১ ঃ আগ্নেয়গিরির ভৌগলিক অবস্থান

খ) দ্বিতীয় মন্ডল উত্তর মহাসাগরের আইসল্যান্ড দ্বীপ হতে আরম্ভ করে দক্ষিণে এ্যাজোরর্স ও কেপভার্ড দ্বীপ হয়ে গিনি উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর একটি শাখা ভূ-মধ্যসাগরের ভিতর দিয়ে এশিয়ার মধ্যভাগ পর্যন্ত অবস্থিত।

এ সমস্ত আগ্নেয়গিরি বাদে পূর্ব আফ্রিকার স্রস্ত উপত্যকার এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অনেকগুলো আগ্নেয়গিরি আছে। এর পাদদেশ সাগরতল হতে নিচে ১৬,০০০ ফুট এবং শিখরদেশ ১,৪০০ ফুট উর্ধ্ব। হাওয়াই দ্বীপের মোনালোয়া পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতম আগ্নেয়গিরি।

ভারত প্রায় আগ্নেয়গিরি বিহীন। বঙ্গোপসাগরে ব্যারেন দ্বীপে এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নারকোনডাম দ্বীপে দ'ুটি আগ্নেয়গিরি আছে। তবে এরা সুপ্ত বা মৃত অবস্থায় আছে। ব্যারেন দ্বীপের আগ্নেয়গিরিটির উচ্চতা প্রায় ৩৪ মিটার। পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে কোহি-সুলতান এবং মায়ানমারে সাউন্ট পোপো নামক আগ্নেয়গিরি আছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের আগ্নেয়মালা কি?
মোনালোয়া আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে কি জানেন?

অগ্নুৎপাতের সুফল

অগ্নুৎপাতের ফলে কেবল মানুষের অপকারই হয় না বরং অনেক ক্ষেত্রে উপকারও হয়।

আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের সুফলগুলো মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

১. অগ্নুৎপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ বেশী উর্বর হয়। যেমন- দাক্ষিণাত্যের লাভা গঠিত কৃষ্ণমৃত্তিকা কার্পাস চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

২. অনেক সময় অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পৃথিবীর বহু নীচের খনিজ পদার্থ ভূ-পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশে অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই অধিক পরিমাণ খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়।

৩. অগ্নুৎপাতের ফলে অগভীর সমুদ্রে বা হ্রদে লাভা বা ভস্ম সঞ্চিত হয়ে উর্বর ভূ-ভাগ গঠণ করে।

আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের কুফল

আগ্নেয়গিরি হতে নির্গত লাভা প্রবল বেগে উর্ধ্বে উঠে চারদিকে বহুদূর গিয়ে পড়ে এবং গ্রাম, নগর, শষ্যক্ষেত্র প্রভৃতি ধ্বংশ করে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইতালির বিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে হারকুলেনিয়াম ও পমপাই নামক দুটি নগর উত্তপ্ত লাভা ও ভস্মরাশির মধ্যে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। এমন কি ক্রাকাতোয়ার অগ্ন্যুৎপাতের লাভার ফলে কয়েক হাজার লোকের প্রাণ হানী ঘটে।

পাঠসংক্ষেপ

ভূ-অভ্যন্তরে কার্যরত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে আগ্নেয় তৎপরতা উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি মহাদেশের উপকুলে, আধুনিক ভঙ্গিল পার্বত্য অঞ্চলে কিংবা সমুদ্রের তলদেশে অবস্থিত। এই স্থানগুলো ভূ-ত্বকের দূর্বল অংশ। আগ্নেয়গিরির তৎপরতাও একটি প্রকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আগ্নেয় তৎপরতার শুধু ধবংসই ঘটায় না, তা বহু ক্ষেত্রে মঙ্গলও বয়ে আনে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পুরণ করুন

১.১. অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি মহাদেশের ________ অথবা মহাসমূদ্রের ________অবস্থিত।

১.২. দ্বিতীয় আগ্নেয় মন্ডল উত্তর মহাসাগরের আইসল্যান্ড দ্বীপ হয়ে দক্ষিন ________ ও ________ দ্বীপ হয়ে গিনি উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

১.৩. মোনালোয়া পৃথিবীর সবচেয়ে ________ আগ্নেয়গিরি।

১.৪. মোনালোয়া সাগরতলে নিচে ________ ফুট এবং শিখরদেশে ________ ফুট উর্ধ্বে অবস্থিত।

উত্তর ঃ

১.১. উপকুলে; তলদেশে

১.২. এ্যাজোরর্স; কেপভার্ড

১.৩. উচ্চতম

১.৪. ১৬,০০০ ফুট; ১,৪০০০ ফুট

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১। আগ্নেয়গিরি কি কি অপকার করে ?

২। আগ্নেয়গিরির সুফল লিখুন।

৩। আগ্নেয়গিরির প্রধান দুটি মন্ডলের বিবরণ দিন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. আগ্নেয়গিরির ভৌগোলিক অবস্থান ও অগ্নুৎপাতের ফলাফল বর্ণনা করুন।

ইউনিট ৬

বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবন

পাঠ ৬.১ ঃ বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবন সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভূ-পৃষ্ঠে পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- বিচুর্ণীভবন ও নগ্নীভবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

বিচুর্ণীভবন ও নগ্নীভবন মূলত: পৃথিবীর ধীর পরিবর্তনকারী শক্তি। প্রাকৃতিক উপায়ে সংঘটিত হয় বলে এদের দ্বারা সংঘঠিত পরিবর্তনকে ধীর প্রাকৃতিক পরিবর্তন বলে। নানা প্রকার বাহ্যিক প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে দীর্ঘদিন ধরে যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে ধীর প্রাকৃতিক পরিবর্তন বলে। ভূ-পৃষ্ঠের অতি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ধীর পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নদী, বৃষ্টি, বায়ু, হিমবাহ, তুহিন, উত্তাপ, সমুদ্র প্রভৃতি ধীর পরিবর্তনের সহায়ক শক্তি। এদের দ্বারা পরিবর্তন এত ধীর গতিতে সংঘটিত হয় যে, দুই চারশত বৎসরেও উহাদের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। ধীর পরিবর্তনকারী প্রাকৃতিক শক্তিগুলি দীর্ঘ দিনের ক্ষয়সাধনের দ্বারা বৃহৎ ভূমিরূপ হতে নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। বাহ্যিক শক্তি গুলি দ্বারা আকষ্মিক পরিবর্তন কদাচিৎ সংঘটিত হয়। বাহ্যিক শক্তিগুলির প্রধান কার্যই হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠে ধীর পরিবর্তন। পরিবর্তনের সাথে ক্ষয় ও গঠণের কাজও চলে থাকে। নিচের একটি ছকের সাহায্যে এই পরিবর্তনের ধরণ এবং প্রকার দেখানো হল-

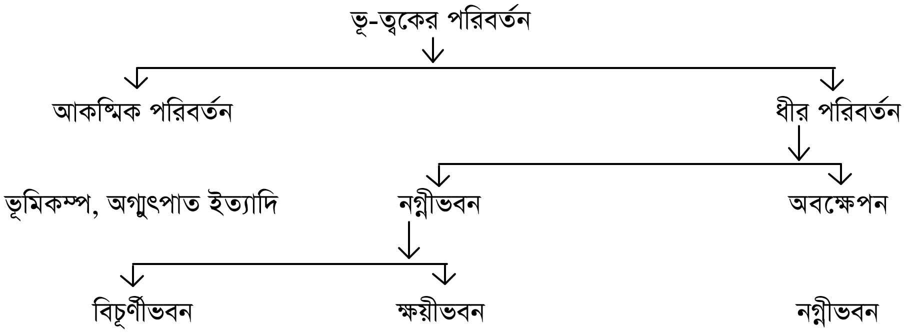

ছক ৬.১.১ ঃ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ধীর পরিবর্তন

ক্ষয় ক্রিয়ার ফলে যেমন একদিকে ভূমিক্ষয় হয় অপরদিকে ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলি অন্যত্র সঞ্চিত হয়ে নতুন ভূমি গঠন করে। এই দিক দিয়ে নিম্ন লিখিত দুইটি প্রক্রিয়া ধীর পরিবর্তনের অন্তর্ভূক্ত। যথা–

১. নগ্নীভবন (Denudation)
২. বিচূর্ণীভবন (Weathering)

নগ্নীভবন (Denudation)

নানা প্রকার যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পদ্ধতিতে ভূ-পৃষ্ঠের শিলাসমূহ অনবরত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে। কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত এই শিলাগুলির চূর্ণ-বিচূর্ণ অংশ বৃষ্টি নদীস্রোত, বায়ুপ্রবাহ, হিমবাহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা অন্যত্র অপসারিত হয় । নীচের কঠিন শিলাগুলি অপরিবর্তীত অবস্থায় নগ্ন হয়ে পড়ে ও দৃষ্টিগোচর হয়। এই প্রক্রিয়াকে নগ্নীভবন বলে। অন্যকথায় বচূর্ণীভবন, ক্ষয়ীভবন ও অপসারণের সমুদয় কার্যকে একত্রে বলা হয় নগ্নীভবন। অর্থাৎ বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ীভবনের যৌথ প্রক্রিয়ার নামই নগ্নীভবন (বিচূর্ণীভবন+ক্ষয়ীভবন=নগ্নীভবন)। নগ্নীভবন প্রাক্রিয়ায় সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ নগ্নীভবন বলতে দীর্ঘদিনের বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয় সাধণের প্রক্রিয়াকে বুঝায়। কাজেই নগ্নীভবনের প্রভাব অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী ও ব্যাপক। কোন এলাকা নগ্নীভূত হয়েছে বলতে আমরা সংশ্লিষ্ট এলাকার দীর্ঘদিনের ক্ষয়সাধনের ফলে

উল্লেখযোগ্য নিম্নতা প্রাপ্তিকে বুঝে থাকি। নগ্নীভবনের এই প্রক্রিয়া ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় সর্বত্র বিরামহীনভাবে কার্যকর। নগ্নীভবন চার ধরণের প্রক্রিয়ায় কাজ করে। যথা-

ক) বিচূর্ণীভবন, খ) স্তূপ অপসারণ,
গ) ক্ষয়সাধন ও ঘ) পরিবহন।

নগ্নীভবনের সংজ্ঞা দিন।

বিচূর্ণীভবন (Weathering)

বিচূর্ণীভবন বা আবহবিকার বলতে নানা প্রকার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিলাসমূহের চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়াকে বুঝি। বিভিন্ন যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও জৈবিক প্রাক্রিয়াগুলি ভূ-পৃষ্ঠে অনবরত কার্যকর রয়েছে এবং তাদের দ্বারা সেখানকার শিলা রাশি প্রতিনিয়ত চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে। পৃথিবীর সব স্থানের আবহাওয়া সবসময়ে সমান থাকে না। এমনকি যে কোন স্থানের যে কোন দিনের বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়ার মধ্যে যথেষ্ঠ তারতম্য ঘটে। সময়ের পরিবর্তনে আবহাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের অর্থাৎ বৃষ্টিপাত, বায়ুর উষ্ণতা, চাপ প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে। অধিক তাপে শিলাসমূহ প্রসারিত হয় আবার তাপ কমে গেলে তা সংকুচিত হয়। অতএব যে সব স্থানে বিশেষ করে দিবা-রাত্রির উষ্ণতার পার্থক্য এবং শীত গ্রীষ্মের উষ্ণতার পার্থক্য খুব বেশী সে সব স্থানে শিলাসমূহের একবার প্রসারিত ও একবার সংকুচিত হওয়ার কাজ ক্রমাগত চলতে থাকে। এভাবে সেখানকার শিলাসমূহ ক্রমশ: দূর্বল হয়ে পড়ে এবং কালক্রমে ঐ সব শিলা ধীরে ধীরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নরম ও আলগা হয়। এভাবেই বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

মনে রাখতে হবে যে, বিচূর্ণী ভবন বা আবহবিকার বলতে কেবলমাত্র বিচূর্ন প্রক্রিয়াকেই বুঝায়, এ দ্বারা বিচূর্ণীত বা ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাসমূহের স্থানান্তরও বুঝায় না। সে জন্য বিচূর্ণভবনের মাধ্যমগুলি সুনির্দিষ্ট।

সুতরাং বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ীভবনের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, ক্ষয়ীভবন শিথিল শিলাখণ্ডসমূহ দূর দেশে অপসারিত করে। কিন্তু বিচূর্ণীভবনে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা শিলাখণ্ড সামান্য স্থানচ্যুত হয়। কিন্তু শিলাখণ্ডের দূর দেশে অপসারণ হয় না। নগ্নীভবন প্রক্রিয়ার মধ্যে বিচূর্নীভবন প্রক্রিয়া ছক ৬.১.১ এর মাধ্যমে দেখান হল।

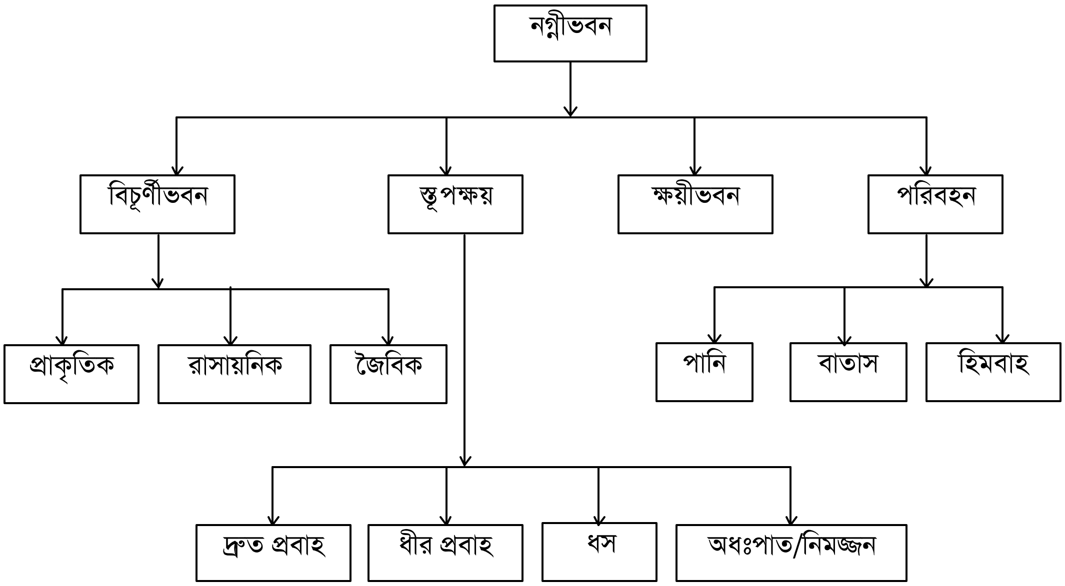

ছক ৬.১.২ ঃ নগ্নীভবন প্রক্রিয়া

ছক থেকে লক্ষ্য করুন, বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া তিন ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যথা- যান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক, রাসায়নিক ও জৈবিক। বিচূর্ণীভবনের এ প্রক্রিয়া যে ভাবেই সম্পন্ন হোক না কেন নিম্নোক্ত চারটি কাজ এর দ্বারা সম্পাদন হয়ে থাকেঃ

ক) শিলা / মাটির ক্ষয়সাধনে কাজ করে;
খ) ভূমির উচ্চতা কমাতে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে;

গ) ভূমিরূপের পরিবর্তনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে ও
ঘ) রেগোলিথ ও মাটি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

বিচূর্ণীভবন, নগ্নীভবনের একটি অংশ। নগ্নীভবন অর্থ উন্মুক্ত করা। বিচূর্ণীভবন কথার অর্থ শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া।

সারণী - ৬.১.১ ঃ বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবনের পার্থক্য

ক্রম.নং	বিচূর্ণীভবন (Weathering)	নগ্নীভবন (Denudation)
০১.	যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়ায় শিলারাশির চূর্ণ-বিচূর্ণ বা বিশ্লিষ্ট হলে তাকে বিচূর্ণীভবন বলে।	বিচূর্ণীভূত পদার্থ ক্ষয়সাধনের ফলে অপসারিত হলে নিচের অবিকৃত শিলা দৃষ্টিগোচর বা নগ্ন হয়। এই প্রক্রিয়াকে নগ্নীভবন বলে।
০২.	সূর্যতাপ, তুষার, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভৃতি যান্ত্রিক উপাদান, বিভিন্ন রাসায়নিক ও জৈবিক উপাদান বিচূর্ণীভবন সংঘটিত করে।	এ সকল বিবিধ উপাদান নগ্নীভবন প্রক্রিয়ায় সূচনা করে মাত্র।
০৩.	বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়ায় নগ্নীভবনের কোন প্রয়োজন নেই।	বিচূর্ণীভবন ব্যতীত নগ্নীভবন কখনো সম্ভবপর নয়। তাই বিচূর্ণীভবন নগ্নীভবন প্রক্রিয়ার একটি অংশ বিশেষ।
০৪.	মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ব্যতীত বিচূর্ণীভবনের সময় শিলারাশির কোন অপসারণ বা ক্ষয়সাধন হয় না।	শিলারাশির অপসারণ বা ক্ষয়সাধনের ফলেই নগ্নীভবন দেখা যায়।

বিচূর্ণীভবনের শ্রেণীবিভাগ

১। যান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন (Mechanical or Physical weathering) ঃ যেখানে ভূ-পৃষ্ঠের শিলাসমূহ উত্তাপের তারতম্যে, তুষারের কার্যে এবং আংশিকভাবে গাছপালা ও জীবজন্তুর ক্রিয়াকলাপে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়।

২। রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন (Chemical weathering) ঃ যেখানে বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত পানি, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং জৈব পদার্থ ও এগুলোর অবশিষ্ঠাংশের দ্বারা শিলার খনিজ দ্রব্যসমূহ বিয়োজিত ও দ্রবীভূত হয়ে আলগা হয়ে পড়ে।

৩। জৈবিক বিচূর্ণীভবন (Biological weathering) ঃ জীবজন্তু ও বিভিন্ন জৈব পর্যায়ের দ্বারা সংঘটিত বিচূর্ণীভবনকে অনেক সময় জৈবিক বিচূর্ণীভবন নামে অভিহিত করা হয়। জৈবিক বিচূর্ণীভবন যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক উভয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কাজ করে থাকে।

জৈবিক বিচূর্ণীভবন যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক উভয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কাজ করে থাকে

বিচূর্ণীভবনকে প্রধান দুটো ভাগে ভাগ করা হলেও একটিকে অপরটি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা একেবারেই অসম্ভব। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সামান্যতম জলীয়বাষ্পের অবস্থান, রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনকে পৃথিবীর সর্বত্র কাজ করতে সাহায্য করে থাকে। তবে সুবিধার জন্য আমরা যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, এই দুই প্রকার বিচূর্ণীভবন একত্রেই কাজ করে থাকে।

পাঠসংক্ষেপ

বিচূর্ণীভবন, নগ্নীভবনের একটি অংশ। নগ্নীভবন অর্থ উন্মুক্ত করা। ভূ-অভ্যন্তরস্থ শক্তি ভূ-ত্বকে বিভিন্ন ধরণের ভূমিরূপ গড়ে তোলে। অন্যদিকে নগ্নীভবন এই ভূমিরূপকে সর্বদা ক্ষয় করে সমুদ্র সমতলে নিয়ে আসার কাজে লিপ্ত থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত শিলা অন্যত্র অপসারিত হয় নগ্নীভবনে। অন্যদিকে বিচূর্ণীভবণে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় বা রাসায়নিক ভাবে দ্রবীভূত হয়। বিচূর্ণীভবনকে প্রধান দুটো ভাগে ভাগ করা হলেও একটিকে অপরটি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা একেবারেই অসম্ভব। বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া তিন ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন- (১) প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক, (২) রাসায়নিক ও (৩) জৈবিক প্রক্রিয়ায়। বিচূর্ণীভবন চারটি কাজ সম্পাদন করে থাকে। যথা- (১) শিলার ক্ষয়সাধন, (২) ভূমির উচ্চতা হ্রাস, (৩) ভূমিরূপের পরিবর্তন ও (৪) রেগোলিথ ও মাটি গঠনে ভূমিকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. শূল্যস্থান পূরণ করুণ

১.১. আকস্মিক পরিবর্তন ____________________সংগঠিত হয়।

১.২. ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থগুলি অন্যত্র ______________ হয়।

১.৩. শিলাসমূহ অনবরত ____________________ হয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে।

১.৪. অধিক তাপে শিলাসমূহ _________________ হয়।

উত্তর ঃ ১.১. কদাচিত ১.২ জমা ১.৩ চূর্ণ-বিচূর্ণ ১.৪. প্রসারিত

২. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন-

২.১ নগ্নিভবন প্রক্রিয়া সমূদ্র তলদেশে সংঘটিত হয়।

২.২. জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ বিচূর্ণীভবনে সাহায্য করে।

২.৩. বরফ প্রধান অঞ্চলে ভূমিকম্প হয় না।

উত্তর ঃ ২.১. মি ২.২. স ২.৩. মি

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. প্রাকৃতিক পরিবর্তন কত প্রকার কি কি?

২. ধীর পরিবর্তনের ৩টি মাধ্যমে ও নাম বলুন।

৩. নগ্নীভবন পৃথিবীর সর্বত্র হয় কি?

৪. বিচূর্ণীভবন বলতে ক্ষয়িত শিলার স্থানান্তর বুঝায় কি?

৫. প্রাকৃতিক পরিবর্তন বলতে কি বুঝেন?

৬. ভূ-ত্বকের পরিবর্তনের ছকটি দিন।

৭. নগ্নীভবন সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৮. বিচূর্ণীভবন বলতে কি বুঝেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবন সম্পর্কীত সাধারণ আলোচনা করুন।

২. বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

৩. বিচূর্ণীভবনের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ ৬.২ ঃ বিচূর্ণীভবনের প্রভাবক সমূহ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বিচূর্ণীভবনের প্রভাবকারী উপাদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।

নিচে বিচূর্ণীভবনের বিভিন্ন প্রভাবক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলঃ

ক) তাপ (Heat) ও তাপমাত্রা (Temperature) ঃ তাপ ও তাপমাত্রা বিচূর্ণীভবনের অন্যতম প্রধান নিয়ামক। সূর্য্যের তাপমাত্রা বেশী হলে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে সাহায্য করে। আবার তাপমাত্রা কম হলে অর্থাৎ শীতলতায় শিলা সংকুচিত হয়ে বিচূর্ণ হয়। ক্রমাগত তাপমাত্রার বৃদ্ধি এবং হ্রাস পাওয়াতে শিলা সম্প্রসারণ এবং সংকুচিত হয়। এই ক্রমাগত সংকোচন-প্রসারণেই শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

খ) বৃষ্টিপাত (Rain) ঃ বৃষ্টিপাত বিচূর্ণীভবনে সাহায্য করে থাকে। বৃষ্টিপাতের ঘর্ষণ এবং বৃষ্টির পানির রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে পানি বছরের পর বছর ধীরে ধীরে শিলাখন্ডকে আঘাত করে দূর্বল করে ফেলে এবং এতে শিলাগুলো খন্ড-বিখন্ড হয়ে যায়। কখনও কখনও বৃষ্টির পানি নরম পাললিক শিলা এবং ছিদ্রযুক্ত রূপান্তরিত শিলার মধ্যে প্রবেশ করে এবং শিলা স্তরকে আর্দ্র করে ফেলে। তার ফলে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে সাহায্য করে।

গ) মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ঃ উচ্চ পর্বতের খাড়া ঢালে কোন প্রকান্ড শিলাখন্ড কোন প্রকারে ভেঙে আলগা হলে মাধ্যার্কষণ শক্তির প্রভাবে তা ভূ-পৃষ্ঠের দিকে নামতে থাকে এবং অন্যান্য শিলা খন্ডের সাথে ঘাত প্রতিঘাতে বিচূর্ণীত হয়।

ঘ) জীবজন্তু ও কীট পতঙ্গ ঃ জীবজন্তু এবং কীটপতঙ্গ বিচূর্ণীভবনে সাহয্য করে। নানা প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে কেঁাচো, ইঁদুর, পিঁপড়া, কুকুর প্রভৃতি সর্বদা মাটি খুড়ে ওলট-পালট করে ভূ-ত্বকের পরিবর্তন সাধিত করে। এই পরিবর্তন খুব সুক্ষ্ম এবং ধীর প্রক্রিয়ায় হয়।

বিচূর্ণীভবনের প্রভাবক সমূহ ঃ তাপ ও তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, জীবজন্তু ও কীট পতঙ্গ, নদীর প্রভাব, বায়ু, হিমবাহ ও তুষারের কার্য।

ঙ) নদীর প্রভাব ঃ ভূ-ত্বকের পরিবর্তনকারী শক্তিগুলোর মধ্যে নদী সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক গতিতে ক্ষয়কার্যের দ্বারা যে সমস্ত শিলা রাশি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় মধ্যগতিতে নদী সেগুলি বহন করে বহু দূরে নিয়ে যায়। প্রাথমিক গতি শেষ হবার পরেই পাহাড়ের পাদদেশে প্রচুর পরিমাণে বৃহদাকৃতির শিলাখন্ড সঞ্চিত হয়। সমভূমি অঞ্চলে স্রোতবেগ কম থাকায় এবং অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয় বলে সেখানে প্রচুর পরিমাণে বিচূর্ণীত শিলা কণা সঞ্চিত হয়। এইরূপ সঞ্চয়ণের ফলে মধ্যগতিতে প্রাকৃতিক বাঁধ, প্লাবনভূমি প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এছাড়া এ সময়ে নদী প্রত্যক্ষভাবে আঘাত, ঘর্ষণ ও কর্ষণ দ্বারা ক্ষয় সাধনের কাজ করে থাকে।

চ) বায়ু ঃ বায়ু প্রবাহের ফলে কঠিন শিলাগুলি স্থানান্তরিত হবার সময় তাদের আঘাতে অপেক্ষাকৃত কোমল শিলাগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বিশেষ করে কোয়ার্টজ জাতীয় শিলার সংস্পর্শে কোমল শিলাগুলি অতি সহজেই ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ঘর্ষণ। দীর্ঘদিন ঘর্ষণের ফলে শিলাকণাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে মসৃন আকার ধারণ করে এবং শিলাগুলি বিচূর্ণীত হয়।

ছ) হিমবাহ ঃ নদীর মত হিমবাহও ক্ষয়কার্য ত্বরান্বিত করে। হিমবাহ উপত্যকা দিয়ে ভারী তুষারখন্ড নিচের দিকে ধাবিত হবার সময় এর ধাক্কায় প্রচুর পরিমাণে শিলাখন্ড বিচ্যুত হয়। এই ধাবমান শিলাখন্ড এর নিচের শিলাকে আঘাত করে এবং খন্ড-বিখন্ড করে। এই ভাবে ক্রমাগত ঘর্ষণ এবং বিচূর্ণণের দ্বারাই বিচূর্ণভবন প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

জ) তুষারের কার্য ঃ শীতপ্রধান অঞ্চলে বরফের প্রাচুর্য অধিক বলে সেখানে ভূমিরূপের পরিবর্তনে উহার প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ষার সময় সেখানকার ফাটলসমূহে বৃষ্টির পানি জমে অত্যাধিক শীতে জমাট বেঁধে তুষারে পরিণত হয়। তখন উহার আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং তুষারের প্রচন্ড চাপে ফাটলসমূহ অধিকতর প্রসারিত হয়। কাজেই শিলাস্তর ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। এই বিচূর্ণ শিলাখন্ডগুলি পরবর্তী সময়ে নানা প্রকার প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে অন্যত্র বাহিত ও সঞ্চিত হয়। উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় ভগ্ন প্রস্তর খন্ডগুলি স্বাভাবিকভাবেই বেশ ধারাল ও কৌনিক হয়। ভূ-পৃষ্ঠের পানি প্রবাহের অন্যতম উৎস তুষার।

উচ্চতাপের ফলে তুষার গলে গেলে সেই স্থানে যে পানি নির্গত হয় তা-ই অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তীতে বড় বড় পানি প্রবাহের সৃষ্টি করে। এইরূপ তুষার পরোক্ষভাবে ভূ-পৃষ্ঠের ব্যাপক ক্ষয়সাধন ও পরিবর্তন করে থাকে।

এই প্রভাবকগুলো কিভাবে কাজ করে তা নিচে বর্ণনা করা হ'ল।

১। তুষারের মাধ্যমে ঃ শীত প্রধান নলাকার বিশেষত তুন্দ্রা এলাকায় পালাক্রমে বরফ জমা ও গলে যাওয়া অবস্থা শিলার ভাঙনে সাহায্য করে। আমরা জানি, পানি বরফে পরিণত হলে আয়তনে বাড়ে। প্রথমে শিলার ফাঁটল বরাবর পানি প্রবেশ করে। এ অবস্থায় বাতাসের তাপমাত্রার ০° বা তার নীচে নামলেই ফাটলের পানি বরফে পরিণত হয় এবং আয়তনের ১০% বৃদ্ধি পায়। ফলে বরফের জন্য পানির চেয়ে বেশী জায়গা প্রয়োজন হওয়ায় তা ফাঁটলে চাপ বৃদ্ধি করে। এ প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলতে থাকায় এক পর্যায়ে ফাঁটল বরাবর শিলা ভেঙে যায়। উচ্চ পার্বত্য এলাকার যেখানে নিয়মিত বরফ পড়ে এবং গলে যায় সেখানে এ প্রক্রিয়ায় শিলা সহজেই ভেঙে নিম্নঢালে জমা হয়। এ জাতীয় শিলাখন্ড টেলাস নামে পরিচিত।

পানি বরফ হলে আয়তনে বাড়ে না কমে?

চিত্র ৬.২.৩ ঃ বিচূর্ণভবনে তুষারের কাজ

চিত্র ৬.২.৪ ঃ টিলাস স্ক্রি

২। তাপমাত্রার পরিবর্তন ঃ মরুভূমি এলাকায় দিনে প্রচন্ড সূর্যতাপে শিলার খনিজসমূহ আয়তনে বাড়ে, রাতে ঠান্ডায় তা সংকুচিত হয়। এভাবে ক্রমাগত সম্প্রসারণ ও সংকোচন প্রক্রিয়া কার্যরত থাকায় শিলার খনিজ সমূহের বাঁধন দুর্বল হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে খনিজসমূহ শিলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

চত্র ৬.২.৫ ঃ বিচূর্ণভবনে তাপের কাজ

এই পদ্ধতিতে কখনও শিলার বর্হিভাগের কয়েক সেন্টিমিটার ব্যাপী পিয়াঁজের খোসার ন্যায় শিলাস্তর খসে পড়ে। একে এস্কফোলিয়েশন (Exfoliation) বলে। এ ধরণের শিলাস্তর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর একই প্রক্রিয়া পুনরায় কাজ করে। অর্থাৎ মূল শিলা সম্পূর্ণভাবে বিচূর্ণীভূত না হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এই পদ্ধতিতে কখনও কখনও বৃহৎ শিলার উপরের স্তর সরে গেলে কিছুটা গোলাকৃতির ভূমিরূপ তৈরী করে। একে এক্সফোলিয়েশন ডোম বলে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের ইরোসোমাইট ভ্যালিতে এ ধরণের ভূমিরূপ দেখা যায়।

চিত্র ৬.২.৬ ঃ এক্সফোলিয়েশন ডোম

৩। চাপমুক্ত হওয়া ঃ ভূ-অভ্যন্তরে সৃষ্ট আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা ওপরের পাললিক শিলাস্তরের চাপে সংকুচিত অবস্থায় থাকে। ওপরের শিলাস্তর অপসারিত হলে ভূ-অভ্যন্তরের শিলার ওপর চাপ পায়। ফলে এ সমস্ত শিলা কিছুটা সম্প্রসারিত হয়। এ অবস্থায় শিলার ওপরের স্তর নিচের মূল শিলা থেকে ধীরে ধীরে আলাদা হয়ে যায়। গ্রানাইট জাতীয় শিলায় এ ধরণের বিচূর্ণীভবন দেখা যায়।

৪। শিলার সংকোচন ঃ অনেক সময় মরু অঞ্চলে সূর্যের প্রখর উত্তাপে শিলাস্তর যথেষ্ট প্রসারিত হয়। এ সময় হঠাৎ বৃষ্টিপাত হলে উত্তপ্ত শিলাস্তর দ্রুত শীতল হয়ে সংকুচিত হবার সময় ফেটে খন্ড বিখন্ড হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়।

৫। শিলার অসম সংকোচন ও প্রসারণ ঃ শিলা নানা প্রকার খনিজের সমন্বয়ে গঠিত। এ সব উপাদান একই উষ্ণতায় উপাদানের পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন হারে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। সুতরাং দিনের পর দিন অসমানভাবে প্রসারিত ও সংকুচিত হবার ফলে শিলার মধ্যে বিভিন্ন টানের সৃষ্টি হয় এবং তা ফেঁটে যায়। এভাবে শিলা বিভিন্ন খনিজের মধ্যস্থিত সংযোগ সাধক পদার্থের মধ্য দিয়ে ফাঁটলে তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়াকে ক্ষুদ্র কণা বিশরণ বলে।

ক্ষুদ্র কণা বিশরণ কাকে বলে?

৬। পানির মাধ্যমে ঃ পানির মাধ্যমে সাধারণতঃ ৩টি প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক বিচূর্ণন সংঘটিত হয়। যেমন–
ক. বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে পানি বছরের পর বছর ধরে আঘাত করে শিলাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে।
খ. কখনও কখনও বৃষ্টির পানি নরম পাললিক শিলা এবং ছিদ্রযুক্ত রূপান্তরিত শিলার মধ্যে প্রবেশ করে শিলাকে বিচূর্ণ করে।
গ. আবার পানি শিলাস্তরে প্রবেশ করে খনিজ দ্রব্যকে আয়তনে বাড়িয়ে বিচূর্ণন ঘটায়।

৭। মাধ্যাকর্ষন শক্তির প্রভাবে ঃ উচ্চ পর্বতের খাড়া ঢালে কোন প্রকান্ড শিলা খন্ড কোন প্রকারে ভেঙে আলগা হয়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নীচে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। পতিত শিলার আঘাতে পাদদেশের শিলাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। এটা ক্রমাগত প্রক্রিয়া।

পাঠসংক্ষেপ

বিচূর্ণীভবন, নগ্নীভবনের একটি অংশ। নগ্নীভবন অর্থ উন্মুক্ত করা। ভূ-অভ্যন্তরস্থ শক্তি ভূ-ত্বকে বিভিন্ন ধরণের ভূমিরূপ গড়ে তোলে। অন্যদিকে নগ্নীভবন এই ভূমিরূপকে সর্বদা ক্ষয় করে সমুদ্র সমতলে নিয়ে আসার কাজে লিপ্ত থাকে। বাহ্যিক প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ধারা শিলার চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়াকে প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন বলে। প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন মরুভূমি অঞ্চলে যেখানে উত্তাপের দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে তুষারের প্রভাব খুব বেশী সেখানে খুব বেশী হয়ে থাকে। তুষার, অসম তাপমাত্রা, শিখার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন সংঘটিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূরণ করুণ

১.১.তাপ ও ______________ বিচূর্ণীভবনের অন্যতম প্রধান নিয়ামক।

১.২.বৃষ্টিপাতের ___________________ এবং বৃষ্টির পানির রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

১.৩.জীবজন্তু এবং _________________ বিচূর্ণীভবনে সাহয্য করে।

১.৪.নদীর প্রাথমিক গতি শেষ হবার পরেই পাহাড়ের পাদদেশে প্রচুর পরিমাণে বৃহদাকৃতির ________সঞ্চিত হয়।

উত্তর ঃ ১.১.তাপমাত্রা ১.২. ঘর্ষণ ১.৩. কীটপতঙ্গ ১.৪. শিলাখন্ড

২। সত্য হলে ‘স’ এবং মিথ্যা হলে ‘মি’ লিখুন

২.১.তাপ ও তাপমাত্রা বিচূর্ণীভবনের অন্যতম প্রধান নিয়ামক।

২.২. বৃষ্টিপাত বিচূর্ণীভবনে সাহায্য করে না।

২.৩.ভূ-ত্বকের পরিবর্তনকারী শক্তিগুলোর মধ্যে নদী সবচাইতে গুরুত্বপূর্ন।

২.৪.নদীর মত হিমবাহও ক্ষয়কার্য ত্বরান্বিত করে।

উত্তরসমূহ ঃ ২.১.স ২.২. মি ২.৩. স ২.৪.স

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. বিচূর্ণীভবনের প্রভাবক বলতে কি বুঝেন ?
২. প্রধান প্রধান প্রভাবকের নাম লিখুন।
৩. এক্সফোলিয়েশন ডোম কাকে বলে?
৪. পানির মাধ্যমে কি কি প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক বিচূর্ণন হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিচুর্ণীভবন কাকে বলে? বিচূর্ণীভবনের প্রভাবকারী উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ ৬.৩ ঃ যান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন
(Mechanical or Physical Weathering)

এই পাঠ শেষে আপনি—

- প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন কি তা বলতে পারবেন;
- প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

বাহ্যিক প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের দ্বারা শিলার চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়াকে প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন বলে। প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন মরুভূমি অঞ্চলে যেখানে উত্তাপের দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে তুষারের প্রভাব খুব বেশী সেখানে অধিক হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন সাধারণত: সূর্যের তাপ, তুষার, বৃষ্টি, শিলার চাপহ্রাস এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা হয়ে থাকে।

যান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া
যে যে মাধ্যমের দ্বারা প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন সংঘটিত হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

যাান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন উত্তাপের দ্রুত পরিবর্তনে এবং কেলাসন প্রক্রিয়ার দ্বারা ঘটে থাকে। মরু অঞ্চলে মেঘ মুক্ত থাকার দরুন দিবা ভাগ খুবই উত্তপ্ত এবং রাত্রি ভাগ ঐ একই কারণে খুব শীতল হয়ে থাকে। ফলে মরু অঞ্চলে উত্তাপের দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আবার উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে অথবা উচ্চ অক্ষাংশে অধিক শৈত্যের জন্য পানি কেলাসিত হয়ে বরফে পরিণত হয়। সুতরাং মরু অঞ্চল এবং উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল ও উচ্চ অক্ষাংশে যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবনের ক্রিয়া অধিক লক্ষ্য করা যায়।

> শিলার যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন তাপমাত্রা, তুষার, পানি, চাপেরহ্রাস, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও লবন কেলাস গঠনের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

ভূ-পৃষ্ঠের কঠিন শিলা আবরণ যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয় তাকেই প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন বলে। শিলাখণ্ডের আয়তন বড় পাথর থেকে পলিকণা পর্যন্ত বিভিন্ন রকম হতে পারে। শিলা নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে থাকে।

১) তাপমাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে;
২) তুষারের মাধ্যমে;
৩) পানির মাধ্যমে;
৪) চাপহ্রাসের মাধ্যমে;
৫) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে ও
৬) লবণ কেলাস গঠনের মাধ্যমে।

১) তাপমাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে
সূর্যতাপের প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের শিলারাশি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবনে সহায়তা করে থাকে। মরুভূমি এলাকায় দিনের প্রচণ্ড সূর্যতাপে শিলার খনিজসমূহ আয়তনে বাড়ে, রাতে ঠাণ্ডায় তা সঙ্কুচিত হয়। এভাবে ক্রমাগত সম্প্রসারণ ও সংকোচন প্রক্রিয়া কার্যরত থাকায় শিলার খনিজসমূহের বাঁধন দুর্বল হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে খনিজসমূহ শিলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শিলা স্তরের উপরেই স্বাভাবিকভাবে সূর্যরশ্মি পতিত হয়। তখন শিলা উত্তপ্ত হয়ে পার্শ্ব বা নিচের দিকে প্রসারিত হতে না পেরে উপরের দিকে প্রসারিত হয়। এর ফলে শিলার উপরের স্তর নিচের শীতল স্তর থেকে পৃথক হয়ে স্তরে স্তরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এটা অনেকটা পেঁয়াজের খোসার ন্যায় খুলে যায়। শিলার এরূপ বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে শিলার স্তর মোচন (Exfoliation) বলা হয়। এভাবে শিলার উপরের অংশ আলগা হয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হতে থাকে এবং কালক্রমে গোলাকার রূপ ধারণ করে। এ জাতীয় বিচূর্ণীভবনকে গোলাকৃতি বিচূর্ণীভবনও (Spheroidal weathering) বলা হয়। এভাবে সৃষ্ট গোলাকার শিলাখণ্ডকে অবশিষ্ট শিলা (Residual Rock) বলে। এটি গ্রানাইট শিলায় অধিক দৃষ্ট হয়।

> অবশিষ্ট শিলা গ্রানাইট শিলায় অধিক দৃষ্ট হয়।

যেহেতু শিলাসমূহ বিভিন্ন খনিজের সমন্বয়ে গঠিত, সেহেতু শিলায় অবস্থিত বিভিন্ন খনিজ বিভিন্ন ভাবে প্রসারিত ও সংকুচিত হয়। এর ফলে শিলায় বিভিন্ন টান (Strain) সৃষ্টি হয়ে শিলা হঠাৎ ফেটে যায়। মরু-অঞ্চলে সূর্যাস্তের কিছু পরে অনেক সময়

এরূপ শিলা ফেটে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এভাবে শিলা বিভিন্ন খনিজের মধ্যস্থিত সংযোগ সাধক পদার্থের (Cementing material) মধ্য দিয়ে ফাঁটলে তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয় বলে একে ক্ষুদ্রকণা বিশরণ (Granular disintegration) বলে। সূর্যতাপে শিলার উপরের স্তর উত্তপ্ত হলে তা আয়তনে বৃদ্ধি পায়। যেহেতু শিলাস্তর তাপের উত্তম পরিবাহী নয় বলে তার ঠিক নিচের স্তরটি বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। এর ফলে শিলাসমূহের উপরের স্তর এবং তার ঠিক নিচের স্তরের মধ্যে টানের সৃষ্টি হয় বলে শিলাস্তরের মাঝে সমান্তরালে ফাঁটলের সৃষ্টি হয়। এর কিছু দিন পরে ঐ ফাটল বরাবর শিলার উপরের স্তরটি মূল শিলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরূপ অবস্থাকে প্রস্তর চাঁই এর বিচ্ছিন্নকরণ বা খণ্ডীকরণ (Block disintegration) বলা হয়। পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত অঞ্চলে এ প্রকার বিচূর্ণীভবন দেখা যায়।

পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত অঞ্চলে প্রস্তর চাঁই এর বিচ্ছিন্নকরণ বা খণ্ডীকরণ বিচূর্ণীভবন দেখা যায়।

২) তুষারের মাধ্যম

অধিকাংশ শিলায় ফাঁটল দেখতে পাওয়া যায়। এইসব ফাঁটলে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে থাকে। রাত্রিতে পানি শীতল হয়ে বরফে পরিণত হলে আয়তনে শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। শীতল জলবায়ু অঞ্চলে অথবা উচ্চ অক্ষাংশে বা উচ্চ পর্বত গাত্রে গ্রীষ্মকালে বরফ গলে অথবা বর্ষাকালে শিলাস্তরের ফাঁটলের মধ্যে পানি সঞ্চিত হলে তা পরে অত্যধিক ঠাণ্ডায় জমে বরফে পরিণত হয়। তার ফলে ফাঁটলের মধ্যস্থিত পানি বরফে পরিণত হয়। ফাঁটলের দুই পার্শ্বের দেয়ালে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে (প্রতি বর্গ সে.মি. প্রায় ১৪ কিলোগ্রাম)। এই চাপের ফলে ফাঁটল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং শিলাস্তর ফেঁটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডে পরিণত হয়। এই প্রস্তর খণ্ডগুলো পর্বতগাত্র বেয়ে পর্বতের পাদদেশে এসে জমে। এরূপে কোনো বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকার শিলাখণ্ডের দ্বারা আবৃত অঞ্চলকে ফেলসেনমার বা ব্লকস্পেড (Felsenmer or Blockspade) বলে। পর্বত গাত্রে কোণাকৃতি এরূপ প্রস্তর খণ্ড সঞ্চিত হলে তাকে স্ক্রী (Screes) বা ট্যালাস (Tallus) বলে। সচ্ছিদ্র (Porous) মৃত্তিকার মধ্যেও পানি বরফে পরিণত হলে মৃত্তিকা ফেটে যায়। শীত প্রধান দেশে কৃষিক্ষেত্রের বড় বড় মাটির ঢেলা (Clods of earth) তুষারের ক্রিয়ায় ফেটে যায়। এতে পরবর্তী কৃষিকার্যের সুবিধা হয়।

নতুন শব্দঃ ফেলসেনমার বা ব্লকস্পেড, স্ক্রী (Screes) বা ট্যালাস।

৩) পানির মাধ্যমে

পানি তিন প্রক্রিয়ায় বিচূর্ণীভবনে সহায়তা করে থাকে। যেমন- (১) বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে পানি বছরের পর বছর ধরে শিলাখণ্ড গুলোকে আঘাত করে দুর্বল করে ফেলে এবং এতে শিলাখণ্ড গুলো ক্রমশঃ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। (২) কখনো কখনো পানি নরম পাললিক শিলা এবং ছিদ্রযুক্ত রূপান্তরিত শিলার মধ্যে প্রবেশ করে এবং শিলাস্তরকে আর্দ্র করে ফেলে। পরে সূর্যের তাপে ঐ পানি বাষ্পে পরিণত হয় এবং শিলাখণ্ড গুলো পুনরায় শুকিয়ে যায়। শিলাস্তরের অভ্যন্তর ভাগ এরূপে ক্রমাগত আর্দ্র ও শুষ্ক হবার দরুন তা ভেঙ্গে গিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলা খণ্ডে পরিণত হয় এবং যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন ঘটায়। (৩) আবার শিলাস্তরে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে শিলাস্তরকে আর্দ্র করে। এতে শিলার মধ্যস্থিত খনিজ দ্রব্যগুলো আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে শিলাস্তরকে ফাঁটিয়ে দেয়। এভাবেও যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন ঘটে। উপকূল অঞ্চলে জোয়ার-ভাটার প্রভাবে এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়।

৪) চাপ হ্রাসের মাধ্যমে

ভূ-অভ্যন্তরে সৃষ্ট আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা ওপরের পাললিক শিলা স্তরের চাপে সংকুচিত অবস্থায় থাকে। ওপরের শিলাস্তর অপসারিত হলে ভূ-অভ্যন্তরের শিলার উপর চাপ হ্রাস পায়। ফলে এ সমস্ত শিলা কিছুটা সম্প্রসারিত হয়। এ অবস্থায় শিলার ওপরের স্তর নিচের মূল শিলা থেকে ধীরে ধীরে আলাদা হয়ে যায়। গ্রানাইট জাতীয় শিলায় এ ধরণের বিচূর্ণীভবন দেখা যায়।

গ্রানাইট জাতীয় শিলায় চাপহ্রাসের মাধ্যমে বিচূর্ণীভবন দেখা যায়।

৫) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে

উচ্চ পর্বত গাত্রের খাড়া ঢালে কোনো প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড কোনো প্রকারে ভেঙ্গে আলগা হলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নিচে পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। পতিত শিলার আঘাতে পাদদেশের শিলাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। আবার চলার পথে ভূ-পতিত শিলা অন্যান্য উচ্চ স্থানের শিলাগুলো সদা চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এভাবে সর্বদা যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন ঘটাচ্ছে।

৬) লবন কেলাস গঠনের মাধ্যমে

শিলার ফাঁটলে বরফ কেলাস গঠনের ন্যায় লবন কেলাস সৃষ্টিও একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শুষ্ক এলাকায় ব্যাপক ভাবে শিলা বিচূর্ণীভূত হয়। দীর্ঘ শুষ্ক মৌসুমে শিলার ফাটল বরাবর ভেতরের পানি কৈশিক শক্তির (capillary force) টানে উপরে উঠে আসে। এ পানির সঙ্গে লবন দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। পানি বাষ্পীভূত হওয়ার পর শিলার ফাঁটলে অবশিষ্ট হিসেবে এ লবন থেকে যায়। ধীরে ধীরে এ লবনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শিলার বহির্ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাকৃতিতে ভেঙ্গে যায়। আমাদের দেশে ইটের দালানে এ ধরণের প্রক্রিয়া দেখা যায়, যা সাধারণভাবে ‘লোনাধরা’ নামে পরিচিত।

বৃষ্টিপাত দ্বারা সৃষ্ট বিচূর্ণীভূত পদার্থগুলো অপসারিত হলে তা বিচূর্ণীভবনের পর্যায় পড়ে না। তবে এটি তুষারের কার্যে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া বায়ু, নদী, হিমবাহ, সমুদ্রের তরঙ্গ প্রভৃতিতে শিলা অপসারণ হয় বলে এদের কার্যও বিচূর্ণীভবনের পর্যায়ে পড়ে না।

পাঠসংক্ষেপ

ভূ-পৃষ্ঠের কঠিন শিলাবরণ যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয় তাকে প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন বলে। শিলার যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবনে তাপমাত্রা, তুষার, পানি, চাপের হ্রাস, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও লবন কেলাস গঠনের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১.শূন্যস্থান পূরণ করুন:

১.১. মরু অঞ্চল, উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল ও উচ্চ অক্ষাংশে __________ বিচূর্ণীভবনের ক্রিয়া অধিক লক্ষ্য করা যায়।

১.২. শিলা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হওয়াকে ______________ বিচূর্ণীভবন বলে।

১.৩. _________ এলাকায় দিন ও রাত্রির তাপমাত্রার পার্থক্য সর্বাধিক।

১.৪. শিলা বিভিন্ন ______________ সমন্বয়ে গঠিত।

১.৫. বিভিন্ন খনিজ বিভিন্ন ভাবে প্রসারিত ও সংকুচিত হয় বলে শিলায় বিভিন্ন__________সৃষ্টি হয়ে শিলা হঠাৎ ফেটে যায়।

১.৬. পানি শীতল হয়ে বরফে পরিণত হলে আয়তনে শতকরা _____________ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

১.৭. পর্বত গাত্রে শিলাখণ্ড ভেঙ্গে ___________ শক্তির প্রভাবে নিচে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

১.৮. বৃষ্টিপাতে বিচূর্ণীভূত পদার্থ অপসারিত হলে তা ___________ পর্যায়ে পড়ে না।

১.৯. দীর্ঘ শুষ্ক মৌসুমে শিলার ফাঁটল বরাবর ভেতরের পানি _____________ শক্তির টানে উপরে উঠে আসে।

১.১০. হঠাৎ ____________ হলে উত্তপ্ত শিলা দ্রুত শীতল হয়।

১.১১. দিনের পর দিন অসমানভাবে _________ ও ___________ হবার ফলে শিলার মধ্যে বিভিন্ন টানের সৃষ্টি হয়।

১.১২. উপরের শিলাস্তর অপসারিত হলে ______________ শিলার উপর চাপ পড়ে।

উত্তর ঃ

১.১. যান্ত্রিক; ১.২. প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক; ১.৩. মরু;
১.৪. খনিজের; ১.৫. টান (Strain); ১.৬. ১০; ১.৭. মাধ্যাকর্ষণ;
১.৮. বিচূর্ণীভবনের; ১.৯. কৈশিক .১.১০. বৃষ্টি; ১.১১.. প্রসারিত ও সংকুচিত
১.১২. মূল

২. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন

২.১. বিচূর্নভবণের মাধ্যম হল--
ক. ভূমিরূপ খ. তাপ-চাপ-তুষার
গ. পর্বত ঘ. মালভূমি

২.২. শিলার মধ্যে কিভাবে পানি প্রবেশ করে?
ক. মাঝখান দিয়ে খ. ফাঁটলের মধ্যে দিয়ে
গ. কিনারা দিয়ে ঘ. উপরিভাগ দিয়ে

২.৩. শিলা কিসের সমন্বয়ে গঠিত?
ক. বাতাস-পানি খ. মাটি ও বরফ
গ. খনিজের ঘ. মাটি

উত্তর ঃ ২.১. খ. তাপ-চাপ-তুষার, ২.২ খ. ফাঁটলের মধ্যে দিয়ে , ২.৩. গ. খনিজের

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. এক্সফোলিয়েশান ডোম কাকে বলে?
২. গ্রানাইটে কি ধরণের বিচূর্নীভবন হয়?
৩. ক্ষুদ্র কণা বিশরণ কি?
৪. পানির মাধ্যমে কি কি প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক বিচূর্নণ হয়?
৫. টেলাস স্ক্রী বলতে কি বোঝায়?
৬. এক্সফোলিয়েশন কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

পাঠ ৬.৪ঃ রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন (Chemical Weathering)

এই পাঠ শেষে আপনি—

- রাসায়নিক বিচুর্নীভবন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলার চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়াকে রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন বলে। আমরা জানি শিলা বিভিন্ন প্রকার খনিজের সমন্বয়ে গঠিত। এসব খনিজ সংযোগ সাধক পদার্থের দ্বারা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে। বিভিন্ন শিলায় বিভিন্ন খনিজ দেখতে পাওয়া যায়। এসব খনিজের উপর বায়ুস্থিত অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড (co_2), পানি ইত্যাদি বিক্রিয়া করে থাকে। এর ফলে কঠিন শিলা বিশ্লিষ্ট বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় এবং মূল খনিজ পদার্থগুলো নতুন গৌণ খনিজে পরিণত হয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যেমন- অক্সিজেন লৌহের সংস্পর্শে এলে তাতে মরিচা ধরে এবং ক্রমেই তাকে ক্ষয় করে। তাম্র, পিতল ও কাঁসা এরূপে ক্ষয় হয়। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বৃষ্টির পানির সাথে মিশে রাসায়নিক উপায়ে গ্রানাইট, চুনাপাথর প্রভৃতি কঠিন শিলাকে অবিরত খন্ড-বিখন্ড করছে। আবার পানি অনেক ক্ষেত্রে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলা রাশির বিশ্লিষ্ট ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলে রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন সবচেয়ে বেশী। কিন্তু হিম ও উষ্ণমন্ডলে এরূপ বিচূর্ণীভবন খুবই কম। রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনের ফলে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করা যায়ঃ

ক) শিলার আয়তন বৃদ্ধি পায় ও শিলার মধ্যে নানা রকম পীড়নের উদ্ভব হয়।

খ) অপেক্ষাকৃত ভারী খনিজ হালকা খনিজে পরিণত হয়।

গ) পরিবর্তিত খনিজগুলোর আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। ফলে এর পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায়।

ঘ) অধিকতর পরিবহনযোগ্য পদার্থের সৃষ্টি হয়।

ঙ) অধিকতর সুস্থিত পদার্থের উদ্ভব হয়।

চ) খনিজের গঠন কাঠামোর পরিবর্তন হয়।

রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন প্রধানত নিম্নলিখিত ৫টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয় ঃ
যথা- (ক) হাইড্রেশান বা জলযোজন, (২) হাইড্রোলিসিস, (৩) অক্সিডেশান, (৪) কার্বোনেশান বা অঙ্গারযোজন ও (৫) দ্রবণ।

বিচূর্ণ হয়।

(ক) হাইড্রেশন বা জলযোজন (Hydration) ঃ শিলার মধ্যস্থিত খনিজ পদার্থ যখন পানির সংস্পর্শে বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়, তখন তাকে হাইড্রেশন বলে। কোন কোন খনিজ বায়ু হতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পানি গ্রহণ করে আকারে বৃদ্ধি লাভ করে। এর ফলে শিলার ভিতর টানের সৃষ্টি হয়। ফলে শিলা সহজেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। এ ছাড়া জলযোজন এর ফলে খনিজের আয়তন ও ছিদ্রতলের পরিবর্তন ঘটে। এর ফলেও শিলাস্তরের বিচ্ছিন্নকরণ বা বিয়োজন ঘটে।
হাইড্রেশান প্রক্রিয়াকে যথার্থ রাসায়নিক পরিবর্তন বলা যায় না। হাইড্রলিসিস, কার্বনেশান, অক্সিডেশান হলো যথার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়া। কারণ এইসব প্রক্রিয়ায় খনিজের বিয়োজন ঘটে।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খনিজের সঙ্গে পানি যুক্ত হয়ে খনিজের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে হাইড্রেশান বলা হয়।

(খ) হাইড্রলাইসিস (Hydrolysis) ঃ এ প্রক্রিয়ায় পানি (H_2o) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এবং হাইড্রাক্সিল আয়নে (OH) ভেঙে যায় এবং এ হাইড্রক্সিল খনিজের মধ্যে রাসায়নিক উপায়ে পরিবর্তন ঘটায়। আগ্নেয় শিলায় প্রাপ্ত প্রধান দুটি খনিজ অভ্র ও ফেলস্পারের রাসায়নিক পরিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

গ) জারণ বা অক্সিডেশন (Oxidation) ঃ স্বাভাবিক অবস্থায় অক্সিজেন শিলারাশিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে না পারলেও বায়ুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকলে তা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলারাশিকে খন্ড-বিখন্ড করতে পারে। অক্সিজেনের এরূপ ক্রিয়াকে জারণ বা অক্সিডেশন বলে। আমাদের দেশে বর্ষাকালে বায়ুতে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকে বলে ঐ সময় অক্সিজেনের রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন সবচাইতে বেশী হয়। এ কারণে বর্ষাকালে লৌহের দ্রব্যে বেশী মরিচা ধরে। কারণ লৌহের সাথে অক্সিজেন অতি সহজে বিক্রিয়া করে থাকে। এ জন্য শিলার যে অংশে লৌহের পরিমাণ বেশী, সে অংশে লৌহের সাথে অক্সিজেন যুক্ত হওয়ায় লৌহের উপরিভাগের রং হলুদ বা বাদামী হয়। লৌহ যখন 'ফেরাম অক্সাইড' রূপে থাকে তখন তা খুব শক্ত হয়। কিন্তু অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এটি 'ফেরিক অক্সাইডে' পরিণত হয় এবং সহজেই খন্ড-বিখন্ড হয়। এ কারণে দেখা যায় যে লৌহ মিশ্রিত দ্রব্যে মরিচা ধরে সহজে নষ্ট হয়ে যায়।

খনিজের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন সংযুক্ত হলে তাকে অক্সিডেশান বলে।

ঘ) অঙ্গার যোজন বা কার্বনেশন (Carbonation) ঃ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বৃষ্টির পানিতে মিলিত হয়ে কার্বলিক এসিডে পরিণত হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইডের এ রাসায়নিক সংযোগকে অঙ্গার যোজন বা কার্বনেশন বলে। যেসব শিলা কার্বনিক এসিড দ্বারা গলে বা ভেঙে যায় ঐ গুলোতে সাধারণত: ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম এবং লৌহ বিদ্যমান থাকে। এই উপাদানগুলো এসিডের সংস্পর্শে আসতে শুরু করে। ফলে শিলাগুলি চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়।

বিভিন্ন খনিজের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের রাসায়নিক সংযোজনকে কার্বনেশান বলে।

ঙ) দ্রবণ (Solution) ঃ সরাসরি পানির দ্বারা খনিজ পদার্থ দ্রবিভূত হয় না বা গলে যায় না। কিন্তু শিলার মধ্যস্থিত কোন কোন খনিজ দ্রব্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এমন এক স্থানে এসে উপস্থিত হয় তখন তা সহজেই দ্রবিভূত হয়ে পড়ে বা গলে যায়। যেমন- ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($Caco_3$) যখন ক্যালসিয়াম বাই কার্বনেটে পরিণত হয়, তখন তা পানিতে দ্রবিভূত হয়ে অপসারিত হয়। তাই বলা হয়ে থাকে যে, দ্রবণ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে বিচূর্ণীভবন ঘটায়।

খনিজ পদার্থ সরাসরি পানির দ্বারা দ্রবীভূত হয় না।

পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠে অহর্নিশ এই বিচূর্ণীভবন চলছে। যেহেতু পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানে গঠিত, তাই ঐ সব পদার্থের যে কোন পরিবর্তনে রাসায়নিক প্রক্রিয়া জড়িত থাকে।

পাঠসংক্ষেপ

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলার চূর্ন-বিচূর্ন হওয়াকে রাসায়নিক বিচূর্ণভবন বলে। খনিজের উপর বায়ুস্থিত অক্সিজেন; কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2), পানি ইত্যাদি বিক্রিয়া করে থাকে। এর ফলে কার্বন শিলা বিশিষ্ট বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় এবং মূল খনিজ পদার্থগুলো নতুন গৌন খনিজে পরিণত হয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন

১.১. শিলা বিভিন্ন প্রকার ___________ সমন্বয়ে গঠিত।

১.২. অক্সিজেন __________ এর সংস্পর্শে এলে তাতে মরিচা ধরে।

১.৩. কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বৃষ্টির পানিতে মিসে _____________ এসিডে পরিণত হয়।

উত্তর ঃ ১.১. খনিজের ১.২. লৌহের ১.৩. কার্বলিক

২. সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

২.১. রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়ায় খনিজের গঠন কাঠামোর-

ক) কোনো পরিবর্তন হয় না খ) পরিবর্তন হয়

গ) পরিবর্তন হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না ঘ) শক্ত অবস্থায় থাকে

২.২. দ্রবণ ও কার্বনেশান কি ধরণের বিচূর্ণীভবণের আওতাভুক্ত -

ক) প্রাকৃতিক খ) রাসায়নিক

গ) জৈবিক ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর ঃ ২.১. (খ); ২. ২. (খ);

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন কি? রাসায়নিক বিচূর্নীভবন কোথায় বেশী হয়?

২. রাসায়নিক বিচূর্নীভবন কত প্রকার কি কি?

৩. হাইড্রেশন কি?

৪. হাইড্রলিসিস কি?

৫. অক্সিডেশন কি? অক্সিডেশন কিভাবে সংঘটিত হয়?

৬. কার্বনেশন কাকে বলে?

৭. কার্বনেশন ও দ্রবণ কিভাবে বিচূর্ণীভবন সম্পন্ন করে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন বলতে কি বোঝায় ? রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনে যে সমস্ত প্রক্রিয়া জড়িত সেগুলোর বিবরণ দিন।

২. জারণের বিশদ বিবরণ দিন। হাইড্রলাইসিস কি? দ্রবণ কিভাবে পরোক্ষভাবে রাসায়নিক বিচূর্নীভবনে সাহায্য করে?

পাঠ ৬.৫ ঃ জৈবিক বিচূর্ণীভবন (Bological Weathering)

এই পাঠ শেষে আপনি—

- জৈবিক বিচূর্ণীভবন কি তা বলতে পারবেন;
- জৈবিক বিচূর্ণীভবন কিভাবে সংঘটিত হয় সে সম্পর্কে ধারনা পাবেন;

যে প্রক্রিয়ায় মানুষ ও জীবজন্তু শিলা ও খনিজের বিচূর্ণীভবন ঘটায় তাকে জৈবিক বিচূর্ণীভবন বলে। মানুষের দ্বারা শিলার বিচূর্ণীভবন সহজে দৃষ্টি গোচর হর। কিন্তু জীবজন্তু ও বৃক্ষতরুলতাদি দ্বারা শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হলে সহজে বুঝা যায় না। জৈবিক বিচূর্ণীভবনকে প্রধানত নিম্নোক্ত তিনভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

১। উদ্ভিদের কার্য (Work of plant) ঃ উদ্ভিদ নিয়ত শিলাকে বিশ্লিষ্ট এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। বৃক্ষ মাটির ভিতর শিকড় চালিয়ে মাটিকে ফাটিয়ে দেয় এবং ক্রমে ক্রমে মাটি আলগা হয়ে পড়ে।

চিত্র ৬.৫.১ ঃ উদ্ভিদের শিকড়ের চাপে বিচূর্ণ ভবন

এতে বৃষ্টির পানি ভিতরে প্রবেশ করতে সুযোগ পায়। তাছাড়া মস্, শৈবাল, লাইকেন প্রভৃতি নানা প্রকার উদ্ভিদের দ্বারা শিলার উপরিভাগে পানি আটকিয়ে যায়। এসব উদ্ভিদের দেহ পানির এবং উত্তাপের সংযোগে পচে যায়। একে হিউমাস (Humas) বলে। এই হিউমাস বৃষ্টির পানির সংস্পর্শে আসলে জৈব এসিড (Organic acid) উৎপন্ন হয়। এই এসিড বিক্রিয়ার দ্বারা শিলাকে ক্ষয় করে। আবার বিভিন্নভাবে জীবাণু এবং কীটপতঙ্গের দেহ নিঃসৃত রস দ্বারা জৈবিক বিচূর্ণীভবন ঘটায়।

২। জীবজন্তুর কার্য (Work of animals) ঃ জীবজন্তু সর্বদা শিলাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। নানা প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে কেঁচো, ইদুঁর, ছুঁচো, পিঁপড়া, প্রভৃতি সর্বদা মাটি খুঁড়ে উলট-পালট করে। এ ছাড়া উঁই পোকা, ইঁদুর, সজারু গর্ত করে অভ্যন্তর হতে পৃথিবীর উপরে মাটি তোলে। এ ভাবে জীবজন্তু ও কীট পতঙ্গের দ্বারা ও ভূ-ত্বক চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। ভূ-ত্বকের এরূপ পরিবর্তন সুক্ষ্ম বলে এটা বোঝা যায় না।

৩। মানুষের কার্য (Works of Man) ঃ বর্তমান যুগে মানুষ নিজেদের সুবিধার জন্য নানাভাবে ভূ-ত্বকের পরিবর্তন সাধন করছে। যেমন রাস্তা-ঘাট, খাল, গৃহ, শহর-বন্দর, প্রভৃতি নির্মাণ করার জন্য মানুষ সর্বদা ভূ-ত্বককে খন্ড-বিখন্ড করছে। এ ভাবে মানুষও জৈবিক বিচূর্ণীভবনে সহায়তা করে থাকে। সাধারণত: মানুষের ক্রিয়াকর্ম চোখে পড়ে, কিন্তু তা দ্বারা যে শিলার পরিবর্তন সাধিত হয় তা সহজে বোধগম্য হয় না। কিন্তু মানুষ ও জীবজন্তু ও শিলার বিচূর্ণীভবনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

শিলা বিচূর্ণীভবনের তারতম্যের কারণ

শিলার বিচূর্ণন প্রক্রিয়া বেশ জটিল এবং অনেকগুলো নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শিলার খনিজ উপাদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কোনো কোনো খনিজ যেমন, কোয়ার্টজ মোটেও ক্ষয় হয় না। অত্যন্ত দৃঢ় এবং দীর্ঘ সময় প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। অপরদিকে, অলিভীন এবং ফেল্ডসপার অত্যন্ত ক্ষয়প্রবণ সহজেই ভাঙতে শুরু করে।

শিলার বিচূর্ণীভবন অনেকগুলো নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শিলার খনিজ উপাদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিলার বুনটও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

শিলার বুনট এ ব্যাপারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিলার ভেতর পানি প্রবেশ ক্ষমতা (ভেদ্যতা) ও অণুবীক্ষণিক ছিদ্র সান্দ্রতার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। শিলার ভেদ্যতা ও সান্দ্রতা বেশী হলে বিভিন্ন খনিজ উপাদান অতি সহজে বিচূর্ণন প্রক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাছাড়া বৃষ্টিপাত এবং উষ্ণতাও শিলার বিচূর্ণনে কাজ করে। বিশেষ করে, এক্ষেত্রে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছাড়াও সারা বছরে বৃষ্টির বন্টন, মাটির ওপর কি পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয় (পৃষ্ঠ প্রবাহ হিসেবে) এবং পানির বাষ্পায়নের পরিমাণও গুরুত্বপূর্ণ।

উপরোক্ত বিচূর্ণন নিয়ামকসমূহের তারতম্যের কারণে শিলার বিচূর্ণন হারে পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে প্রধান শিলাসমূহের বিচূর্ণন প্রকৃতি তুলে ধরা হলোঃ

গ্রানাইট ঃ এটি প্রধানত ফেল্ডসপার, কোয়ার্টজ ও মাইকা খনিজের সংমিশ্রনে গঠিত। ফেল্ডসপার পানির উপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দ্রুত বিশ্লেষিত হয়ে বিভিন্ন ধরণের কর্দম খনিজের সৃষ্টি করে (ছক-১)। মাইকা ধীরে ধীরে বিশ্লেষিত হয়। এটি সম্ভেদ তল বরাবর পানি দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ক্লোরাইড ও খনিজ গঠন করে। কোয়ার্টজ প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক খনিজ গঠন করে। কোয়ার্টজ প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক উভয় বিচূর্ণন প্রক্রিয়ায় সহজে ভাঙ্গে না। ফলে গ্রানাইট বিচূর্ণনের ফলে কোয়ার্টজ অবশিষ্ট হিসেবে থেকে যায়।

ব্যাসল্ট ঃ মিহি দানা বিশিষ্ট ব্যাসল্ট প্রধানত ফেল্ডসপার, অলিভীন ও পাইরোক্সিন খনিজে গঠিত। এটি অত্যন্ত ভেদ্য এবং সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শিলার সব খনিজই ভেঙ্গে কর্দম ও আয়রন অক্সাইডে পরিণত হয়, যা লাল বা বাদামী রঙের মৃত্তিকায় রূপ নেয়।

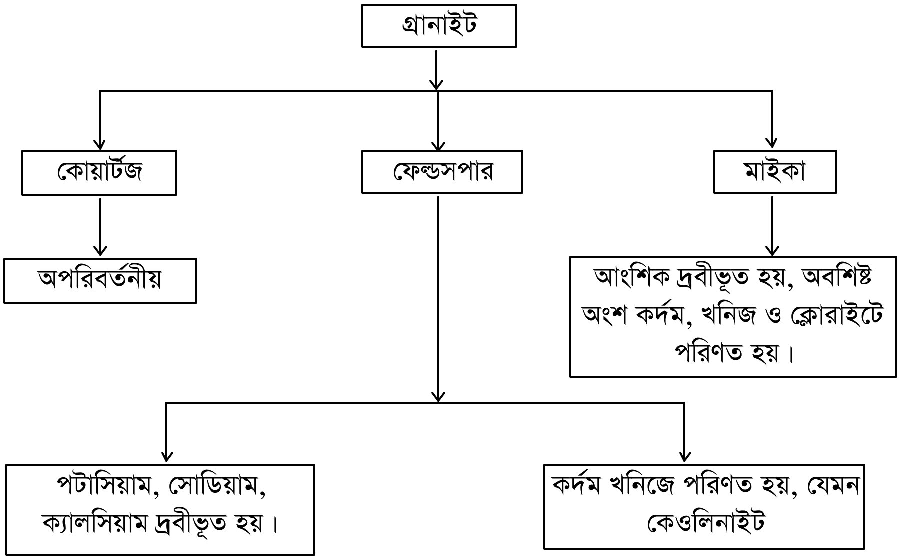

ছক-৬.৫.১ ঃ গ্রানাইটের রাসায়নিক বিচূর্ণন

বেলেপাথর ঃ এটি প্রধানত কোয়ার্টজ দানা ও স্বল্প মাত্রার ফেল্ডসপার ও কর্দম খনিজে গঠিত। কোয়ার্টজ ক্ষয়রোধী হওয়ায় বেলেপাথরের সিমেন্ট জাতীয় পদার্থসমূহ রাসায়নিকভাবে আক্রান্ত হয়। বেলে পাথরে প্রধান সিমেন্ট জাতীয় পদার্থের মধ্যে ক্যালসাইট, আয়রণ অক্সাইড এবং কোয়ার্টজ অন্যতম।

চুনাপাথর ঃ চুনাপাথর প্রধানত ক্যালসাইট জাতীয় খনিজ দ্বারা গঠিত। এটি অন্যান্য খনিজের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষয় প্রবণ। দ্রবণ প্রক্রিয়ায় ক্ষয় হয়। আর্দ্র জলবায়ু সম্পন্ন এলাকায় চুনাপাথর ক্ষয় হয়ে গুহা জাতীয় ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। শুষ্ক এলাকায় খাড়া ভৃগু বা ক্লিফ (Cliff) তৈরী করে।

শেল ঃ শেল মিহিকণা বিশিষ্ট ও নরম হওয়ায় দ্রুত ক্ষয় হয়।
প্রধান শিলা গঠনকারী খনিজ উপাদানসমূহের বিভিন্ন ধর্মী ক্ষয় প্রবণতার কারণে একই শিলা বিভিন্ন মাত্রায় ক্ষয় হয়। একে ভেদময় বিচূর্ণন (Differential weathering) বলে। ভেদময় বিচূর্ণন বড় বা ছোট জায়গা ব্যাপী সংঘটিত হতে পারে। যেমন- বিস্তৃত উঁচু পাহাড়ের গাত্র থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রায়তনের একটি পাললিক শিলাস্তরে ভেদময় বিচূর্ণন সংঘটিত হতে পারে। ভূমিরূপের ক্ষয়রোধী শিলাসমূহ অক্ষত থাকায় উঁচু শিলার সৃষ্টি করে এবং বাকী অংশ ক্ষয় হয়ে উপত্যকায় পরিণত হয়।

পাঠসংক্ষেপ

উদ্ভিদ ও প্রাণীমণ্ডল এবং মানুষ কর্তৃক শিলার চূর্ণবিচূর্ণ হওয়াকে জৈবিক বিচূর্ণীভবন বলে। গাছের শিকড় শিলার খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিলার ফাঁটল বরাবর গাছের শিকড়ের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফাটলে চাপ বাড়তে থাকে। ফলে এক সময়ে শিলা ফাঁটল বরাবর ভেঙ্গে যায়। জীবজন্তু সর্বদা শিলাকে চূর্ণবিচূর্ণ করছে। নানা প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে কেঁচো, পিঁপড়া, প্রেইরী, কুকুর প্রভৃতি মাটি খুঁড়ে সর্বদা ওলট-পালট করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মৃত্তিকার অনুজীবসমূহ শিলার প্রাকৃতিক রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনে যথেষ্ট সক্রিয় হয়। মানুষ তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নানা ভাবে ভূ-ত্বকের পরিবর্তন সাধন করছে। রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, শহর প্রভৃতি নির্মাণের জন্য প্রতিনিয়ত মানুষ ভূ-ত্বককে খণ্ড-বিখণ্ড করছে।
শিলার বিচূর্ণীভবন অনেকগুলো নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এগুলোর মধ্যে শিলার খনিজ উপাদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিলার বুনট, কোনো স্থানের বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা প্রভৃতি বিচূর্ণীভবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সত্য হলে ‘স’ ও মিথ্যা হলে ‘মি’ লিখুন।

১.১. জৈবিক বিচূর্ণীভবনও একটি যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন।

১.২. বৃক্ষ তরুলতা দ্বারা শিলা বিচূর্ণ হলে সহজে বুঝা যায় না।

১.৩. হিউমাস বৃষ্টির পানির সংস্পর্শে এলে জৈব এসিড উৎপন্ন হয়।

উত্তর ঃ ১.১. মি ১.২. স ১.৩. স

২. সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

২.১. জৈবিক বিচূর্ণীভবন ঘটায়-

ক) উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ খ) খনিজ পদার্থ

গ) আবহাওয়া ও জলবায়ু ঘ) ওপরের কোনটিই নয়।

২.২. অধিক বৃক্ষচ্ছেদনে ভূ-পৃষ্ঠে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হয় ?

ক) ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় খ) উর্বরতাহ্রাস পায়

গ) ভূমি অতি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ঘ) ওপরের কোনটিই নয়।

২.৩. শেল মিহিকণা বিশিষ্ট ও নরম হওয়ায়-

ক) দ্রুত ক্ষয় হয় না খ) দ্রুত ক্ষয় হয়

গ) শক্ত বাঁধন বিশিষ্ট ঘ) দ্রবণ ক্ষমতা কম হয়

উত্তর ঃ ২.১. (ক) ২.২. (গ) ২.৩. (খ)

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. জৈবিক বিচূর্ণীভবন কি?

২. জৈব এসিড কি?

৩. হিউমাস কি?

৪. উদ্ভিদ কিভাবে বিচূর্ণীভবন ঘটায়?

৫. প্রাণীর বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া আলোচনা করুন?

৬. মানুষ কিভাবে জৈবিক বিচূর্ণীভবনে সাহায্য করে?

৭. শিলার উপাদান ও বুনট কিভাবে বিচূর্ণীভবনে ভূমিকা রাখে?

৮. ভেদময় বিচুর্ণন বলতে কি বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. উদ্ভিদ এবং মানুষ কিভাবে শিলার পরিবর্তন ঘটায়?

২. জৈবিক বিচূর্ণীভবন বলতে কি বোঝায়? জৈবিক বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৬.৬ ঃ স্তূপ অপসারণ - দ্রুতগামী ও ধীরগামী অপসারণ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- স্তূপ অপসারণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

ইতোপূর্বে আমরা শিলা কিভাবে বিচূর্ণীভূত হয় তা জেনেছি। এবার বিচূর্ণীভূত শিলার কি পরিণতি ঘটে তা জানার চেষ্টা করি। বিচূর্ণীভূত শিলা কয়েক ধরণের অবস্থার শিকার হতে পারে। যেমন ঃ

ক) প্রথমেই বিচর্ণীত শিলা টুকরাসমূহ আরও খন্ডিত বা বিশ্লেষিত মৃত্তিকা ও ক্ষুদ্র শিলাকণা মিশ্রিত রিগোলিথ গঠণ করতে পারে। পরে শিলা আরও মিহি হয়ে মৃত্তিকা স্তর গঠণ করতে পারে। এর রিগোলিথ এবং মৃত্তিকা স্তর পানি ধারণ করে রাখার তলদেশের ভিত্তি শিলায় বিচূর্ণন ক্রিয়া সক্রিয় থাকে।

খ) বিচূর্ণীত শিলা উচ্চ ঢালে অবস্থিত হলে তা অবশ্যই মাধ্যাকর্ষণের টানে নিম্নঢালে নেমে আসবে। শিলার এ নিম্নঢাল অভিমুখী যাত্রাকে স্তূপ অপসারণ বলে। স্তূপ অপসারণ প্রক্রিয়ায় শিলা অপসারণে কোন মাধ্যম প্রয়োজন হয় না। ক্ষয়ক্রিয়ায় শিলা স্থানান্তরের জন্য পরিবহণ মাধ্যম আবশ্যক।

গ) বিচূর্ণীত শিলার কিয়দাংশ পানি বা বায়ুর মাধ্যমে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়।

রিগোলিথ গঠণ, মাধ্যাকর্ষণের টান, বিচূর্ণীত শিলার স্থানান্তর।

স্তূপ অপসারণ-এ মাধ্যকর্ষণ শক্তি কিভাবে সাহায্য করে?

স্তূপ অপসারণ মাধ্যাকর্ষণ ছাড়াও ঢাল মাত্রা ও পানি বিশেষ ভূমিকা রাখে। পানি বিচূর্ণীত শিলার ছিদ্র বা ফাঁটল বরাবর প্রবেশ করায় শিলার বাঁধন দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া পানির ওজন ও শিলার বাঁধনকেও দুর্বল করে। যে সমস্ত বিচূর্ণীত শিলা কর্দম দ্বারা গঠিত, পানি মিশ্রিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নরম হতে থাকে। পরে শিলার বাঁধন আলগা হয়ে খুব সহজেই নিম্নঢালে নেমে আসে।

শিলার উচ্চ বা খাড়া ঢাল খুব সহজেই শিলাকে বিচ্ছিন্ন হতে সাহায্য করে। শিলার ঢাল মাত্রা বৃদ্ধি পেলে বিচূর্ণীত শিলা মাধ্যকর্ষণের টানে নিম্নঢালে অপসারিত হয়। অনেকসময় মানুষের কর্মকান্ডও স্তূপ অপসারণের মাত্রা বৃদ্ধি করে। যেমন, নগর সম্প্রসারণ কাজে চট্টগ্রামে পাহাড়ী এলাকায় মাটি কেটে ফেলায় যে খাড়া ঢালের সৃষ্টি হয় তাতে বর্ষার সময় ব্যাপক স্তূপ ক্ষয়ের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকার বন উজাড়, ঢালে ঘরবাড়ি নির্মাণ, কৃষিকাজ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের কার্যকলাপ স্তূপ অপসারণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি করেছে।

অপসারিত পদার্থের নিম্নগামী বেগের ভিত্তিতে স্তূপ অপসারণ প্রক্রিয়াকে প্রধানত (ক) দ্রুতগামী ও (খ) ধীরগামী অপসারণ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক) দ্রুতগামী স্তূপ অপসারণ ঃ এই প্রক্রিয়ার আওতায় শিলা পতন (Rock falls), শিলা গড়ন, ধ্বংশাবশেষ বা ডেবরিস্ গড়ান (Debris flows), কর্দম প্রবাহ (Mud flows), বালি প্রবাহ (Sand flows) অন্তর্ভূক্ত।

দ্রুতগামী স্তূপ অপসারণ প্রক্রিয়ার আওতায় শিলা পতন (Rock falls), শিলা গড়ন, ধ্বংশাবশেষ বা ডেবরিস্ গড়ান (Debris flows), কর্দম প্রবাহ (Mud flows), বালি প্রবাহ (Sand flows) অন্তর্ভূক্ত।

শিলা পতন ঃ এ ধরণের অপসারণ পাহাড়ের খাড়া ঢালে খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়। অপসারিত শিলা ছোট আকৃতি থেকে বৃহৎ আকৃতির হতে পারে। পতিত শিলা পাদদেশে স্তূপ আকারে জমা হয় বা টেলাস স্ক্রি নামে পরিচিত।

চিত্র ৬.৬.১ ঃ দ্রুতগামী শিলার স্তুপ অপসারণ

শিলা গড়ান ঃ অপসারিত শিলা একটি নির্দিষ্ট তলা বরাবর নিম্নগামী হয় এবং সাধারণত পার্বত্য খাড়া ঢালে সংঘটিত হয়। তবে এ ধরণের অপসারণ **১৫°** অপেক্ষা কম ঢালেও ঘটতে পারে।

ডেবরিস্ গড়ান ঃ মৃত্তিকা এবং খন্ডিত শিলাসমুহ শুষ্ক বা আংশিক ভিজা অবস্থায় দ্রুত নিচের দিকে নেমে আসাকেই ডেবারিস্ গড়ান বলে।

ডেবরিস্ প্রবাহ ঃ এই প্রক্রিয়ায় পানিসহ খন্ডিত শিলা টুকরা দ্রুত বেগে নিম্নগামী হয়। সাধারণত কাঁদা, শিলা ও পানির শিশ্রণ, অনেক ক্ষেত্রে, উচ্চঢালে ধ্বস্ হিসাবে যাত্রা শুরু করে, পরে নিম্নঢালে ধাবিত হয়।

কর্দম প্রবাহ ঃ অল্প সময়ে অধিক বৃষ্টিপাত বা বরফ গলে যাওয়ায় পাহাড় বা পার্বত্য এলাকায় এ ধরণের পলি ও কর্দম প্রবাহ দেখা যায়। এ ধরণের প্রবাহে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ পানি থাকে। জলীয় অংশ বেশী থাকায় তা সহজেই নদী প্রবাহের সাথে নিম্নঢালে নেমে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের পার্বত্য এলাকা থেকে পাদদেশে প্রায়ই বৃষ্টিপাতের পর বা বরফ গলে এ ধরণের ঢল নেমে আসে। কর্দম প্রবাহ অনেক সময় ১০০ মিটারের বেশী পুরু এবং ৮০ কিলোমিটারের বেশী দীর্ঘ হতে পারে।

বালি প্রবাহ ঃ এ প্রবাহ পানির তলদেশে হয়ে থাকে। আমাদের দেশের পাহাড়ী নদীগুলিতে বর্ষাকালে পাহাড়ী ঢলের সাথে এ ধরণের বালি প্রবাহ নিম্নঢালে নেমে আসে। নদীর পানি কমে গেলে বালি স্তূপ আকারে নদী খাতে জমা হয়ে থাকে। বন্যার সময় অনেক ক্ষেত্রে এ বালি প্রবাহের ফলে পার্শ্ববর্তী কৃষি জমি বালির পুরু স্তরে ঢেকে যায়। এ বালি জমির ক্ষতি করলেও তা দালান, রাস্তাঘাট নির্মাণে ব্যবহারের জন্য আহরণ করা হয়।

খ) ধীরগামী অপসারণ

এ ধরণের অপসারণ অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন হয় বলে সহজে বোঝা যায় না। তবে ঝুকে পড়া বেড়া, টেলিফোন বা টেলিগ্রাফের খুঁটি দেখে শিলার এ ধরণের নিম্নগামী অপসারণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। রৌদ্রে গরম হওয়া, আবার রাতে শীতল হওয়া, শিলার ফাঁকে তুষার কণা সৃষ্টি, ক্রমাগত ভেঁজা ও শুকানো প্রাণীর পায়ের আঘাত এবং ভূ-কম্পন এ সবই শিলার বাঁধনকে দুর্বল করে ফেলে। ফলে ধীরে ধীরে মাধ্যাকর্ষণের টানে শিলা নিম্নগামী হয়।

ভূমিধস্ ঃ বাংলাদেশের নদীর তীরে বা পাহাড়ী রাস্তার পার্শ্বে এই ভূমিধ্বস্ প্রায়ই দেখা যায়। এ ধরণের স্তূপ অপসারণ প্রক্রিয়া ধীরে বা অপেক্ষাকৃত দ্রুত ঘটে থাকে। নিম্নগামী শিলা ঘূর্ণায়মান অবতল ঢালে সম্পূর্ণ শিলা একত্রে ধসে পড়ে।

সলিফ্লাকশন ঃ পানি মিশ্রিত অবস্থায় রিগোলিথ নিম্নগামী হলে তাকে সলিফ্লাকশন বলে। এটি বিশেষ ধরণের ডেবরিস্ সঞ্চারণ নামে পরিচিত। এ ধরণের প্রক্রিয়া চিরতুষার (Permafrost) এলাকায় বেশী দেখা যায়। গ্রীষ্ম বা বসন্তে এ সমস্ত এলাকায় ওপরের স্তরের তুষার গলে যায়। ওপরের শিলা তলদেশে জমে থাকা তুষারের ওপর পিছলে নিম্নগামী হয়।

চিত্র ৬.৬.২ ঃ ধীরগামী শিলাস্তুপ অপসারণ প্রক্রিয়া

শিলা প্রপাত ঃ এ এক ধরণের টেলাস যা ধীরে ধীরে খন্ডিত হয়ে শিলাকে নিম্নঢালে অপসারিত করে। তবে যথেষ্ঠ বৃষ্টির পানি অথবা বরফ গলা পানি এর সাথে যুক্ত হলে খাড়া ঢাল বরাবর খুব দ্রুত নিচে পতিত হয়। বাংলাদেশের নদীর তীরে যেখানে তলদেশ ক্ষয় হয় তার ওপরের অংশ হঠাৎ করে নিচের দিকে ধ্বসে পড়ে। এটি এক ধরণের শিলা প্রপাত। পদ্মা এং যমুনা নদীর খাড়া পাড়ে এ ধরণের শিলা প্রপাত দেখা যায়।

পাঠসংক্ষেপ

বিচূর্ণীত শিলা উচ্চ ঢালে অবস্থিত হলে তা অবশ্যই মাধ্যাকর্ষণের টানে নিম্ন ঢালে নেমে আসবে। শিলার এ নিম্ন ঢাল অভিমূখী যাত্রাকে স্তূপ অপসারণ বলে। স্তূপ অপসারণ প্রক্রিয়ায় শিলা অপসারনে কোন মাধ্যম প্রয়োজন হয় না। ক্ষয়ক্রিয়ায় শিলার স্থানান্তরের জন্য পরিবহন মাধ্যম আবশ্যক।

বিচূর্ণীভবন ভূমিরূপ গঠনে প্রত্যক্ষ ভাবে তেমন জড়িত না থাকলেও পরোক্ষ ভাবে স্তূপক্ষয় ও ক্ষয়কার্যকে ত্বরান্বিত করে। বিচূর্ণীভূত আলগা পদার্থই মৃত্তিকা গঠনের প্রধান ধাপ। ভূমিরূপ গঠনে বিচূর্ণীভবন দুই ভাবে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে। যেমন- দ্রবণজনিত পদার্থের অপসারণ সম্পর্কিত উচ্চতা হ্রাস ও বৈষম্যমূলক আচরণ করে ক্ষুদ্র ভূমিরূপের গঠন। তবে একথা ঠিক যে ভূমিরূপের গঠনে বিচূর্ণীভবনের ভূমিকাই প্রধান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সত্য হলে ‘স’ ও মিথ্যা হলে ‘মি’ লিখুন-

১.১. বিচূর্ণীত শিলা রিগোলিথ গঠন করে।

১.২. স্তূপ অপসারনে শিলার পরিবহনের জন্য কোন মাধ্যম প্রয়োজন হয় না।

১.৩. স্তূপ অপসান প্রক্রিয়াকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

উত্তর ঃ ১.১ (স) ১.২. (স) ১.৩ (মি)

২। শূন্য স্থান পূরণ করুন

২.১. শিলা অপসারন সাধারনত: ২৫° ঢালে সংঘটিত হয়।

২.২. পতিত শিলা জমা হওয়াকে টেলাস স্ক্রি বলে।

২.৩. নগরায়নের ফলে প্রচুর স্তূপ অপসারণ ঘটে।

উত্তর ঃ ২.১. ঢালে ২.২. টেলাস ২.৩. স্তূপ

৩। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন

৩.১ নগ্নীভবন প্রক্রিয়া কোথায় হয়?

ক. ভূ-পৃষ্ঠে খ. ভূঅভ্যন্তরে গ. সমুদ্র তলদেশে ঘ. কোনটিই নয়।

৩.২ বিচূর্ণীভবন কয়টি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়?

ক. ৩টি খ. ৪টি গ. ৭টি ঘ. ৫টি

৩.৩ পাহাড়ী নদীগুলোতে বর্ষাকালে পাহাড়ী ঢালের সাথে কি ধরণের প্রবাহ নিম্নঢালে নেমে আসে?

ক. কর্দম প্রবাহ খ. বালি প্রবাহ গ. শিলাপ্রবাহ ঘ. ভূমিধ্বস্

উত্তর ঃ ৩.১. ক. (ভূ-পৃষ্ঠে) ৩.২. খ. (তিনটি) ৩.৩. খ. (বালি প্রবাহ)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. স্তূপ অপসারণ কি?

২. স্তূপ অপসারণ কত প্রকার?

৩. স্তূপ অপসারন কোথায় হয়?

৪. স্তূপ অপসারণ বাংলাদেশের কোথায় হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. স্তূপ অপসারণ কি? ইহা কত প্রকার কি কি?

২. স্তূপ অপসারণ কোথায় কোথায় হয়? স্তূপ অপসারণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

ইউনিট ৭

নদী : নদী খাতের আকৃতি এবং নদী প্রবাহ
(River :Channel Form and Channel Flow)

পাঠ- ৭.১ ঃ নদী : নদী খাতের আকৃতি এবং নদী প্রবাহ
(River :Channel Form and Channel Flow)

এই পাঠ শেষে আপনি—

- নদী কি তা বলতে পারবেন;
- নদী খাতের আকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- নদী প্রবাহের ধরণ এবং নদীর পানি প্রবাহের নিয়ামক সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

নদী(River)

একটি সুনির্দিষ্ট খাতে নিম্নঢালাভিমুখী পানি প্রবাহকে নদী বলে। নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত কোথাও উপনদী মূল নদীতে এসে মিলে, আবার কোথাও মূল নদী বিভক্ত হয়ে শাখা নদীর সৃষ্টি করে। মূল নদী, এ ধরণের উপনদী ও শাখা নদীসহ একত্রে নদী অববাহিকা গড়ে তোলে। ইংরেজী River শব্দটি উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত হলেও বাংলা এবং পুংলিঙ্গ এবং নদী স্ত্রী লিঙ্গ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নদীর শলা নদী থাকে। ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, নীল নদ এবং গঙ্গা, পদ্মা, মিসিসিপি নদীর উদাহরণ। প্রতিটি নদী অববাহিকার একটি নিজস্ব ভৌগোলিক এলাকা আছে যা অববাহিকা বা পানি পর্যঙ্ক (water basin) নামে পরিচিত। প্রতিটি নদী অববাহিকা পার্শ্ববর্তী অববাহিকা থেকে পানি বিভাজিকা (water divide) দ্বারা পৃথক থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি নদী অববাহিকা শুধুমাত্র তার নিজস্ব ভৌগোলিক সীমানার পানি নিষ্কাষণ করে।
নদীর উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ও ঢালু জায়গা। পাহাড়িয়া অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টির পানি ও বরফগলা পানি পাওয়া যায় বলে পৃথিবীর অধিকাংশ নদীই পার্বত্য অঞ্চল হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। হিমালয় পর্বতে বৃষ্টি, বরফ গলা পানি ও প্রস্রবণের পানি মিলিত হয়ে গঙ্গা বা পদ্মা নদীর সৃষ্টি হয়েছে।

একটি সুনির্দিষ্ট খাতে নিম্নঢাল অভিমুখী পানি প্রবাহকে নদী বলে।

মূল নদী, উপনদী ও শাখা নদী একত্রে নদী অববাহিকা গড়ে তোলে। নদীর উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ও ঢালু জায়গা। প্রতিটি নদী একটি খাতে প্রবাহিত হয় এবং এ প্রবাহ নিম্নোক্ত নিয়ামক যেমন নদীর প্রস্থ, গভীরতা, ঢাল, বেগ ও পানির ধারণকৃত অংশের সীমানা দ্বারা প্রভাবিত।

নদী খাতের আকৃতি (Channel Form) ঃ প্রতিটি নদী একটি খাতে প্রবাহিত হয় এবং এ প্রবাহ বিভিন্ন ধরনের নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয়। নদী খাতের একটি আড়চিত্র (চিত্র- ৭.১) আঁকলে যে বিভিন্ন অংশ পাওয়া যায় সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

চিত্র ৭.১.১ ঃ নদী খাতের আড় চিত্র

১) **প্রস্থ ঃ** নদী খাতের দুই তীরের মধ্যবর্তী দূরত্ব। এটি মিটারে প্রকাশ করা হয়।

২) **গভীরতা ঃ** এটি নদী খাতের তলদেশ থেকে খাড়াভাবে পানির উপর পর্যন্ত দূরত্ব, যা মিটারে প্রকাশ করা হয়।

৩) **ঢাল ঃ** অনুভূমিক ও নদীতলের কৌণিক অবস্থান।

৪) **বেগ ঃ** নদী খাতে যে গতিতে পানি প্রবাহিত হয় তাকে বেগ বলে। নদীর বেগ ওপরিভাগে সবচেয়ে বেশী এবং দুই তীর ও তল বরাবর ঘর্ষণের কারণে কম হয়।

৫) **পানির ধারণকৃত অংশের সীমানা (Wetted perimeter) ঃ** নদীখাত এবং পানির সংযোগ রেখার দৈর্ঘ্য।

নদী প্রবাহ (Channel flow)

প্রাকৃতিক নদী প্রবাহে পানি দুই ভাবে বয়ে যায়। যেমন- (ক) পত্রবৎ প্রবাহ (Laminer flow)- যেখানে পানি অনুভূমিক ভাবে তলদেশ বরাবর প্রবাহিত হয় এবং (খ) ঘূর্ণী প্রবাহ (Turbulent flow)- যেখানে পানি ঘূর্ণায়মান অবস্থায় নিম্ন ঢালে অগ্রসর হয়। পত্রবৎ প্রবাহ প্রাকৃতিক নদীতে খুব বেশী দেখা যায় না, তবে ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রবাহের এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নদীর পানি প্রবাহ অনেকগুলো নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয়। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো নিম্নরূপঃ

১) পানির পরিমাণ (Volume of water)

২) বেগ (Velocity)

৩) নদী খাতের আকার ও আকৃতি (Channel form and shape)

৪) ঢাল (slope)

৫) নদী খাতের ভিত্তি তল (Base level), সর্বনিম্নতল যার নীচে নদী ক্ষয় করে না।

৬) পলির পরিমাণ ও ধরণ

নদী প্রবাহ দুই প্রকার। যেমন- পত্রবৎ প্রবাহ ও ঘূর্ণি প্রবাহ।

পত্রবৎ প্রবাহ প্রাকৃতিক নদীতে খুব বেশী দেখা যায় না। নদীর প্রবাহ নিম্নোক্ত নিয়ামক দ্বারা প্রবাহিত হয়। যথা- পানির পরিমাণ, বেগ, নদী খাতের আকার ও আকৃতি, ঢাল, নদী খাতের ভিত্তি তল, পলির পরিমাণ ও ধরন।

পাঠসংক্ষেপ

একটি সুনির্দিষ্ট খাতে নিম্ন ঢাল অভিমুখী পানি প্রবাহকে নদী বলে। মূল নদী, উপনদী ও শাখা নদী একত্রে নদী অববাহিকা গড়ে তোলে। প্রতিটি নদী অববাহিকার একটি নিজস্ব ভৌগোলিক এলাকা আছে, যা পানি পর্যাঙ্ক নামে পরিচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১.১. প্রতিটি নদী অববাহিকার একটি নিজস্ব ____________ এলাকা আছে।

১.২. পার্বত্য অবস্থায় ____________ সাধনই নদীর প্রধান কাজ।

১.৩. প্রতিটি নদী একটি ____________ প্রবাহিত হয়।

উত্তর ঃ ১.১. ভৌগোলিক ১.২. ক্ষয় ১.৩. খাতে

সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন

১. নদী কাকে বলে?

২. পানি বিভাজিকা বলতে কি বোঝায়?

৩. নদীর উৎপত্তির জন্য কি কি প্রয়োজন?

৪. একটি নদীখাতের আড় চিত্রে (cross profile) কি কি অংশ রয়েছে তা চিহ্নিত করুন ও নাম লিখুন।

৫. নদীর পত্রবৎ প্রবাহ (Laminer flow) ও ঘুর্ণিপ্রবাহ (Turbulent flow) বলতে কি বোঝায়?

৬. নদীর পানি প্রবাহ কি কি নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত?

রচনামূরক প্রশ্ন

১. নদীর পানি প্রবাহ ও নদী খাতের আকৃতি বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৭.২ ঃ নদীর বিভিন্ন অবস্থা বা গতি (Different Stages or Courses of River)

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বিভিন্ন গতিতে নদীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

উৎস হতে মোহনায় পতিত হওয়া পর্যন্ত নদীর গতি পথকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন- (১) পার্বত্য অবস্থা বা ঊর্ধ্বগতি, (২) সমভূমি অবস্থা বা মধ্যগতি এবং (৩) ব-দ্বীপ অবস্থা বা নিম্নগতি।

১) পার্বত্য অবস্থা বা ঊর্ধ্বগতি বা যৌবন অবস্থা (Mountain or Upper Course or Young Stage)

পার্বত্য অবস্থা নদীর প্রাথমিক অবস্থা। পর্বতের ওপরে উৎপত্তি স্থল হতে সমভূমিতে পৌঁছানো পর্যন্ত অংশকে নদীর পার্বত্য অবস্থা বা ঊর্ধ্বগতি ধরা হয়। গঙ্গা নদী গঙ্গোত্রী হতে হরিদ্বার পর্যন্ত ৩২০ কি.মি. (২০০ মাইল) অংশ এর পার্বত্য বা ঊর্ধ্ব প্রবাহ। পার্বত্য অবস্থায় ক্ষয় সাধনই নদীর প্রধান কাজ।
পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিভাগ খুব ঢালু ও উঁচু-নিচু হয়। সেজন্য নদী উচ্চ স্থান হতে খাড়া পর্বত গাত্র বেয়ে প্রচণ্ড গতিতে নেমে আসে। এ সময় নদীর গতিবেগ ঘন্টায় ২৪ কি.মি. থেকে ৩২ কি.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রবল স্রোতের আঘাতে ভূ-ত্বক হতে শিলা খণ্ড ভেঙ্গে পড়ে এবং তা স্রোতের সঙ্গে নিম্নদিকে গড়িয়ে অগ্রসর হতে থাকে। এ অবস্থায় যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উভয় প্রকার ক্ষয়সাধনই সাধিত হয়ে থাকে। পার্বত্য অবস্থায় নদীর পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা নিম্নক্ষয়ই বেশী হয়ে থাকে। ফলে গিরিখাত, ক্যানিয়ন, খরস্রোত, জলপ্রপাত প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।
পার্বত্য প্রবাহে নদী স্থল ভাগকে ক্ষয় করে এবং ক্ষয়িত অংশ পরিবহন করে। পার্বত্য অবস্থায় নদীর প্রধান কাজ ক্ষয়সাধন ও বহন হলেও অনেক সময় নদীর ঢাল হঠাৎ কমে নদীর গতি হ্রাস পেলে অথবা হঠাৎ অধিক পরিমাণ প্রস্তরখণ্ড আসলে নদী তা সম্পূর্ণরূপে বহন করতে না পেরে কিছু কিছু সঞ্চয় করে। এভাবে নদীবাহিত বিভিন্ন পদার্থগুলো অল্প ঢালু অঞ্চলে সঞ্চিত হয়। নদী হঠাৎ উচ্চ ভূমি হতে নিম্ন ভূমিতে পতিত হলে সেখানে পলি জমা হয়ে পলল পাখা বা পলল কোণ গঠিত হয়। কখনও কখনও পাহাড়ের পাদদেশে প্রস্তরখণ্ড, নুড়ি, বালুকা প্রভৃতি জমা হয়ে একটি বিস্তীর্ণ সমভূমির সৃষ্টি করে। ভারতের শিবালিক পর্বতের পাদদেশে এরূপ সমভূমি গঠিত হতে দেখা যায়।

চিত্র- ৭.২ .১ ঃ একটি আদর্শ নদীর বিভিন্ন গতি প্রবাহ।

২) সমভূমি অবস্থা বা মধ্যগতি (Plain or Middle Stage)

পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করে নদী যখন সমভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন তার প্রবাহকে সমভূমি অবস্থা বা মধ্যগতি বলে। মধ্যগতিতে নদীর বিস্তার বেশী হয়। নদী অববাহিকা প্রশস্থ হয় ও উপত্যকাগুলোর গভীরতা কমে আসে। এই অংশে নদীর পানির পরিমাণ বেশী হয়। বহু উপনদী এ অংশে এসে মূল নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। নদী উপত্যকার গভীরতা হ্রাস পাওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতাও কমে যায়। ফলে বর্ষাকালে নদী স্ফীত হয়ে তার দুদিকের নিম্ন ভূমিসমূহকে বন্যায় প্লাবিত

করে। নদী বাহিত পলি দ্বারা ঐ নিম্ন ভূমিসমূহ ধীরে ধীরে উঁচু হয় এবং সমভূমির আকার ধারণ করে। একে প্লাবন ভূমি বলে। এ প্রবাহে নদী ক্রমশ ধীরগতি সম্পন্ন হয় এবং বাঁধা এড়িয়ে আঁকাবাঁকা পথে চলতে থাকে।
সমভূমি অবস্থায় নদীর ক্ষয় ও পরিবহন কার্য ততো প্রবল হয় না। এ অবস্থায় নদীর সঞ্চয় কার্য শুরু হয়। গঙ্গা নদীর হরিদ্বার হতে রাজমহল পর্যন্ত অংশ এর মধ্য প্রবাহ।

৩) ব-দ্বীপ অবস্থা বা নিম্নগতি (Deltaic or Lower Stage)

নদীর শেষ অংশ বা নদীর নিম্নগতিকে ব-দ্বীব অবস্থা বলা হয়। এ সময় নদীর স্রোতের বেগ খুবই কম হয়। নদীর নিম্নক্ষয় বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বল্প পরিমাণে পার্শ্বক্ষয় হতে পারে। ফলে নদীর উপত্যকা খুব চওড়া ও অগভীর হয়। নদীর এ অংশে স্রোতের বেগ কমে যাওয়ায় নদীবাহিত বালুকা, কর্দম ও পলি মোহনায় সঞ্চিত হয়ে নদীর গতিপথে বাঁধার সৃষ্টি করে। নদীর গতি বাঁধা পেয়ে তা একাধিক দিক দিয়ে চলে যায়। কালক্রমে নদীমুখে এ পলি সঞ্চিত করে ভূ-ভাগ উচ্চ হয়ে ব-এর আকার ধারণ করে ত্রিকোণাকৃতি দ্বীপের সৃষ্টি করে। এটি ব-দ্বীপ নামে পরিচিত। ব-দ্বীপ গঠন ব্যতীত এ অংশে নদীর খাত পরিবর্তন, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, প্লাবন সমভূমি প্রভৃতি বিভিন্ন ভুমিরূপ দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গা নদীর নিম্নগতি রাজমহল হতে মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত।

পাঠসংক্ষেপ

নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর গতিপথকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন- পার্বত্য বা যৌবন অবস্থা; সমভূমি বা মধ্যগতি বা পরিণত অবস্থা এবং ব-দ্বীপ অবস্থা বা নিম্নগতি বা বার্ধক্য অবস্থা। নদীর প্রত্যেক গতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রাথমিক গতিতে নদীর ক্ষয়কার্যই প্রধান, মধ্যগতিতে ক্ষয় ও সঞ্চয় উভয় কার্যই সম্পাদিত হয় এবং নিম্নগতিতে প্রধানত সঞ্চয় কাজই সম্পন্ন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১.১. নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত গতিপথকে ________________ ভাগে বিভক্ত করা হয়।

১.২. ____________ অবস্থায় নদীর ক্ষয় ও পরিবহন কার্য ততো প্রবল হয় না।

১.৩. পার্বত্য প্রবাহে নদী স্থল ভাগকে ক্ষয় করে এবং ক্ষয়িত অংশ ___________ করে।

১.৪. ___________ নদীর বিস্তার বেশী হয়।

১.৫. নদীর শেষ অংশ বা নদীর বিম্নগতিকে _____________ অবস্থা বলা হয়।

উত্তর ঃ ১.১. তিনটি ১.২. সমভূমি ১.৩. পরিবহন ১.৪. মধ্যগতিতে ১.৫. ব-দ্বীব

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. নদী কাকে বলে?
২. পানি পর্যঙ্ক (water basin) কি?
৩. পানি বিভাজিকা বলতে কি বোঝায়?
৪. নদীর উৎপত্তির জন্য কি কি প্রয়োজন?
৫. একটি নদীখাতের আড় চিত্রে (cross profile) বিভন্ন অংশ চিহ্নিত করুন ও নাম লিখুন।
৬. নদীর পত্রবৎ প্রবাহ (Laminer flow) ও ঘুর্ণিপ্রবাহ (Turbulent flow) বলতে কি বোঝায়?
৭. নদীর পানি প্রবাহ কি কি নিয়ামক দ্বারা প্রবাহিত?
৮. নদীর গতিপথকে কয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয় ও কি কি?
৯. বিভিন্ন গতিতে নদীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

রচনরামূলক প্রশ্ন

১. নদী কি? নদীর আকৃতি প্রবাহ ও বিভিন্ন গতির বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৭.৩ ঃ নদীর কাজ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- নদীর ক্ষয়কার্য যে সকল প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- নদীর বোঝা (load) পরিবহন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন।

নদী তার অববাহিকার উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত বিভিন্ন অংশে ক্ষয়সাধন, বহন ও অবক্ষেপন - এই তিন প্রকার কার্য করে থাকে। প্রধান নদীগুলো এত দীর্ঘ হয় যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে নদীর এই তিনটি কাজ এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ লক্ষ্য করা সম্ভব হয় না। তবে একটি নদীর গতিপথকে তিনটি নির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত করা যায়। যেমন- (ক) ধারণ অববাহিকা (Catchment Basin), (খ) নদীখাত (Channel) এবং (গ) পলি সঞ্চিত ত্রিকোণাকার ভূ-খণ্ড (Deltaie Alluvial cone)।

ধারণ অববাহিকা নদী তার জলধারা এবং প্রস্তর খণ্ড (Rock waste) সমূহ সংগ্রহ করে থাকে। নদীখাত বা উপত্যকায় নদী তার ঊর্ধ্ব অংশের দ্রব্যসমূহ বহন করে নদীখাতকে পরিষ্কার রাখে। ক্ষুদ্র পার্বত্য জলধারা যে সকল দ্রব্য প্রধান নদীতে বহন করতে পারে না, তা নিম্ন প্রবাহে ক্রমশঃ সঞ্চিত হয়ে পলি সঞ্চিত ত্রিকোণাকার ভূ-খণ্ড গঠন করে। নদী বা পার্বত্য জল ধারার এই তিনটি অংশ কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একটি অংশ অপর একটি অংশের ওপর নির্ভরশীল।

নদীর গতিপথে ক্ষয়সাধন, বহন ও অবক্ষেপন কার্যের জন্য শক্তির প্রয়োজন। নদীর শক্তি নির্ভর করে তার (১) পানির পরিমাণ (Volume) ও (২) পানির গতিবেগের (Velocity) ওপর। এই দুটিকে একত্রে নদীর প্রবাহ (Discharge) বলে। নদীর এই শক্তি নদীখাত ও নদীতীর ঘর্ষণে, ক্ষয়কার্যে, বিভিন্ন ক্ষয়প্রাপ্ত দ্রব্য বহনে এবং অবক্ষেপনে ব্যবহৃত হয়।

নদী তার অববাহিকার বিভিন্ন অংশে ক্ষয়সাধন, বহন ও অবক্ষেপন এই তিনটি কার্য করে থাকে। নদীর শক্তি নির্ভর করে (১) পানির পরিমাণ ও (২) পানির গতিবেগের ওপর।

নদীর ক্ষয়সাধন (Erosion of River)

নদীর ক্ষয়কার্য প্রধানতঃ চারটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন- (১) পানি প্রবাহ ক্ষয়, (২) অবঘর্ষ, (৩) ঘর্ষণ জনিত ক্ষয় ও (৪) দ্রবণ। নদীর এসকল ক্ষয় ক্রিয়া তিন উপায়ে সম্পাদিত হয়। যথা- (ক) পশ্চাৎমুখী ক্ষয় সাধন, খাড়াভাবে ক্ষয় সাধন এবং (গ) পার্শ্বক্ষয়।

ক) পানি প্রবাহ ক্ষয় (Hydraulic Action) ঃ প্রবহমান নদীর পানি নদীখাত ও নদীপার্শ্ব প্রচণ্ড বেগে আঘাত করলে অপেক্ষাকৃত কোমল ও অসংলগ্ন প্রস্তর খণ্ডগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভেঙ্গে যায় এবং নদীর স্রোতের সঙ্গে বহু দূরে নীত হয়। একে পানি প্রবাহ ক্ষয় বলে।

খ) অবঘর্ষ (Corrasion) ঃ নদী খাতের সঙ্গে নদীবাহিত প্রস্তর খণ্ডের সংঘর্ষের ফলেও নদী ক্ষয়সাধন করে। নদী বাহিত প্রস্তরখণ্ডগুলো নদীর স্রোতে ঘুরতে ঘুরতে চলে এবং নদীখাতের সাথে সংঘর্ষের ফলে নদীখাতে ছোট ছোট গর্ত বা বর্তুলাকার গর্তের (Pot holes) সৃষ্টি করে। এইরূপ গর্তের সৃষ্টির ফলে নদীখাত আরও দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকে অবঘর্ষ বলা হয়।

গ) ঘর্ষণ ক্ষয় (Attrition) ঃ নদীবাহিত প্রস্তরখণ্ড (Boulders) একটি অপরটির সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডে এবং অবশেষে বালুকণায় পরিণত হয়। ফলে নদী অতি সহজেই এগুলো বহন করতে পারে।

ঘ) দ্রবণ ক্ষয় (Solution or Corrosion) ঃ নদীর পানিতে অনেক সময় প্রস্তরখণ্ড দ্রবীভূত হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। চুনাপাথর অঞ্চলে এ প্রকার ক্ষয়কার্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। একে দ্রবণ বলা হয়।

উপরোক্ত চার প্রক্রিয়া একত্রে একটি নদীর ক্ষয়কাজ সম্পন্ন করে। নদীর এ সমস্ত ক্ষয় প্রক্রিয়া তিন উপায়ে সম্পাদিত হয়। যথা–

ক) পশ্চাৎমুখী ক্ষয়সাধন (Headward Erosion)
খ) খাড়াভাবে ক্ষয়সাধন (Down Cutting Erosion) এবং
গ) পার্শ্বক্ষয় (Lateral Erosion)

পশ্চাৎমুখী ক্ষয়সাধনের মাধ্যমে নদী তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে। ভূ-গর্ভস্থ বা অন্তঃপ্রবাহের কারণে পাহাড়ের গায়ে যে ঝর্ণার সৃষ্টি হয় তা নদীর একটি অংশ। ঝর্ণার উৎস অঞ্চল ক্রমাগত ক্ষয় সাধনের কারণে দৈর্ঘ্য ওপরের দিকে বাড়তে থাকে। নদী খাড়া ক্ষয় সাধনের মাধ্যমে তলদেশের গভীরতা বৃদ্ধি করে। তাছাড়া নদীর পার্শ্বক্ষয়ও নদীর প্রশস্ততা বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পদ্ধতিতে নদী তার এক পাড়ে ক্ষয়সাধন করে এবং বিপরীত পাড়ে এ ক্ষয়িত শিলা/মাটি সঞ্চয় করে থাকে।

নদীর পরিবহন কাজ (Transport work of a River)

নদীর মোট শক্তির শতকরা ৯৫ থেকে ৯৭ ভাগই ঘূর্ণী ও ঘর্ষণজনিত কারণে ব্যয় হয়ে যায়। বাকী অংশ শুধু পরিবহন কাজে ব্যয় হয়। যে কোন বৃহৎ নদী প্রস্তর খণ্ড, বালুকা, কর্দম প্রভৃতি তার বোঝা (load) রূপে বহন করে থাকে। নদী তার এই বোঝা চারটি প্রক্রিয়ায় বহন করে। যথা-

১. দ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহন (Solution),
২. ভাসমান অবস্থায় বহন (Suspension),
৩. লম্ফ প্রক্রিয়ায় বহন (Saltation) ও
৪. আকর্ষণ বা টানের মাধ্যমে বহন (Traction)।

১. নদী তার গতিপথে অনেক সময় কোন কোন প্রস্তর খণ্ডকে পানির সাথে দ্রবীভূত করে তা পানি স্রোতের সঙ্গে বহন করে থাকে। চুনাপাথরযুক্ত অঞ্চলে নদী এই দ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভার বহন করে থাকে। নদীর দ্রবীভূত বোঝার (Dissolved load) পরিমাণে খুব তারতম্য হয়। নদীতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে এর ঘনত্ব হ্রাস পায়। পৃথিবীর প্রধান নদীসমূহের গড় দ্রবীভূত বোঝার পরিমাণ ১১৫ থেকে ১২০ পি.পি.এস.। প্রতি বছর এ সমস্ত নদী থেকে প্রায় ৪ বিলিয়ন (৪০০ কোটি) মেট্রিক টন দ্রবীভূত পদার্থ সমুদ্রে পতিত হয়।

২. ভাসমান বোঝা (Suspended load) বেশীর ভাগ নদীর মোট বাহিত পদার্থের প্রধান অংশ। নদীর ঘোলা পানি থেকে সহজেই ভাসমান বোঝার ঘনত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ভাসমান বোঝার প্রধান অংশ মূলত বালি, পলি ও কর্দম আকৃতির পদার্থে গঠিত। অনেক সময় ক্ষুদ্রাকার প্রস্তরখণ্ড নদীর স্রোতে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ভেসে যায়, একে ভাসমান বোঝা বলে।

৩. তুলনামূলকভাবে বৃহদাকার স্রোতের বেগে নদীর তলদেশে (bed) ঠেকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকে। একে লম্ফ প্রক্রিয়ায় (Saltation process) বহন বলে।

৪. নদীর বোঝার বড় আকৃতির পদার্থ বোল্ডার থাকতে পারে যা ভাসমান অবস্থায় রাখা সম্ভব হয় না। এ ধরনের ভারী ও বড় পদার্থসমূহ নদীর তলদেশীয় ভার (Bed Load)। নদী-বাহিত বিভিন্ন দ্রব্যসমূহ নদীর তলদেশ দিয়ে স্রোতের টানে বাহিত হয় বলে একে নদী গর্ভ বোঝা (Bed load) বা টান বা আকর্ষণ ভার বলা (Traction load) হয়। এই টান বা আকর্ষণের দ্বারাও নদী বহন করে থাকে। ধারণা করা হয়, নদীর তলদেশীয় ভার মোট ভারের শতকরা ১০ ভাগের বেশী হয় না।

> নদী তার ভার চারটি প্রক্রিয়ায় বহন করে। যেমন- (১) দ্রবণ প্রক্রিয়ায়, (২) ভাসমান অবস্থায় বহন, (৩) লম্ফদান প্রক্রিয়ায় বহন ও (৪) আকর্ষণ বা টানের মাধ্যমে বহন।

নদীর বহন করার ক্ষমতা নিম্নলিখিত কারণে পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন- (ক) নদীতে পানি কমে গেলে, (খ) নদী-ঢালের পরিবর্তন হলে, (গ) নদীর শক্তির তুলনায় অধিক পরিমাণ প্রস্তরখণ্ড (load) নদীতে আসলে (ঘ) নদী কোনো হ্রদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে। এরূপ অবস্থায় নদীর তলদেশে কিছু কিছু প্রস্তরখণ্ড জমা হতে থাকে। বৃহদাকার প্রস্তরগুলো নদীর উচ্চ প্রবাহে এবং ক্ষুদ্রাকার প্রস্তর খণ্ড, বালুকা, কর্দম প্রভৃতি নদীর নিম্ন প্রবাহে অর্থাৎ মোহনার নিকট জমা হয়। একে নদীর অবক্ষেপন (Deposition) বলে।

নিম্নলিখিত অবস্থাসমূহের ওপর নদীর ক্ষয়কার্য নির্ভরশীল

১. জলবায়ু ঃ নদীর ক্ষয়কার্যের ওপর নদীর গতিবেগের প্রভাব অধিক, কিন্তু নদীর গতিবেগ আবার প্রবল বারিপাতের ওপর নির্ভরশীল। এজন্য জলবায়ু নদীর ক্ষয়কার্যকে পরিচালিত করে।

২. নদীগর্ভের শিলার উপাদান ঃ নদীগর্ভ কোমল শিলা দ্বারা গঠিত হলে নদীর ক্ষয়কার্য প্রবল হয়। কিন্তু কঠিন শিলা অংশে ক্ষয় খুবই কম হয়ে থাকে।

৩. বাহিত শিলার কঠিন্যতা ঃ নদীবাহিত পদার্থগুলো অধিক কঠিন হলে নদীর ক্ষয়কার্য বেশী হয়। কিন্তু পদার্থগুলো নরম হলে সহজেই গলে যায় এবং ক্ষয়কার্য খুবই কম হয়।

৪. নদীর পানির গলানো শক্তি ঃ অনেক সময় নদীর পানির কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও অন্যান্য পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকায় নদীর ক্ষয়কার্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

৫. নদীগর্ভে ফাঁটল ও সন্ধির অবস্থান ঃ নদীগর্ভে বহু ফাটল (cracks) ও সন্ধি (joints) থাকলে তাদের ভেতর পানি প্রবেশ করে এবং শেষে নদীগর্ভের এক বিরাট অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

নদীর ক্ষয়কার্য নিম্নোক্ত নিয়ামকসমূহের ওপর নির্ভর করে। যেমন- জলবায়ু, নদীগর্ভে শিলার উপাদান, বাহিত শিলার কাঠিন্যতা, নদীর পানি গলানোর শক্তি, নদীগর্ভে ফাটল ও সন্ধির অবস্থান।

পাঠসংক্ষেপ

নদী তার অববাহিকার বিভিন্ন অংশে ক্ষয়সাধন, বহন ও অবক্ষেপন এই তিনটি কার্য করে থাকে। নদীর শক্তি নির্ভর করে (১) পানির পরিমাণ ও (২) পানির গতিবেগের ওপর। এই দুটিকে একত্রে নদীর প্রবাহ বলে।
নদী তার বোঝা চারটি প্রক্রিয়ায় বহন করে। যেমন- (১) দ্রবণ প্রক্রিয়ায়, (২) ভাসমান অবস্থায় বহন, (৩) লম্ফদান প্রক্রিয়ায় বহন ও (৪) আকর্ষণ বা টানের মাধ্যমে বহন।
নদীর ক্ষয়কার্য নিম্নোক্ত নিয়ামকসমূহের ওপর নির্ভর করে। যেমন- জলবায়ু, নদীগর্ভে শিলার উপাদান, বাহিত শিলার কাঠিন্যতা, নদীর পানি গলানোর শক্তি, নদীগর্ভে ফাটল ও সন্ধির অবস্থান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরন করুন

১.১. নদী তার অববাহিকার উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত বিভিন্ন অংশে ক্ষয়সাধন, বহন ও __________ এই তিন প্রকার কার্য করে থাকে।

১.২. নদীর শক্তি নির্ভর করে তার (১) পানির পরিমাণ ও (২) পানির _________ ওপর।

১.৩. নদীর ক্ষয়কার্য প্রধানতঃ চারটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন, (১) পানি প্রবাহ ক্ষয়, (২) ________ (৩) ঘর্ষণজনিতক্ষয় ও (৪) দ্রবণ।

১.৪. নদীর মোট শক্তির শতকরা ৯৫ থেকে ___________ ভাগই ঘূর্ণী ও ঘর্ষণজনিত কারণে ব্যয় হয়ে যায়।

১.৫. নদী তার ভার চারটি প্রক্রিয়ায় বহন করে। যেমন, (১) দ্রবন প্রক্রিয়ায়, (২) ________ বহন, (৩) লম্ফ প্রক্রিয়ায় বহন, ও (৪) আকর্ষণ বা টানের মাধ্যমে বহন।

উত্তর ঃ ১.১. অবক্ষেপন ১.২. গতির ১.৩. অবঘর্ষ ১.৪. ৯৭ ১.৫. ভাসমান

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. নদী কি কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ও কিভাবে ক্ষয়সাধন করে?
২. নদী তার ভার কি কি প্রক্রিয়ায় বহন করে থাকে?
৩. নদীর বহন করার ক্ষমতা কি কি কারণে পরিবর্তিত হতে পারে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নদী কি? নদীর আকৃতি, প্রবাহ ও বিভিন্ন গতির বর্ণনা দিন।

পাঠ- ৭.৪ ঃ নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ (Erosional Features of River)

এই পাঠ শেষে আপনি—

- উর্ধ্ব গতিতে নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

পার্বত্য অবস্থায় নদীর ক্ষয়কার্য অত্যন্ত বেশী। পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি এবং প্রবল গতিবেগের জন্য স্রোতে ক্ষয়সাধনের ক্ষমতা এ অংশে সর্বাপেক্ষা অধিক। সমভূমি অবস্থায় নদীর ক্ষয়সাধন কম এবং শেষ অবস্থায় ক্ষয়সাধন প্রায় বন্ধ থাকে। নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর কার্যাবলীর তারতম্যের কারণে বিভিন্ন ধরণের ভূমিরূপ গড়ে উঠে। নিম্নে নদীর উর্ধ্ব, মধ্য ও নিম্ন অংশে গড়ে উঠা ভূমিরূপের বিবরণ দেয়া হলো।

V এবং U আকৃতির উপত্যাকা (V & U Shaped vally)

পার্বত্য অবস্থায় নদীর ক্ষয় ক্রিয়াই সর্বাধিক। পর্বত থেকে প্রবল বেগে নামবার সময় নদীর প্রবল স্রোত বড় বড় শিলা খণ্ড বহন করে নিম্নদিকে অগ্রসর হয়। এখানে নদীর পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা উল্লম্ব ক্ষয় বেশী হয়। এরূপে ক্রমশ ক্ষয় পেতে পেতে নদী উপত্যকা অনেকটা ইংরেজী ‘ভি’ (V) অক্ষরের মত হয়। ফলে এরূপ উপত্যকাকে ভি-আকৃতি উপত্যকা (V-Shaped valley) বলা হয় (চিত্র- ৭.৪.১)। কিন্তু নদীর মধ্যগতিতে অর্থাৎ সমভূমি অবস্থায় উপত্যকার আকৃতির পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। এ অবস্থায় স্রোত ও শিলারাশি দ্বারা উল্লম্ব (Vertical) ক্ষয় অপেক্ষা পার্শ্বক্ষয় বেশী হয়। ফলে নদী ক্রমশ প্রশস্থ হয়ে কোনো কোনো স্থানে ইংরেজী ‘ইউ’ (U) আকৃতি বা চ্যাপটা প্রশস্ত আকৃতি ধারণ করে। নদী যতই মোহনার দিকে অগ্রসর হয়, ততোই এর উপত্যকার বিস্তৃতি ঘটে।

চিত্র ৭.৪.১ ঃ V এবং U আকৃতির উপত্যাকা

গিরিখাত ও ক্যানিয়ন (Gorge and Canyon)

প্রাথমিক গতিতে নদীর প্রবল স্রোত খাড়া পর্বত গাত্র বেঁয়ে নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়। এতে ভূ-পৃষ্ঠে ক্ষয় হয় এবং ভূত্বক থেকে শিলাখণ্ড ভেঙ্গে পড়ে। পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষের দরুন শিলাখণ্ডগুলো মসৃণ ও ক্ষুদ্রতর হয়ে পানির সাথে বহুদূরে চলে যায়। এ সকল পাথরের ঘর্ষণে নদীর খাত গভীর ও সংকীর্ণ হতে থাকে। নদীর দু'পার্শ্বের শিলা যদি ক্ষয় না হয় তাহলে এ সকল খাত খুব গভীর হয়। তখন এ সকল খাতকে গিরিখাত (Gorge) বলে (চিত্র- ৭.৪.২)। সিন্ধু নদের গিরিখাত, আফগানিস্থানে কাবুল নদীর গিরিখাত, ভারতের অরুনাচলে ব্রক্ষপুত্র নদীর গিরিখাত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

চিত্র ৭.৪.২ ঃ গিরিখাত

গিরিখাতগুলো শুষ্ক কোমল শিলা স্তরে হলে অতীব সংকীর্ণ ও গভীর হয়। ফলে নদীর উভয় পার্শ্ব অধিক উচ্চ ও খাড়া হয়। এরূপ গভীর ও সংকীর্ণ গিরিখাতকে ক্যানিয়ন (Canyon) বলে। উত্তর আমেরিকার কলরাডো নদীর গিরিখাত গ্রাণ্ড ক্যানিয়ন (Grand Canyon) পৃথিবীর বিখ্যাত। এ গিরিখাত ১৩৭ থেকে ৪৫৭ মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রায় ২.৪ কি.মি. গভীর ও ৪৮২ কি.মি. দীর্ঘ।

স্পার (Spur)

উৎস থেকে নিম্ন ঢালে যাওয়ার পথে নদী এক পাড় থেকে অন্য পাড়, এভাবে পাড় বদল করে অগ্রসর হয়। অবশ্য এ অবস্থায়ও এর তলদেশের ক্ষয়কাজ ঠিকই চলতে থাকে। নদীর এ ধরণের গতি ধারার ফলে পাহাড়ের গাত্রসমূহ ঠিক দুটি করাত মুখোমুখি রাখলে দাঁতসমূহ যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকে। তেমনি ভাবে পাহাড়ের পার্শ্ব দেশসমূহ পরস্পরের দিকে ঝুঁকে থাকা ভূমিরূপ গড়ে তোলে। এ ধরণের ভূমিরূপকে স্পার বলে (চিত্র- ৭.৪.৩)।

চিত্র ৭.৪.৩ ঃ স্পার

র‍্যাপিডস্ ও কাসকেড (Rapids and Cascades)

পাহাড়ী খাড়া ঢালের ক্ষয় স্রোতকেই 'র‍্যাপিডস' বলে। অনেক সময় পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নদী স্রোত নিচে চলতে থাকে। এরূপ ঢালু জায়গায় মাটি পর্যায়ক্রমে কঠিন ও কোমল থাকতে পারে। ফলে নদীর স্রোতে নরম মাটি অল্প অল্প করে ক্ষয় হয় এবং ছোট ছোট জল প্রপাতের সৃষ্টি হয়। এ জল প্রপাতগুলো সারিবদ্ধভাবে ওপর থেকে নিচের দিকে অবস্থান করে এবং নদীস্রোত লাফাতে লাফাতে নিচে পড়তে থাকে। এরূপ প্রবহমান স্রোতকে বা সারিবদ্ধভাবে সৃষ্ট ছোট ছোট জল প্রপাতকে খরস্রোত বা র‍্যাপিডস (Rapids) বলে (চিত্র- ৭.৪.৪)। এ অপেক্ষা আরও ক্ষুদ্র জল প্রপাতকে কাস্কেড (Cascades) বলে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল প্রপাতগুলো বেশী দিন স্থায়ী হয় না। মিসরের নীল নদের গতিপথে কাসকেড দেখা যায়।

চিত্র ৭.৪.৪ ঃ খরস্রোত ও জলপ্রপাত

জল প্রপাত (Water Fall)

জল প্রপাত বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। যেমন- পানি খাড়াভাবে একটি স্রস্ত উপত্যকার ওপর অথবা হিমবাহ উপত্যকায় পতিত হলে এ ধরণের জল প্রপাতের সৃষ্টি হয়। বেশীর ভাগ জলপ্রপাতের ওপরে কঠিন শিলা এবং নিচে কোমল শিলা স্তর দেখা যায় (চিত্র- ৭.৪.৫)। পার্বত্য অবস্থায় নদীস্রোত কোনো কঠিন শিলাস্তর হতে কোমল শিলাস্তরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলে কোমল শিলাস্তরটিকে বেশী পরিমাণে ক্ষয় করে ফেলে। ফলে কঠিন শিলাস্তর কোমল শিলাস্তর অপেক্ষা অনেক উচ্চে অবস্থান করে এবং পানি ধারা খাড়াভাবে নিচে পড়তে থাকে। পানির এইরূপ পতনকে জলপ্রপাত (waterfall) বলে। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে অবস্থিত নায়াগ্রা জলপ্রপাত পৃথিবীর বিখ্যাত জলপ্রপাত বাংলাদেশের মৌলভী বাজার জেলার মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতটি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

ি

চত্র ৭.৪.৫ ঃ জলপ্রপাত

নদী এভাবে কোমল শিলাস্তর ভেতরের দিকে ক্ষয় করতে থাকে। এক পর্যায়ে কঠিন শিলার তলদেশের সমস্ত শিলা ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় তা ওপর থেকে ঝুলতে থাকে। অবশেষে ঝুলতে ঝুলতে কঠিন শিলাস্তর ভেঙ্গে পড়ে এবং জলপ্রপাত পশ্চাদপসরণ করে।

বর্তুলাকার গর্ত (Pot holes)

র‌্যাপিডস বা জল প্রপাতের পাদদেশে নদীর পানিতে স্থানীয় ভাবে অনেক আবর্তের সৃষ্টি হয়। এই অংশে নদীর পানি পাক খেয়ে খেয়ে আবর্তিত হতে থাকে বলে নদী মধ্যস্থিত শিলাচূর্ণের ঘর্ষণে নদীগর্ভের গোলাকৃতি গর্তের সৃষ্টি হয়। এগুলোকে বর্তুলাকার গর্ত বলে। পর্বত বা মালভূমির উভয় অংশেই এরূপ বর্তুলাকার গর্ত দেখা যায় (চিত্র- ৭.৪.৬)।

চিত্র ৭.৪.৬ ঃ বর্তুলাকার গর্ত

নদী বাঁক (Meander), ব্লাফস (Bluffs) ও নিম্নগামী চরা (Slip-off Slopes, Pointbar)

নদীর সব গতিতেই বাঁক দেখা যায় এবং উর্ধ্ব গতিতে এ ধরণের বাঁক তুলনামূলকভাবে কম। নদী প্রবাহ বাঁক ঘুরার সময় কেন্দ্রাভিগ বলের কারণে বাইরের দিকে ঝুঁকে গিয়ে পাড়ে আঘাত করে। ফলে, পাড়ের ভিত্তি তল ক্ষয় সাধিত হয় এবং এক পর্যায়ে তা সহজে ধ্বসে পড়ে। তখন নদী পাড় প্রায় খাড়াভাবে অবস্থান করে। এ ধরণের ভূমিরূপকেই ব্লাফ বলে। বাঁকের ভেতর পাড় বরাবর স্রোতের শক্তি কম থাকায় পলি সহজেই জমা হয়ে স্বল্প ঢাল বিশিষ্ট চরার সৃষ্টি করে তাকে বাঁকের চর বলে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো নদীর সঞ্চয় কাজের ফল হলেও উজানে কাজের পরিনতি।

নদীর যৌবনাবস্থায় বা উর্ধ্বগতিতে ক্ষয়কার্য সবচেয় বেশী হয়ে থাকে।

পাঠসংক্ষেপ

নদীর যৌবনাবস্থায় বা উর্ধ্বগতিতে ক্ষয়কার্য সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে। এখানে নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিরূপ হলো 'V' ও 'U' আকৃতির উপত্যকা, গিরিখাত ও ক্যানিয়ন, স্পার, র‌্যাপিডস ও কাসকেডস, জলপ্রপাত, বর্তুলাকার গর্ত, নদীবাঁক, ব্লাফস, নিম্নগামী চরা প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. "V" আকৃতির উপত্যাকা বলতে কি বুঝেন?
২. গিরিখাত কি?
৩. স্পার কি?
৪. ব্যপিডস্ ও কাসকেড -এর সংজ্ঞা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. উর্ধ্ব গতিতে নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপের বিবরন দিন।

পাঠ- ৭.৫ ঃ মধ্যগতিতে নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ঠ ভূমিরূপ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- মধ্যগতিতে নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে মধ্যবর্তী অঞ্চলে সৃষ্ট ভূমিরূপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- নদীর ক্ষয়চক্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

কিছু কিছু ভূমিরূপ যা নদীর ঊর্ধ্বাঞ্চলে দেখা গেছে তা মধ্যবর্তী অঞ্চলেও দেখা যায়। যেমন- র‌্যাপিডস, জলপ্রপাত, নদীবাঁক ও ব্লাফস। এ ধরণের ভূমিরূপ তুলনামূলকভাবে কম হলেও এর কিছু কিছু নমুনা দেখা যায়। নদীবাঁক এ অংশে আরও অনেক প্রশস্ত এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রশস্ত 'ভি' আকৃতির উপত্যকা ও সংকীর্ণ প্লাবনভূমি পাহাড়ী অংশের নদীখাতের চেয়ে এ অংশের খাত অনেক প্রশস্ত এবং স্পারসমূহ অনুপস্থিত। নদী নিজেই ক্ষয় করে উপত্যকার আয়তন বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া, এ অংশের শেষ পর্যায়ে নদীর উভয় পাড় উপচে পার্শ্ববর্তী নিম্ন অংশে পলি সঞ্চয় করে প্লাবন ভূমি গড়ে তোলে।

কিছু কিছু ভূমিরূপ নদীর ঊর্ধ্বগতিতেও দেখা যায় আবার মধ্যবর্তী গতিতে দেখা যায়। যেমন- র‌্যাপিডস, জলপ্রপাত, নদীবাঁক ও ব্লাফস। তাছাড়া প্লাবন ভূমি, খোদিত নদী বাঁক, নদীমঞ্চ প্রভৃতি ভূ-প্রাকৃতিক রূপ নদীর মধ্য ও নিম্নাঞ্চলে দেখা যায়।

প্লাবন ভূমি (Flood Plain)

প্রাথমিক ভূমির অনিয়মতার জন্য সর্বদাই নদীর কোন কোন স্থানে বাঁকের সৃষ্টি হয়। এই বাঁকের বহিঃ প্রান্তদেশে নদীর জলস্রোত সরাসরি আঘাত করে ও এর সঙ্গে পাড়ের ক্ষয়ও সংযুক্ত হয়। ফলে এই অংশে নদীর ক্ষয়কার্য বেশী হয় ও বাঁকের বক্রতা বাড়তে থাকে। স্বভাবতই এই অংশে নদী যে ভূমি পরিত্যাগ করে এসেছে সেই অংশে ঢাল মৃদু হয় এবং বাঁকের বহিঃ প্রান্তদেশের ঢাল খাড়া হয়। ফলে নদীর পার্শ্বদেশে অপ্রতিসম ঢালের সৃষ্টি হয়। এইভাবে ঢালের একদিকে প্রায় সমতল বা সামান্য ঢালযুক্ত ভূমির সৃষ্টি হয়। প্লাবনের সময় এর ওপর পানির অনুপ্রবেশ ঘটে ও পানি মধ্যস্থিত পলি এই ভূমির ওপর থিতিয়ে পলির এক আস্তরণ ফেলে। এর ফলে ঐ প্রায় সমভূমি আরও মসৃণ হয়ে ওঠে। একেই প্লাবন ভূমি বলে (চিত্র- ৭.৫.১)।

চিত্র ৭.৫.১ ঃ প্লাবন সমভূমি ও প্রাকৃতিক বাঁধ

খোদিত নদী বাঁক (Incised meander)

নদীর পুনঃ যৌবন প্রাপ্তি ঘটলে নদীর নিম্নক্ষয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে নদীর বাঁকের মধ্যে কেটে বসে যায় ও দুপাড় খাড়া প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ থাকে। খোদিত নদী বাঁকের ক্ষেত্রে নদীর তল পূর্বেকার প্লাবন ভূমির অনেক নিম্নে থাকে এবং প্লাবন পানি কখনোই ঐ অংশে উত্থিত হতে পারে না। স্বভাবতই এই অবস্থা নদীর বর্ধিত নিম্নক্ষয় বা নদীর পুনঃযৌবন প্রাপ্তির ফলে সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

পরবর্তীকালে প্লাবন সমভূমিতে যেমন- পরিত্যক্ত নদীবাঁক, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি হয়, তেমন অসম পাড় খোদিত নদীর বাঁকের ক্ষেত্রেও একই ভাবে এরূপ হ্রদের সৃষ্টি হতে পারে। একে বিচ্ছিন্ন নদী বাঁক (meander cut off) বলে।

নদী মঞ্চ (River Terrace)

নদীর উভয় পার্শ্বে অনেক সময় এক বা একাধিক ধাপ বা মঞ্চ দেখা যায়। এ মঞ্চ পূর্ণযৌবন লাভের পূর্ববর্তীকালের নদী উপত্যকার তলদেশের সমতল প্লাবন ভূমিকে উপস্থাপিত করে। পূর্ণযৌবন প্রাপ্তির ফলে নদী নিচে কেটে বসে যায় বলে পূর্বেকার নদী উপত্যকার সমতল মেঝে (প্লাবন ভূমি) নদীর দুই পাশে কিছুটা ঊর্ধ্বে মঞ্চের আকার বিরাজ করে। সিঁড়ির ন্যায় অবস্থিত এ ধাপগুলোকে নদীমঞ্চ বা নদী সোপান (চিত্র- ৭.৫.২) বলা হয়। নদীর উচ্চ ও মধ্যগতিতে নদী মঞ্চের সৃষ্টি

হয়। নদীর পূর্ণযৌবন লাভ ছাড়াও বিভিন্ন ঋতুতে নদীর পানির উর্ধ্ব সীমানার পরিবর্তন ঘটলেও নদীমঞ্চের সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, তিস্তা ইত্যাদি নদীর গতিপথে এরূপ নদীমঞ্চ দেখতে পাওয়া যায়।

চিত্র ৭.৫.২ ঃ নদী মঞ্চ

সাধারণত দুই প্রকারের নদীমঞ্চ দেখা যায়। যেমন- (১) শিলা মঞ্চ ও (২) পলল মঞ্চ। নদীর সমতল উপত্যকায় যদি পলির গভীরতা কম হয়ে থাকে, তবে আদি শিলা ক্ষয় হলে নদী মঞ্চের সৃষ্টি হয়। এই জাতীয় মঞ্চকে শিলা-মঞ্চ (Rock terrace) বলে। আবার পুরু পলল স্তর দ্বারা গঠিত সমতল উপত্যকার ওপর নদী পূর্ব প্রক্রিয়ায় পূর্ণযৌবন লাভের মাধ্যমে নদী মঞ্চের সৃষ্টি করলে এ জাতীয় মঞ্চকে পলল মঞ্চ (Alluvial Terrace) বলা হয়।

ক্ষয়চক্র (Cycle of Erosion)

নদীর বিভিন্ন গতিতে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে প্রধান নদীটি খুবই খরস্রোতা ও ঢালযুক্ত। উপনদী ও শাখা নদীর সংখ্যা খুবই কম। নদীর ক্ষয় সাধনই প্রধান কাজ। পরিণত অবস্থায় নদীর উপনদী ও শাখা নদীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নদীর ঢাল ক্রমেই হ্রাস পায়। নদী বড় বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হতে পারে এবং নদী সৃষ্ট প্লাবন ভূমিতে এই বাঁকগুলো স্থান পরিবর্তন করে। পরবর্তী পর্যায়ে বার্ধক্য অবস্থায় নদীর ঢাল আরও হ্রাস পায় এবং নদীর মধ্যে ও পাড়ে নদীবাহিত তলানির সঞ্চয় ঘটে। নদী অগভীর ও অস্বাভাবিক প্রশস্থতা লাভ করে (চিত্র- ৭.৫.৩)। আবার প্রাকৃতিক কারণেই সমভূমি পুনরায় উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে পরিণত হয়ে নদী প্রাথমিক বা যৌবন অবস্থায় নিয়ে যায়। একেই ক্ষয়চক্র বলা হয়। আমেরিকান ভূ-বিজ্ঞানী এম, ডেভিস প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ক্ষয়চক্র ধারণার প্রবর্তন করেন এবং ভূমিরূপের বিবর্তনে এর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। নদী দ্বারা ক্ষয়কার্যের ফলে যে ক্ষয়চক্রের ধারা নির্দিষ্ট হয় তাকে **নদী ক্ষয়চক্র** বা **স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র** বলে। নদী পার্বত্য অবস্থা থেকে পরিণত অবস্থা এবং শেষে বার্ধক্য অবস্থায় পোঁছার পরে আবার বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে নদীর প্রাথমিক গতিতে ফিরে যাওয়াকে নদীর পুনঃযৌবন প্রাপ্তি (Rejuvination) বলে।

চিত্র ৭.৫.৩ ঃ ক্ষয়চক্র চলাকালে ভূমি বিবর্তনের বিভিন্ন অবস্থা

পাঠসংক্ষেপ

মধ্যগতিতে যে সকল ক্ষয়কার্য সংঘটিত হয় তা নদীর উর্ধ্ব গতিতেও লক্ষ্য করা যায়। মধ্যগতিতে নদীর পাড় বেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং বাঁকের সৃষ্টি করে। ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে নদী মঞ্চের সৃষ্টি হয়। এসময় নদী খরস্রোতা কাকে এবং উপনদী, শাখানদী প্রভৃতি সৃষ্টি করে। নদী প্রশস্ততা লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১.১. নদীর মধ্যগতিতে ___________ আকৃতির উপত্যকা গঠিত হয় কারণ এখানে নদীতে ______________ ক্ষয় অপেক্ষা পার্শ্বক্ষয় বেশী হয়।

১.২. গিরিখাত, ক্যানিয়ান, জলপ্রপাত ইত্যাদি নদীর ____________ গতিতে গঠিত হয়।

১.৩. নদীর ____________ গতিতে নদী মঞ্চের সৃষ্টি হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন

১.নদীর মধ্য গতিতে কি প্রকারের ভূমিরূপ গঠিত হয়।

২.স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র বলতে কি বোঝায় ?

উত্তরঃ ১.১. V, উলম্ব   ১.২. উর্ধ্ব ও মধ্য   ১.৩. মধ্য

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. নদীর মধ্য ও নিম্ন গতিতে কি প্রকারের ভূমিরূপ গঠিত হয়।

২. নদীর স্বাভাবিক ক্ষয়চক্র বলতে কি বোঝায় ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মধ্য গতিতে নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপের বর্ণনা দিন।

পাঠ- ৭.৬ ঃ নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ
(Depositional Features of River)

এই পাঠ শেষে আপনি—

- নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ সমূহের নাম বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ উদ্ভবের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে নদীর নিম্নগতি থাকে। এ সময় নদী উপত্যকা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত হয় এবং গভীরতা একেবারে কমে যায়। ফলে নদীবাহিত শিলাচূর্ণ নদীস্রোতের দ্বারা বহিত হয়ে নদীগর্ভে ও নদীর উভয় পার্শ্বে সঞ্চিত হয়। নদীর এ অংশে পলি সঞ্চয়নই প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে নদীতীর প্রায়ই ক্ষয় হয়ে যায় এবং অত্যন্ত বিস্তৃত প্লাবন ভূমি গড়ে উঠে। নদী এ বিস্তৃত প্লাবন ভূমিতে তার গতিপথ পরিবর্তন করে থাকে। এ অংশের প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিরূপের মধ্যে মৃদু ঢাল বিশিষ্ট প্লাবন ভূমি, নদী বাঁক, নদী ধাপ, নদীতীর জলাভূমি, বিনুনী নদী, ব-দ্বীপ অন্যতম।

নদী যখন বার্ধক্য অবস্থায় উপনীত হয় তখন নদীর ঢাল প্রায় থাকে না। নদীর এ অংশে পলি সঞ্চয়নই প্রধান বৈশিষ্ট্য।

নদী তার বিস্তৃত প্লাবন ভূমিতে গতিপথ পরিবর্তন করে থাকে। এই অংশের প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিরূপের মধ্যে মৃদু ঢাল বিশিষ্ট প্লাবন ভূমি, নদীবাঁক, নদীধাপ, নদীতীর জলাভূমি, বিনুনী নদী, ব-দ্বীপ অন্যতম।

নীচে নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ সমূহের বিবরণ দেয়া হলো।

নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ সমূহ

১) পলল পাখা ও পলল কোণ (Alluvial Fan & Alluvial Cone)

পর্বত বা পাহাড়ী অংশ থেকে নদী সমতল ভূমিতে নেমে আসার ফলে ঢাল দ্রুত কমে যায়। এ অবস্থায় নদীর পক্ষে নদীর পানিতে বাহিত বিভিন্ন ধরণের পদার্থের বোঝা বহন করা সম্ভব হয় না। ফলে তা পাদদেশের নদী খাতেই সঞ্চয় করে। এক পর্যায়ে নদী তার এ বোঝা এড়িয়ে নতুন পথে নিম্ন অঞ্চলে অগ্রসর হয়। এভাবে নদী পাহাড়ের পাদদেশের এক পাশ থেকে অন্য পাশে স্থান পরিবর্তন করে এবং অবশেষে তা পাখার ন্যায় ঢালু ভূমিরূপ গড়ে তোলে। এ ধরণের ভূমিরূপ ব-দ্বীপের মতো দেখতে হলেও এর উৎপত্তি ও গঠন কাঠামোগত দিক থেকে আলাদা। ব-দ্বীপের ক্ষেত্রে নদীপ্রবাহ সমুদ্রতল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পলিসমূহ পানিতে সঞ্চিত হয়। তাছাড়া ব-দ্বীপ ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণও সমুদ্র বা হ্রদ তল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পক্ষান্তরে, পলল পাখা শুষ্ক এলাকায় গঠিত হয় এবং ঊর্ধ্ব ভাগের সম্প্রসারণ পানি তল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া, ব-দ্বীপ বাছাইকৃত মিহি বালি, পলি ও কর্দমে গঠিত কিন্তু পলল পাখার পলি মোটা মোটা, বড় বড় শিলা টুকরো এবং বাছাইকৃত বালি ও নুড়ি পাথরই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

চিত্র ৭.৬.১ ঃ পললপাখা

চিত্র ৭.৬.২ ঃ পলল কোন

যে সকল অঞ্চলে মাটি অধিক পরিমাণ পানি শোষণ করতে পারে, সে সকল অঞ্চলের সঞ্চয় প্রশস্ত না হয়ে কোণাকৃতি হয়। একে পলল কোণ (Alluvial cone) বলে। কিন্তু পাহাড়ের পাদদেশে মৃত্তিকা কঠিন হলে নদী সঞ্চয় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে হাত পাখার ন্যায় ভূ-খণ্ডের সৃষ্টি করে। এরূপ পলল ভূমিকে পলল পাখা (Alluvial Fan) বলা হয়।

২. পাদদেশীয় পলল সমভূমি (Peidmont Alluvial Plain)

অনেক সময় পাহাড়িয়া নদী দ্বারা পলি সঞ্চিত হয়ে পাহাড়ের পাদদেশে নতুন সমভূমি গড়ে ওঠে। এরূপ সমভূমিকে পাহাড়ের পাদদেশীয় পলল সমভূমি বলা হয়। বাংলাদেশের রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ স্থানই পলল সমভূমি নামে পরিচিত। তিস্তা, আত্রাই, যমুনেশ্বরী প্রভৃতি নদী দ্বারা এ অঞ্চল বিধৌত। এসব নদী হিমালয় পর্বত হতে উৎপন্ন হয়েছে। ফলে নদীগুলো সহজেই পাহাড় হতে পলল বহন করে এ অঞ্চলে সঞ্চয় করে পাদদেশীয় পললভূমি গঠন করেছে। পাহাড়ের পাদদেশে দুই বা ততোধিক পলল পাখা বা কোণ মিলিত হয়েও পাদদেশীয় পলল সমভূমি গঠন করতে পারে।

৩) প্লাবন সমভুমি (Flood Plain)

অধিকাংশ নদী তার নিম্ন প্রবাহে সুক্ষ্ম কর্দম, পলি প্রভৃতি সঞ্চিত করে থাকে। বন্যার সময় বা প্লাবনে নদীর দু'কূল ভাসিয়ে পানিতে ডুবে যায় এবং তাতে নতুন পলি সঞ্চিত হয়। এরূপ নদীর নিম্নাংশে বা মোহনায় পলি সঞ্চিত হয়ে প্লাবন সমভূমির (Flood Plain) সৃষ্টি করে। গঙ্গা, পদ্মা, নীল, ইয়াংসিকিয়াং প্রভৃতি নদীর মোহনায় এরূপ প্লাবন সমভূমি রয়েছে। প্লাবন সমভূমিতে স্বাভাবিক বাঁধ, পশ্চাৎ জলাভূমি, নদীর বাঁক, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, কর্দম ছিপি, বালুচর প্রভৃতি ভূমিরূপ দেখা যায় (চিত্র- ৭.৬.৩)।

চিত্র ৭.৬.৩ ঃ প্লাবন সমভূমিতে প্রাকৃতিক বাঁধ, কর্দম ছিপি, পশ্চাৎ জলাভূমি প্রভৃতির অবস্থান

৪) প্রাকৃতিক বাঁধ (Natural Levee)

প্লাবন ভূমিতে নদীর তীরবর্তী এলাকায় প্রাকৃতিক/স্বাভাবিক বাঁধ লক্ষ্য করা যায়। নদীর নিকটবর্তী এলাকায় এর উচ্চতা সবচেয়ে বেশী হয় এবং পিছনের দিকে এটি ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে যায়। এটা দুই কিলোমিটার বা তারও বেশী চওড়া হতে পারে। প্লাবনের সময় নদীর পরিবহন ক্ষমতার বৃদ্ধি এই স্বাভাবিক বাঁধের উৎপত্তির প্রধান কারণ। প্লাবনের সময় নদীর দু'কূল ছাপিয়ে যখন পানি পার্শ্ব দিকে প্রবাহিত হয় তখন উর্ধ্ব ঢালের দিকে পানি প্রবাহ থাকে বলে পানি মধ্যস্থিত পলি নদীর তীরবর্তী এলাকায় সবচেয়ে বেশী ও যতদূর যাওয়া যায় ততোই কম সঞ্চিত হয়। বারংবার প্লাবনের ফলে এরূপ সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়ে বাঁধের আকার ধারণ করে ও প্লাবন ভূমিতে এক বিশিষ্ট ভূমিরূপের সৃষ্টি করে।

নদী গতিপথ পরিবর্তনের ফলে পূর্ববর্তী নদী প্রাকৃতিক বাঁধ প্লাবন সমভূমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। ক্ষয়ের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে। অনেক প্লাবনের সময় নদী স্বাভাবিকভাবে কতগুলো অগভীর খাত বরাবর প্রবাহিত হয়। এগুলোকে প্লাবন ভূমি কর্তিত পথ (Flood plain scour route) বলে। এরা পুরোনো নদীখাতকে বা নতুন নদীখাত সৃষ্টির সূচনাকে উপস্থাপিত করে।

৫) পশ্চাৎ জলাভূমি সঞ্চয় (Back swamp deposit)

নদী প্রাকৃতিক বাঁধের পশ্চাতে প্লাবন পর্যাঙ্কে পশ্চাৎ জলাভূমির সঞ্চয় সৃষ্টি হয়। পলি ও কাঁদা দিয়ে এই সুবিস্তৃত সঞ্চয় গঠিত হয়। পশ্চাৎ জলাভূমি সঞ্চয় এলাকায় বন্ধুরতা খুবই কম। সাধারণত দুই মিটারেরও কম থাকে। এই এলাকায় প্রাচীন নদী উপত্যকার অংশ বিশেষ অবশিষ্ট থাকতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে পৌনঃপুনিক প্লাবনের ফলে এই চিহ্ন বিলুপ্ত হয়।

প্রাকৃতিক বাঁধের পশ্চাৎ দিকে নদীর পলি সঞ্চয় ক্রমশ কম হওয়ায় তা নিম্নভূমিরূপে অবস্থান করে। বর্ষার পরে বন্যার পানি সরে গেলে এ নিম্নভূমিতে জল আবদ্ধ অবস্থায় থেকে যায়। প্রাকৃতিক বাঁধের পশ্চাতে অবস্থিত এরূপ জলাবদ্ধ ভূমিকে পশ্চাৎ জলাভূমি (Back Swamp) বলা হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীর স্বাভাবিক বাঁধের পশ্চাতে জলাভূমিও রয়েছে। এগুলো অনেকসময় 'বিল' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

৬) পশ্চাৎ ঢাল (Back slope)

স্বাভাবিক বাঁধের পশ্চাতে অপেক্ষাকৃত নিচু ঢালু ভূমিকে পশ্চাৎ ঢাল বলা হয়। এ পশ্চাৎ ঢাল জলাভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতে পারে। বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীর পশ্চাতে এরূপ পশ্চাৎ ঢাল রয়েছে।

৭) জলাভূমি (Marshes or Bill)

নদী গতি পরিবর্তন করলে প্লাবন ভূমির মধ্যস্থ পরিত্যক্ত গতিপথ ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে উঠে। কিন্তু যে সব স্থান ভরাট হয় না সেখানে পানি জমে জলাভূমির সৃষ্টি করে। আবার প্লাবন ভূমির অভ্যন্তরের নিচু অঞ্চলে পানি জমেও জলাভূমির সৃষ্টি হয়। এরূপ জলাভুমিকে বিল (Bill) বলা হয়। রাজশাহীর চলন বিল, গোপালগঞ্জ জেলার বিল ও সিলেটের বিল এ জাতীয় জলাভূমির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৮) নদী বাঁক (Meander)

নদী বাঁক একটি গুরুত্বপূর্ণ নদীজ বৈশিষ্ট্য যা প্রায়ই চোখে পড়ে। নদী বাঁকের ক্ষয় ক্রিয়ার কারণে নদী খাতের অবস্থানে ক্রমাগত পরিবর্তন হয়, কিন্তু খাতের আয়তন অপরিবর্তনীয় থাকে। নদীর গতিপথে উঁচু-নিচু স্থান বা কঠিন শিলা থাকলে নদীর গতি বেঁকে যায়। একে সর্পিল বা আঁকাবাঁকা নদী (Meandering River) বলে। যদিও নদী আঁকাবাঁকা হওয়ার বহুবিধ কারণ আছে। বাঁকের মুখে নদীর তীরের যে স্থানটি স্রোতের ঠিক সম্মুখে থাকে, স্রোতের আঘাতে সেখানে খুব বেশী ক্ষয় হয়। ফলে ঐ স্থানে নদী প্রতি বছর ভাঙ্গতে থাকে এবং তার বিপরীত দিকে স্রোতের বেগ হ্রাস পাওয়ায় সেখানে পলি মাটি ও বালুকা সঞ্চিত হয়ে চর পড়তে থাকে। বাঁক পার হয়ে পানি স্রোতের গতি আড়াআড়িভাবে নদীপথ অতিক্রম করে। ফলে অপর তীরেও বাঁক সৃষ্টি হয়। এরূপ বাঁক সৃষ্টি করতে করতে নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। বাঁক সৃষ্টির ফলে নদীর দৈর্ঘ্যও বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমিতে এরূপ ভূ-প্রকৃতি দেখা যায়। নদী আঁকাবাঁকা হয়ে উত্তল ও অবতল পাড়ের সৃষ্টি করে। উত্তল পাড়ে সঞ্চয় এবং অবতল পাড়ে ক্ষয়সাধন করে। উত্তল পাড়ের পলি সঞ্চয় করে যে সংলগ্ন চরের সৃষ্টি করে তাকে বিন্দু বার (Point bar) বলে (চিত্র- ৭.৬.৪)।

চিত্র ৭.৬.৪ ঃ নদীর বাঁক

৯) অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ (Ox bow lake)

সমভূমিতে প্রবাহিত কোন কোন নদীতে অসংখ্য বাঁক দেখা যায়। কোনো কোনো সময় এ বাঁক এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, দুটি বাঁক নিজেদের খুব কাছাকাছি এসে পড়ে। এক পর্যায় উভয় অংশ মিলে যায় এবং নদী সোজা ভাবে বইতে থাকে। আর ক্ষয়প্রাপ্ত বাঁকা অংশটি নদীখাত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে হ্রদের আকার ধারণ করে। এরূপ হ্রদগুলো দেখতে অনেকটা অশ্বের ক্ষুরের ন্যায় বলে এদের অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বলা হয় (চিত্র- ৭.৬.৫)। বাংলাদেশের পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীতে বহু

অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ দেখা যায়। এসব হ্রদে পলি মাটি সঞ্চিত হলে সেগুলো ভরাট হয়ে সমভূমিতে পরিণত হয়। এরূপ সমভূমিকে কর্দম ছিপি (Clay Plug) বলে। এরূপ ভূমিরূপ বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে দৃষ্ট হয়।

চিত্র ৭.৬.৫ ঃ অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ

১০) বালুচর ও বিনুনী নদী (Sand bar and Braided River)

কোন নদীর পরিবহন ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত পলি উৎস অঞ্চল থেকে নদীতে সরবরাহ হলে তা নদী খাতেই জমা হয়। নদীর ভেতর বালি, নুড়ি, কাঁকর, কর্দম ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে যে নতুন ভূমির সৃষ্টি হয়, তাকে বালু চর বলে। এই বালুচর প্রধানত দুটি কারণে সৃষ্টি হয়। প্রথমত, নদীর পানিতে যখন অতিরিক্ত বালু, কর্দম, নুড়ি ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে তখন স্রোতের বেগ কমে যায় এবং বাহিত পদার্থসমূহ দ্রুত সঞ্চিত হয়ে বালু চরের (Sand bar) সৃষ্টি হয়। নদীখাতে অতিরিক্ত পলি সঞ্চয়নের কারণে বহুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এরূপ বহু শাখা বিশিষ্ট পানির ধারা অনেকটা চুলের বিনুনীর মতো দেখতে। একে বিনুনী নদী বা চর উৎপাদী নদীও বলা হয়।

যে সকল নদীতে প্রবাহ মাত্রা ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন ব্যাপক হয় সেখানে এ ধরণের নদী বিন্যাস দেখা যায়। বাংলাদেশের যমুনা নদীতে এ ধরণের বিনুনী বিন্যাস দেখা যায়। এজন্য যমুনা নদীকে চর উৎপাদী বলা হয়।

১১) ব-দ্বীপ (Delta)

নদীর নিম্ন গতিতে স্রোতের বেগ খুব কমে যায় এবং নদীর পানির সঙ্গে মিশ্রিত শিলাচূর্ণ, বালি, কাঁদা প্রভৃতি তলানিরূপে সঞ্চিত হতে থাকে। নদীর মোহনায় সমুদ্রের লবণ মিশ্রিত পানি এ তলানি পড়তে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। নদী যদি কোনো কম স্রোত বিশিষ্ট বা স্রোতহীন সমুদ্রে পড়ে, তাহলে ঐ সমস্ত তলানি নদীর মুখে জমতে জমতে নদী মুখ প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং কালক্রমে ঐ চরাভূমি সমুদ্র পানির ওপর উঁচু হয়ে ওঠে। তখন নদী বিভিন্ন শাখায় ঐ চরাভূমিকে বেষ্টন করে সমুদ্রে পতিত হয়। নদী মোহনাস্থিত ত্রিকোণাকার এ নতুন ভূমিকে ব-দ্বীপ বলে।

যখন নদী কোনো সাগরে, হ্রদে বা অন্য কোনো জলাশয়ে শেষ পর্যায়ে এসে মিলিত হয়, তখন নদী পরিবাহিত পলি ঐ অংশে মাত্রাহীন 'Δ'-এর (ল্যাটিন Δ ডেল্টা) আকারে সঞ্চিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এর আকার আকৃতি বিশেষভাবে নির্ভর করে নদীবাহিত পললের পরিমাণ, গঠন ও যেখানে পলি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে সেই স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর।

মিহি পলি ও কর্দম মোহনা থেকে কিছুটা দূরে অনুভূমিক ভাবে সঞ্চিত হয়ে নিম্নতল (Bottomset Beds) সৃষ্টি করে। নিম্নতল সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই অগ্রবর্তী তল (Fore set beds) গঠিত হয়। অগ্রবর্তী তল মোটা পলি দ্বারা গঠিত। এ সমস্ত পলি অপেক্ষাকৃত বড় হওয়ায় নদী সমুদ্র বা হ্রদে প্রবেশ করার পরপরই জমা হয়ে ঢালু স্তর তৈরী করে। এ অগ্রবর্তী তল সাধারণত বন্যাকালীন পলি আস্তরণে ঢেকে যায়। একে ঊর্ধ্বতল (Topset beds) বলে। ব-দ্বীপ যতোই সমুদ্রের দিকে বাড়তে থাকে নদীর ঢালও ক্রমাগত হ্রাস পায়। এ অবস্থায় নদী দ্রুত গতি ধারা বদল করে এর ভিত্তি তলের সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নেয়।

নদীর প্রধান ধারা অনেকগুলো শাখায় বিভক্ত (Distributaries)। এ সমস্ত শাখা নদীর মাধ্যমে প্রবাহ সমুদ্রে পৌঁছে। শাখা নদীসমূহ দ্রুত স্থান বদল করে ধীরে ধীরে একটি আদর্শ ব-দ্বীপের সৃষ্টি করে। সমুদ্রের তরঙ্গের প্রকৃতি ও শক্তি, জোয়ার ভাটার বৈশিষ্ট্য এবং তটরেখার অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে ব-দ্বীপের আকৃতিতেও বেশ বৈচিত্র দেখা যায়।

পাঠসংক্ষেপ

নদী সমুদ্রের নিকট এসে উপনীত হলে নদীর ঢাল ও গভীরতা একেবারে কমে যায়। নদীর উপত্যকা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত হয়। নদীবাহিত শিলাচূর্ণ নদী স্রোতের দ্বারা বাহিত হয়ে নদী গর্ভে ও নদীর উভয় পার্শ্বে সঞ্চিত হয়। নদীর এ অংশে পলি সঞ্চয়নই প্রধান বৈশিষ্ট্য। নদী তার বিস্তৃত প্লাবন ভূমিতে গতিপথ পরিবর্তন করে থাকে। এই অংশের প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিরূপের মধ্যে মৃদু ঢাল বিশিষ্ট প্লাবন সমভূমি, নদী বাঁক, প্রাকৃতিক বাঁধ, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, কর্দম ছিপি, নদী ধাপ, নদীতীর জলাভূমি, বিনুনী নদী ও ব-দ্বীপ অন্যতম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৬

শূন্যস্থান পুরণ করুন

১.১. নদী বার্ধক্য অবস্থায় উপনীত হলে নদীর ___________ খুব কমে যায়।
১.২. বার্ধক্য অবস্থায় নদীর _________ অপেক্ষা ________ কার্যই অনেক বেশী হয়।
১.৩. নদীর বাঁক বৃদ্ধি পেয়ে এক সময় নদীর বাঁক অংশটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, একে ______________ হ্রদ বলে।
১.৪. অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদে পলি জমা হয়ে ভরাট হয়ে গেলে একে _____________বলে।
১.৫. নদী সমুদ্রে এসে পতিত হলে নদীর মোহনায় যে মাত্রাহীন 'ব' এর মত পলি সঞ্চিত স্থানকে ___________ বলে।

উত্তর ঃ ১.১. গভীরতা ১.২. ক্ষয়কার্য ১.৩. অশ্বক্ষুরাকৃতি ১.৪. প্লাবন সমভূমি ১.৫. ব-দ্বীপ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব-দ্বীপ কাকে বলে ?
২. প্রাকৃতিক বাঁধ কি?
৩. পলল পাখা কাকে বলে?
৪. নদীর বাঁক বলতে কি বুঝেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপের বিবরণ দিন।

ইউনিট ৮

বায়ুমন্ডল (Atmosphere)

পাঠ- ৮.১ ঃ বায়ুমন্ডলের গুরুত্ব ও উপাদান, গভীরতা এবং বৈশিষ্ট্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বায়ুমন্ডলের গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- বায়ুমন্ডলের উপাদান সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- বায়ুমন্ডলের গভীরতা জানতে পারবেন; এবং
- বায়ুমন্ডলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

বায়ুমন্ডলের গুরুত্ব

অদৃশ্য হলেও বায়ুমন্ডল প্রাণীর অস্তিত্বের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। স্থানভেদে বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন উপাদানগত তারতম্য মানুষের কর্মকান্ডকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বর্তমানে মানুষ তার পরিবেশ নিয়ে যতটা উদ্বিগ্ন। এক যুগ আগেও তা লক্ষ্য করা যায়নি। বায়ুমন্ডলীয় ও জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞানীরা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী সচেতন। বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, বায়ুমন্ডলীয় গঠণ উপাদানের সামান্য পরিবর্তন মানুষের অস্তিত্বের জন্য এক মারাত্মক হুমকি। পৃথিবীর পরিবেশীয় সম্পদ অফুরন্ত নয়। এ সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহারের ফলে বিগত কয়েক দশকে পানি ও মাটির সাথে বায়ুমন্ডলও ব্যাপকভাবে দূষিত হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের কর্মকান্ড যেমন, ব্যাপক হারে গাছ-পালা কেটে ফেলা, কলকারখানার ধোঁয়া, জ্বালানী তেল, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানো থেকে নির্গত ধোঁয়া, এবং বিষাক্ত গ্যাস বায়ুমন্ডলকে দূষিত করে তুলেছে। অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, বায়ুমন্ডলের গুরুত্বপূর্ণ ওজনস্তর যা সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিকে শোষণ করে পৃথিবীর প্রাণীকুলকে রক্ষা করে তার পুরুত্ব কোথাও মারাত্মক হ্রাস পেয়েছে এবং কোথাও অনুপস্থিত। তাছাড়া, বায়ুমন্ডলীয় উপাদান, কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে বায়ুমন্ডলীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আশংকা করেন, বায়ুমন্ডলীয় উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে মেরু অঞ্চলে ও পার্বত্য অঞ্চলের বরফ কিছুটা গলে যাবে। এতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও খরার মত প্রাকৃতিক দূর্যোগ আরও বৃদ্ধি পাবে।

জলবায়ুগত এ সমস্ত সমস্যা অনেক জটিল বিষয়। এ সম্পর্কে জানার জন্যে প্রথমেই বায়ুমন্ডল সম্পর্কে, বিশেষত এর গঠণ, কার্যাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা জরুরী।

> বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে কি ধরণের প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঘটতে পারে?

বায়ুমন্ডলের উপাদান

বায়ুমন্ডল বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। এই গ্যাসীয় মিশ্রণ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৮০ কি. মি. উচ্চতা পর্যন্ত প্রায় সমান। জলীয় বাষ্প, ধুলিকণা ব্যতীত বিশুদ্ধ বায়ুর ৯৯ শতাংশই নাইট্রোজেন (৭৮%) এবং অক্সিজেন (২১%) দ্বারা গঠিত। এ দুটি গ্যাস বায়ুমন্ডলের অন্যতম উপাদান এবং প্রাণীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও আবহাওয়ার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উভয়ের ভূমিকা কম। শুষ্ক বায়ুর বাকি ১ শতাংশ প্রধানত আরগন ও অত্যন্ত কম মাত্রার অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস দ্বারা গঠিত। এ সমস্ত গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড মাত্র ০.০০৩ শতাংশ হলেও এটি বায়ুর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ এটি পৃথিবী থেকে বিকিরণকৃত তাপশক্তি শোষণের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলকে উষ্ণ রাখে। নিচের টেবিলটি লক্ষ্য করুন-

সারণি ৮.১.১ ঃ আয়তন অনুযায়ী বিশুদ্ধ বায়ুর গঠনকারী উপাদান

গ্যাস	শতাংশ	গ্যাস	শতাংশ
নাইট্রোজেন (N_2)	৭৮.০৮	হাইড্রোজেন (H_2)	অত্যন্ত স্বল্পমাত্রা
অক্সিজেন (O_2)	২০.৯৫	জেনন (xe)	”
আরগন (A)	০.৯৩	ওজন (O_3)	”

গ্যাস	শতাংশ	গ্যাস	শতাংশ
কার্বন ডাইঅক্সাইড (Co_2)	০.০০৩	সালফার ডাইঅক্সাইড (So_2)	”
নিয়ন (Ne)	অত্যন্ত স্বল্প মাত্রা	নাইট্রোজেনর ডাইঅক্সাইড (No_2)	”
হিলিয়াম (He)	”	আয়োডিন (I_2)	”
মিথেন (CH_4)	”	অ্যামেনিয়া (NH_2)	”
ক্রিপটন (K_r)	”	কার্বন মনোক্সাইড (Co)	”
নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O)	”		

কার্বন ডাই অক্সাইড (Co_2)

যদিও শুষ্ক বায়ুতে মাত্র ০.০০৩ শতাংশ থেকে ০.০৪ শতাংশ কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে তবুও এর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কার্বন ডাই অক্সাইড মূলত: দুটি বিশেষ ক্রিয়ায় অবদান রাখে

- সালোক সংশ্লেষণ ও
- তাপশক্তি শোষণ।

বায়ুর আর্দ্রতা ঃ বায়ু কখনই জলীয়বাষ্প বিহীন থাকে না। বায়ুমন্ডলে জলীয়বাষ্পের পরিমাণগত তারতম্য আছে। জলীয়বাষ্প আবহাওয়া এবং জলবায়ুকে নিম্নলিখিতভাবে প্রভাবিত করে-

১. জলীয়বাষ্প বায়ুমন্ডলের একমাত্র উপাদান যা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ঘনিভূত হয়। তাছাড়া, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, বারিপাতের ধরণ ও পরিমাণ নির্ধারণ করে।

২. সূর্যালোক থেকে আগত তাপ এবং পৃথিবী থেকে বিকিরণকৃত তাপ উভয় শক্তিই শোষণ করে বায়ুর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৩. সুপ্ত তাপ বা সঞ্চিত শক্তির উৎস যখন তরল পদার্থ বা বরফ জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়, তখন তাপশক্তি ব্যয় হয়। বায়ু মন্ডলের ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, বজ্রপাতের অন্যতম শক্তির উৎস বাষ্পীয় স্থিতি শক্তি।

জলীয়বাষ্প কিভাবে বায়ুমন্ডলকে প্রভাবিত করে?

বায়ুর ধুলিকণা

বায়ুমন্ডলে ধুলিকনা বিদ্যমান। নগর বা শিল্প এলাকায় নিম্ন বায়ু মন্ডলে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ১০০,০০০ ধূলিকণার বেশী থাকতে পারে। ধূলিকণা আবহাওয়ার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন-

- ধূলিকণা সূর্যালোক প্রতিফলিত করে, রশ্মি বিচ্ছুরন ঘটায় এতে আকাশ নীলাভ মনে হয়।
- সূর্যালোকের ওপর ধূলিকণার প্রভাবে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে লাল বাদামী রঙের বৈচিত্র্য দেখা যায়।
- আগ্নেয়ক্রিয়তার ফলে উদগিরিত পদার্থ যেমন ধূলিকণা ভস্ম দূর আকাশে বহুদিন ঢেকে থাকায় সূর্যলোক প্রবেশ করতে না পারায়, তাপমাত্রার হ্রাস ঘটে।
- শহরের বিভিন্ন যান্ত্রিক কর্মকান্ডের উপজাত হিসেবে কিছু বিশেষ ধরণের অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা, লবনকনা, কয়লা ও জ্বালানি তেলের ধোঁয়া ও সালফার ডাই অক্সাইডকে ভিত্তি করে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়।

ওজনস্তর

এটি বায়ুমন্ডলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি অক্সিজেনের একটি পরমানু দ্বারা গঠিত। পৃথিবীতে বসবাসকারী সব প্রানীর জন্য ওজনস্তর গুরুত্বপূর্ন। কারণ ওজনস্তর সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুনী রশ্মি শোষন করে পৃথিবীকে প্রানীর বসবাস উপযোগী করে।

বায়ুর গভীরতা

বায়ুমন্ডলের গভীরতা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তবে নানা প্রকার অনুমাণের দ্বারা বায়ুমন্ডলের গভীরতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ উল্কা ও মেরুজ্যোতির কথা ধরা যায়। যেমন, উল্কা বায়ুমন্ডলে পৌঁছালে জ্বলে ওঠে। বায়ুমণ্ডল উর্ধ্বে প্রায় ৮৮৫ কি. মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। মেরু প্রদেশে ১২৮৭ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। মেরু প্রদেশে ১২৮৭ কি.মি. উপরে মেরুজ্যোতি দৃষ্ট হয়। এতে অনুমান করা যায় যে ভূ-পৃষ্ঠের ১২৮৭ কি. মি. উর্ধ পর্যন্ত বায়ুমন্ডল বিস্তৃত। বায়ুমন্ডলের

গভীরতা যাই হোক না কেন, এটা নিশ্চিত যে বায়ুর ৯৭% ভাগ পদার্থই বায়ুমন্ডলের নিম্নভাগের ২৯ কি.মি. এর মধ্যে বিস্তৃত।

বায়ুমন্ডলের বৈশিষ্ট্য

বায়ুর তাপ ও চাপের বিষয় বুঝতে হলে বায়ুর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বায়ুর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

১. বায়ু উষ্ণ হলে প্রসারিত এবং হালকা হয়। শীতল হলে সংকুচিত এবং ভারী হয়।
২. বায়ুর ওপর চাপের আধিক্য হলে এটি সংকুচিত হয়, ভারি ও উষ্ণ হয় এবং চাপ হ্রাস পেলে প্রসারিত, হালকা ও শীতল হয়।
৩. জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা লঘু।
৪. বায়ু সর্বদা উচ্চ চাপ থেকে নিম্ন চাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়।
৫. উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ু অপেক্ষা বেশী জলীয় বাষ্প ধারণ করে। তাই উষ্ণ বায়ু হঠাৎ শীতল হলে বৃষ্টি হয়।
৬. ধূলিকণাপূর্ণ বায়ুর তাপধারণ ক্ষমতা বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা অনেক বেশী।

পাঠসংক্ষেপ

পৃথিবীর চারপাশে বেষ্টন করে হাজার হাজার কিলোমিটার যে পুরু বায়ুর সমুদ্র রয়েছে তাকে বায়ুমন্ডল বলে। এটি পৃথিবীর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষন শক্তির আকর্ষণে বায়ুমন্ডল পৃথিবীর সাথে লেগে আছে। বায়ুমন্ডল বিভিন্ন উপাদান দিয়ে গঠিত, এগুলোর পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রারও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ফলে বায়ুমন্ডলের উপর পৃথিবীর পরিবেশ বহুলাংশে নির্ভরশীল। এ কারণে মানুষেরই অস্থিত্বের জন্য বায়ুমন্ডলের গভীরতা, বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা অতীব গুরুত্বপূর্ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১.১. সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিকে শোষন করে কোন স্তর?
ক) নাইট্রোজেন স্তর খ) ওজন স্তর গ) জলবায়ু স্তর

১.২. বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বাড়লে কি হতে পারে?
ক) নতুন প্রাণীর জন্ম হবে খ) বন্যা, জলোচ্ছ্বাস বাড়বে গ) ভূমিকম্প হবে

১.৩. বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কত?
ক) ০.২ শতাংশ খ) ০.০০৩ শতাংশ গ) ০.৮০ শতাংশ

১.৪. ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে প্রথম স্তর কোনটি?
ক) স্ট্রাটোমন্ডল খ) মেসোমন্ডল গ) ট্রপোমন্ডল

উত্তর ঃ ১.১। খ) ১.২। খ) ১.৩। খ) ১.৪। গ)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলীঃ

১. কার্বন ডাই অক্সাইডের বৃদ্ধির ফলে কি ঘটে?
২. বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কত শতাংশ?
৩. জলীয় বাষ্পের প্রভাব কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বায়ুমন্ডলের গুরুত্ব ও উপাদান বর্ণনা করুন?
২. বায়ুমন্ডলের প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৮.২ ঃ বায়ুমন্ডলীয় স্তর

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বায়ুমন্ডলের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- বায়ুমন্ডলের স্তরগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

আগের পাঠে বায়ুমন্ডলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্পর্কে জানলেন। এবার এই পাঠে বায়ুমন্ডলের স্তরগুলো এবং তাদের দৈর্ঘ্য, উপাদান এবং অন্যান্য বিষয় গুরুত্বসহকারে জানতে পারবেন। তবে তার আগে বায়ুমন্ডলের উৎপত্তি সম্পর্কে একটু ধারণা নেয়া যাক।

বায়ুমন্ডলের উৎপত্তি (Origin of Atmosphere)

পৃথিবীর বায়ুমন্ডল একদিনে অকস্মাৎ সৃষ্টি হয়নি। এর সৃষ্টির ইতিহাস পৃথিবীর উৎপত্তির সাথে জড়িত। একটি মতবাদে ধারণা করা হয় পৃথিবী সৃষ্টির আদি পর্যায়ে অতি উত্তপ্ত ম্যাগমা থেকে পূর্বের দ্রবিভূত কার্বনডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, এবং জলীয়বাষ্প ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। এ সমস্ত গ্যাস একটি বায়ুমন্ডল গঠণ করে। সম্ভবত সে সময়কার বায়ুমন্ডলের গঠন বর্তমান আগ্নেয়গিরি থেকে বের হয়ে আসা গ্যাসীয় উপাদানের মত ছিল (Cole 1975) ।

৬০-৭০% জলীয়বাষ্প;

১০-১৫% কার্বনডাই-অক্সাইড;

৮-১০% নাইট্রোজেন এবং বাকী অংশ সালফার যৌগ।

পৃথিবী ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে থাকে এবং জলীয় বাষ্প থেকে মেঘের সৃষ্টি করে। এ মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় কিন্তু তা উর্ধ্ব বায়ুমন্ডলেই থেকে যায়। কারণ বৃষ্টির ফোঁটা উত্তপ্ত পৃথিবীতে পৌঁছবার পূর্বেই তা আবার বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং দীর্ঘ সময়ব্যাপী এই ধারা চলতে থাকে। ফলে ঘন মেঘের সৃষ্টি হয় যা পৃথিবীকে হাজার হাজার বছর ঢেকে রাখে। অবশেষে পৃথিবী যখন যথেষ্ঠ ঠান্ডা হয় তখন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি শুরু হয় এবং তা প্রায় ৪০,০০০ বছর স্থায়ী হয় বলে অনুমান করা হয়। এ বৃষ্টিপাতই বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড পৃথিবীতে নিয়ে আসে।

অক্সিজেন সম্ভবত সবশেষে বায়ুমন্ডলে যোগ দিয়েছে। একটি মতবাদ অনুযায়ী জলীয়বাষ্প যখন পরিচলন প্রক্রিয়ায় উর্ধ্ব বায়ুমন্ডলে পৌঁছে তখন সূর্যের বেগুনি রশ্মি পানির অনু ভেঙে দেয়। ফলে এ অক্সিজেন ও হাইড্রাজেন পরমাণুতে পরিণত হয়। হাইড্রজেন পরমাণু বায়ুমন্ডল ত্যাগ করে এবং অক্সিজেন পরমাণু সমূহ অক্সিজেন অনু গঠণ করে। বিজ্ঞানীদের ধারণা গত ২০০ কোটি বছর বায়ুমন্ডলের তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। শুধুমাত্র অক্সিজেনের মাত্রা ধীরে ধীরে কিছুটা বেড়েছে।

বায়ুমন্ডলীয় স্তর (Atmospheric Layers)

বায়ুমন্ডলের গঠনকারী উপাদানের বৈশিষ্ট্যের (যেমন- চাপ, ঘনত্ব, উষ্ণতা) ভিত্তিতে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে একে চারটি স্তরে ভাগ করা যায়। যথা- ট্রপোমন্ডল, ষ্ট্রাটোমন্ডল, মেসোমন্ডল ও তাপমন্ডল)।

চিত্র ৮.২.১ ঃ বায়ুমন্ডলীয় স্তর (উচ্চতার সাথে বায়ুমন্ডলের তাপ ও চাপের পরিবর্তন)

ট্রপোমন্ডল (Troposhere) ঃ এটি বায়ুমন্ডলের সর্বনিম্ন স্তর। ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন হওয়ার এ স্তর জীবজগতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ স্তরের গভীরতা মেরু এলাকায় প্রায় ৮ কি.মি. এবং নিরক্ষীয় এলাকায় ১৬ থেকে ১৯ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি ১.৫ কি.মি. থেকে ২ কি.মি. উচ্চতায় ভূমির বন্ধুরতার জন্য বায়ু সঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে এ অংশে বায়ু খুব উপরে উঠানামা করে। এ স্তরের জলীয়বাষ্প এবং ধুলিকণা অশান্ত বায়ুর সাথে মিশ্রিত হয়ে মেঘ, ঝড় প্রভৃতির সৃষ্টি করে ও আবহাওয়ার বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটায়। ঝড় ও আবহাওয়ায় পরিবর্তন ট্রপোমন্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। নিম্নবায়ুমন্ডলের নীচ থেকে ওপরের দিকে তাপমাত্রা ক্রমাগত হ্রাস পায়। উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে বায়ুমন্ডলের এ উষ্ণতা হ্রাসের হার প্রতি কি.মি.-এ ৬.৫° সেলসিয়াস। একে স্বাভাবিক তাপ হ্রাস হার (Normal laps rate) বলে। বায়ুমন্ডলের এ তাপহ্রাস বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র ট্রপোমন্ডলেই ঘটে। এ স্তরের উপরে তাপহ্রাস হার শূন্য বা ঋনাত্মক। ট্রপোমন্ডলে বায়ুর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী। এর উপরের স্তরসমূহে ঘনত্ব কমতে থাকে।

ট্রপোমন্ডলের সীমা কত? এই স্তরের বৈশিষ্ট্য বলুন?

স্ট্রাটোমন্ডল (Stratosphere) ঃ স্ট্রাটোমন্ডল দ্বিতীয় বায়ুমন্ডলীয় স্তর যা ওপরের দিকে প্রায় ৫০ কি. মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এ স্তরে ২০ কি. মি. উচ্চতা পর্যন্ত তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন হয় না। এর পর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং স্ট্রাটোবিরতী (প্রায় ৫০ কি. মি.) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বায়ুমন্ডলীয় ওজন গ্যাসের বেশীরভাগ এ স্তরেই অবস্থিত। ওজন গ্যাস সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মি শোষণ করার কারণেই স্ট্রাটোমন্ডলে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। এ স্তরেও বায়ুর ঘনত্ব ও চাপ উভয়ই কম। স্ট্রাটোমন্ডলে জলীয়বাষ্প নেই। স্ট্রাটোবিরতি এ স্তরের শেষ নির্ধারণ করে।

মেসোমন্ডল (Mesosphere) ঃ স্ট্রাটোবিরতির ওপরের স্তর থেকে মেসোমন্ডল শুরু। এ স্তর ওপরের দিকে প্রায় ৮০ কি. মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। মেসোমন্ডলের শুরু থেকেই উষ্ণতা হ্রাস পেতে থাকে এবং মেসোবিরতিতে প্রায় ৯০° সেলসিয়াসে নেমে আসে। এ স্তরে বায়ুর চাপ অত্যন্ত ক্ষীণ যা ৫০ কিলোমিটারে ১ মিলিবার থেকে ৯০ কিলোমিটারে ০.০১ মিলিবারে দাঁড়ায়। মেসোমন্ডলের শেষ সীমা মেসোবিরতি।

মেসোবিরতি, স্ট্রাটোবিরতি, বেগুনীরশ্মি

তাপমন্ডল (Termosphere) ঃ মেসোবিরতির ওপরের স্তরকে তাপমন্ডল বলে। এ স্তরের ওপরের সীমানা অনির্ধারিত। তাপমন্ডলের ১০০ কি. মি. থেকে ৩০০ কি. মি. উচ্চতায় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণু অত্যন্ত খাটো তরঙ্গ মাপের

সৌরশক্তি শোষণ করায় উষ্ণতা প্রায় ১০০০°c পর্যন্ত বাড়তে পারে। এই স্তরে অক্সিজেন অনুগুলো ভেঙে বিদ্যুৎ যুক্ত কণায় পরিণত হয়। বিদ্যুৎযুক্ত কণাকে আয়ন (Ion) বলে। তাপমন্ডলে এ আয়নিত অংশ আয়নমন্ডল (1nosphere) নামে পরিচিত। আয়নমন্ডল মূলত মেসোমন্ডলের উর্ধাংশ থেকে তাপমন্ডলের নিম্নাংশ (৫০-১০০ কি. মি পর্যন্ত) পর্যন্ত সম্প্রসারিত।

আয়নমন্ডলে পৃথিবীর চুম্বকীয় আকর্ষণের টানে বিদ্যুৎযুক্ত কণা জড়ো হয়ে উভয় গোলার্ধে মেরু আলো (Auroras) সৃষ্টি করে। উত্তর গোলার্ধের মেরু আলো মেরু বোরিয়ালিস (Aurora Borealis) এবং দক্ষিন গোলার্ধে মেরু আলো মেরু অষ্ট্রালিস নামে পরিচিত। উত্তর গোলার্ধে এর প্রভাবে রাতের আকাশে আলোর বর্ণালী বা আলোক প্রভা দেখা যায়।

আয়নমন্ডলের ওপরের অংশ এক্সোস্ফিয়ার ও চুম্বকীয়মন্ডল নামে দুটি স্তরে বিভক্ত। এক্সোস্ফিয়ার প্রধানত অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম পরমাণু দ্বারা গঠিত। এটি প্রায় ৯০০ কি. মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে অনুর ঘনত্ব এত কম যে অনুসমূহের পারস্পরিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে না। এক্সোস্ফিয়ার বায়ুমন্ডলের বহি:সীমা নির্ধারণ করে। ধারণা করা হয় চুম্বকীয় মন্ডল আরও অনেকখানি বাইরের দিকে বিস্তৃত এবং বাইরের সীমানা চুম্বকীয়বিরতি নামে পরিচিত। চুম্বকীয়মন্ডল পৃথিবীর পরিবেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার সাধন করে থাকে। এটি পৃথিবীর আবাহওয়া মন্ডলকে সূর্য থেকে আগত অত্যন্ত শক্তিশালী বিদ্যুতায়িত বিকিরণ থেকে রক্ষা করে। এ বিদ্যুতায়িত বিকিরণ সৌর ঝড় (Solar Wind) হিসেবে (অত্যন্ত দ্রুত গতিতে) চুম্বকীয়মন্ডলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বর্হিঃবিভাগ দিয়ে পৃথিবী ছাড়িয়ে যায়। চুম্বকীয়মন্ডল না থাকলে সূর্যের এ বিদ্যুতায়িত বিকিরণে এ পৃথিবীর সমস্ত জীবজগৎ ধ্বংশ হয়ে যেত।

পাঠসংক্ষেপ

পৃথিবীর বায়ুমন্ডল হঠাৎ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এর ইতিহাস পৃথিবীর উৎপত্তির সাথে জড়িত। পৃথিবী সৃষ্টির আদি পর্যায়ে উত্তপ্ত ম্যাগমা থেকে পূর্বের দ্রবিভূত কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন এবং জলীয়বাস্প ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। পৃথিবী ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে থাকে এবং বায়ুমন্ডলীয় বিভিন্ন স্তর গঠিত হতে থাকে। বায়ুমন্ডলীয় বিভিন্ন স্তরগুলির চাপ ও তাপমাত্রা এক নয় এবং নির্দিষ্টও নয়। বায়ুমন্ডলীয় স্তরগুলির চাপ ও তাপের পরিবর্তন ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১.১. আয়তনের দিক থেকে বায়ুর গঠন উপাদানে নাইট্রজেনের পরেই-
ক) আরগন খ) CO_2 গ) O_2 ঘ) O_3 এর স্থান

১.২. ট্রপোমন্ডলে তাপহ্রাস হার প্রতি কিলোমিটারে কত ?
ক) ৩.৫° সে. খ) ৪.৫° সে. গ) ৫.৫° সে. ঘ) ৬.৫° সে.

১.৩. সমূদ্র সমতলে গড় বায়ুচাপ কত মিলিবার?
ক) ৫০০ খ) ৭০০ গ) ৮০০ ঘ) ১০০০ এর বেশী

উত্তর ঃ ১.১. গ   ১.২. ঘ   ১.৩. ঘ

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন

২.১. বিজ্ঞানীদের ধারণা, গত ______________ কোটি বছরে বায়ুমন্ডলের তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি।

২.২. ট্রপোমন্ডলের গভীরতা মেরু এলাকায় প্রায় ___________ কি.মি. এবং নিরক্ষীয় এলাকায় ___________ থেকে ______________ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত।

২.৩. আয়নমন্ডলে পৃথিবীর চুম্বকীয় আকর্ষন টানে বিদ্যুৎযুক্ত কণা জড়ো হয়ে উভয় গোলার্ধে ___________ সৃষ্টি করে।

উত্তর ঃ ২.১. ২০০   ২.২. ৮ কি.মি.   ১৬ থেকে ১৯ কি.মি.   ২.৩. মেরুআলো

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. বায়ু মন্ডলের স্তরগুলি কি কি?
২. স্বাভাবিক তাপহ্রাস হার (Normal lapse rate) কি?
৩. ষ্ট্র্যাটোমন্ডলের উষ্ণতা কেন বৃদ্ধি পায়?
৪. মেসোমন্ডলের শেষসীমা কি?
৫. আয়ন (Ion) কাকে বলে?
৬. উত্তর ও দক্ষিন গোলার্ধে মেরুআলো কি কি নামে পরিচিত?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বায়ুমন্ডলের উৎপত্তি ও স্তরবিন্যাস বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৮.৩ ঃ বায়ুমন্ডলীয় চাপ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বায়ুচাপ কি বলতে পারবেন;
- বায়ুচাপের সাথে উচ্চতার কি সম্পর্ক বলতে পারবেন;
- বায়ুর চাপ বলয়সমূহ সম্পর্কে ধারনা পাবেন;
- কিভাবে বায়ুচাপ পরিমাপ করা যায় তা বলতে পারবেন।

বায়ুচাপ কি?

গ্যাসীয় অনু কঠিন বা তরল পদার্থের অনুর মত সংঘবদ্ধ বা অবিচল নয়। গ্যাসীয় অনুসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে ছোটাছুটি করে এবং মুক্ত চলাচল করতে পারে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পৃষ্ঠস্থ বায়ু ভূ-ত্বকের সাথে লেগে থাকে। এই আকর্ষণের ফলে গ্যাস মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে না। অর্থাৎ বায়ু নিম্নে সমুদ্র বা স্থলভাগ এবং উর্দ্ধে মহাকর্ষীয় বল দ্বারা পৃথিবীর উপরে আবদ্ধ অবস্থায় আছে। বায়ুর চাপ হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠে প্রতি একক জায়গায় বায়ুর গ্যাসের অনুগুলোর সংঘর্ষের ফলে প্রদত্ত বল।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে গ্যাসীয় অনুর গতি বৃদ্ধি পায়। ফলে বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ চাপ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমানুপাতিক। আবার চাপ বৃদ্ধি পেলে আয়তন হ্রাস পায় অথবা ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় (ঘনত্ব = ১/আয়তন) ; অর্থাৎ চাপ ও ঘনত্ব সমানুপাতিক। সুতরাং সাধারণ আদর্শ গ্যাসের সূত্রানুযায়ী বলা যায়-

চাপ = তাপমাত্রা × ঘনত্ব গুনচিহ্ন ধ্রুবক

গ্যাসের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা মাপা হয় পরম (Absolute or kelvin) এককে। বায়ুর চাপ এর তাপমাত্রার পরিবর্তন ও ঘনত্বের উপর নির্ভর করে পরিবর্তীত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে আয়তন বৃদ্ধি পায় বলে চাপ কমে যেতে পারে। ফলে বায়ুর চাপ পরিমাপের জন্য ঘনত্বের মান বেশী মাত্রায় প্রভাব ফেলে। তাপমাত্রার বৃদ্ধির সাথে চাপের কি পরিবর্তন হবে তাও ঘনত্বের মান থেকেই জানা যায়।

বায়ুচাপের সাথে উচ্চতার সম্পর্ক কি ?

বায়ু প্রবাহ এর অনুর উপর বলের অসমতার সাথে সম্পর্কিত। উচ্চচাপ অঞ্চল হতে বায়ু নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। বায়ুচাপ অনুভূমিক (Horizontal) দিক অপেক্ষা উলম্বভাবে (Vertical) বেশী পরিবর্তীত হয়। সমুদ্র সমতলে বায়ুর চাপ ১০১৩ মিলিবার (১৪৭ পাউন্ড/বর্গইঞ্চি) এবং হিমালয় পর্বতের শিখরে (৮৮৪৮ মিঃ উচ্চতা) ৩২০ মিলিবার।

১ মিলিবার = ১০০ নিউটন/বর্গমিটার

১ নিউটন = ১ কিলোগ্রাম - মিটার/বর্গ সেকেন্ড

বায়ুর চাপ যেহেতু অনু সমূহের গতির উপর নির্ভর করে তাই ধরা যায় যে ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছিই অনুর বিচরণ সর্বাপেক্ষা বেশী। চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়-

চিত্র ৮.৩.১ ঃ বায়ুচাপের বন্টন বাতাসের ভর উচ্চতার সাথে সম্পর্ক যুক্ত। বায়ুর সিংহভাগই ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি বিন্যস্ত। বায়ুর চাপ ভরের উপর নির্ভরশী, যা উচ্চতার সাথে হ্রাস পায়। চিত্র ৮.৩.১ এ ৩৪ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুচাপের পরিবর্তন মাত্রা দেখানো হয়েছে। বায়ুচাপ প্রতি ২৭৫ মিটার (৯০০ ফুট) উচ্চতার ১/৩০ ভাগ হ্রাস পায়। তবে উচ্চতা বৃদ্ধিতে প্রথম দিকে চাপ দ্রুত হ্রাস পেলেও পরে এ হ্রাসের হার কমে যায়।

বায়ুর চাপ বলয়সমূহ

ভূ-পৃষ্ঠের কয়েকটি অংশে বায়ুর উচ্চচাপ এবং নিম্নচাপ বলয় আকারে ভূ-পৃষ্ঠকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করে আছে। একে বায়ু চাপ বলয় বলে। পৃথিবীতে প্রধানত ৭টি চাপ বলয় আছে। যথা–

(১) নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়;
(২ কর্কট ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়;
৩) মকর ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়;
৪) সুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়;
৫) কুমেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়;
৬) সুমেরুদেশীয় উচ্চচাপ বলয়;
৭) সুমেরুদেশীয় উচ্চচাপ বলয়।

বায়ু ওপরে নীচে এবং চারপাশে যে চাপ দেয় তাকে বায়ুচাপ বলে। ওপরের বায়ু নীচের বায়ুর ওপর চাপ দেয়। এ কারণে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে চাপ কমতে থাকে। আবার উষ্ণ এবং জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুর চাপ কম। যে বায়ুর চাপ বেশী তাকে উচ্চচাপ বায়ু এবং যে বায়ুর চাপ কম তাকে নিম্নচাপ বায়ু বলে।

১) নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়

নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য প্রায় সর্বদাই লম্বভাবে কিরন দেয়। তাই এখানের বায়ু উত্তপ্ত হয়ে উপরে উঠে যায় এবং একটি স্থায়ী নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি করেছে।

(২-৩) কর্কট ও মকর ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়

নিরক্ষীয় উষ্ণ, আর্দ্র ও হালকা বায়ু উপরে উঠে ক্রমশ প্রসারিত ও শীতল হয়ে ২৫°-৩৫° উত্তর ও দক্ষিন অক্ষাংশের ক্রান্তিবৃত্তে উপস্থিত হয়ে আংশিকভাবে নীচে নেমে আসে। বাকি বায়ু মেরু প্রদেশের দিকে প্রবাহিত হয়। আবার মেরুদ্বয়ে বায়ুর চাপ বেশী বলে ঐ স্থানের শীতল ও ঘন বায়ু ভূ-পৃষ্ঠ বেয়ে ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে আসতে থাকে। ফলে কর্কট ও মকর ক্রান্তীর নিকট দুই দিক হতে আগত শীতল ও ঘন বায়ুর মিলন হয়। ফলে দুই ক্রান্তীয় অঞ্চলে বায়ুচাপের আধিক্য ঘটে এবং উচ্চচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়।

(৪-৫) মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়

পৃথিবীর আবর্তনের জন্য সুমেরু ও কুমেরু বৃত্ত প্রদেশের এলাকা থেকে শীতল বায়ু বিক্ষিপ্ত হয়ে ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। তখন মেরুবৃত্ত প্রদেশে অর্থাৎ ৬০°-৭০° অক্ষাংশের মধ্যে বায়ুর চাপহ্রাস পেয়ে নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়।

(৬-৭) মেরুদেশীয় উচ্চ চাপ বলয়

উত্তর ও দক্ষিন উভয় মেরুতে অতিরিক্ত শীতের জন্য বায়ু সর্বদাই শীতল ও ভারী থাকে। এছাড়া সূর্যকিরণের অভাবে এই দুই অঞ্চলের বায়ুতে জলীয়বাষ্প কম থাকে। ফলে দুই মেরুতে বায়ুর চাপ উচ্চ হয়। আবার নিরক্ষীয় অঞ্চলের কিছু বায়ু বায়ুর উর্ধ্বস্তর দিয়ে এই দুই অঞ্চলে নেমে আসে। মেরুর আয়তন কম হওয়ায় এরূপ বায়ুর আধিক্য সেখানে বায়ুর চাপ আরও বৃদ্ধি করে। এসব কারণেই মেরুদ্বয়ে উচ্চচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়।

চাপ বলয়ের স্থান পরিবর্তন

সূর্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিনায়নের সঙ্গে সঙ্গে চাপ বলয়গুলি যথাক্রমে উত্তরে ও দক্ষিনে ৫°-১০° সরে অবস্থান করে।

বায়ুরচাপ পরিমাপ (Measuring Air Pressure)

বায়ু চাপ পরিমাপের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় ব্যারোমিটার (Barometer)। দুই ধরণের ব্যারোমিটার ব্যবহৃত হয়। যদিও দ্বিতীয় ধরণের ব্যারোমিটার প্রথম ধরণের ব্যারোমিটারেরই সংস্করণ।

১। পরদ ব্যারোমিটার (Mercurial Barometer)

২। তরলহীন ব্যারোমিটার (Aneroid Barometer)

পৃথিবীর বায়ু চাপ বন্টন

(Global distribution of wind pressure)

সমচাপীয় (Isobaric) রেখা থেকে প্রতীয়মান হয় যে পৃথিবীর বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে অর্থাৎ নিরক্ষীয় অঞ্চলে বায়ুচাপ স্বাভাবিক বায়ুচাপের চেয়ে কম। স্বাভাবিক বায়ুচাপ ভূ-পষ্ঠে ১০১৩ মিলিবার ধরা হয়। এক্ষেত্রে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলে চাপের মান মাত্র ১০১১ থেকে ১০০৮ মিলিবার। এই নিম্নচাপ অঞ্চলকে (চিত্র ৯.৩.১) নিরক্ষীয় ফাঁদ (Equatorial Trough) বলে।

চিত্র ৮.৩.১ ঃ পৃথিবীর বায়ুচাপ বন্টন

৩০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে বায়ুচাপ উচ্চ মাত্রার যার মান ১০২০ মিলিবার। এই উচ্চচাপীয় অঞ্চলকে উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ অঞ্চল (Sub tropical high pressure বলে। দক্ষিণ গোলার্ধে এই উচ্চচাপের কেন্দ্র রয়েছে যাকে উচ্চচাপ সেল (High pressure cell) বলে।

দক্ষিণ গোলার্ধে উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়ের দক্ষিণে আর্কটিক (Arctic) বলয় পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অঞ্চল রয়েছে যাকে উপমেরুদেশীয় নিম্নচাপ বলয় (Sub-arctic low pressure belt) বলে। এটি ৬৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ বরাবর অবস্থিত।

এখানকার চাপ প্রায় ৯৮৪ মিলিবার। মেরু অঞ্চলে সব সময়ই বায়ু উচ্চচাপে থাকে এই অঞ্চলকে বলে মেরুদেশীয় উচ্চচাপ অঞ্চল।

উত্তর গোলার্ধের চাপকেন্দ্র (Northern hemisphere pressure center)

স্থল ও জলভাগের অবস্থান বায়ু চাপের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। উত্তর গোলার্ধের বিশাল ভূ-ভাগ যেমন উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়ার মত বিশাল ভূ-ভাগ। আবার বিশাল জলরাশি যেমন- উত্তর আটলান্টিক ও উত্তর গোলার্ধের বায়ুচাপের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। এর ফলে দক্ষিণ গোলার্ধের চাপ বলয়ের চেয়ে উত্তর গোলার্ধে ভিন্নধরণের চাপীয় অবস্থা দেখা যায়।

শীতকালে উত্তর গোলার্ধের বিশাল ভূ-খন্ডে উচ্চচাপ কেন্দ্র গঠিত হয়। অন্যদিকে সমুদ্র তুলনামূলকভাবে উষ্ণ থাকায় নিম্নচাপ কেন্দ্র গঠিত হয়। উদাহরণ: উত্তর মধ্য এশিয়ার সাইবেরীয় উচ্চচাপ বলয়ে দেখা যায়। এখানে ১০৩০ মিলিবার পর্যন্ত বায়ুচাপ হয়। উত্তর আমেরিকায় অপেক্ষাকৃত কম উচ্চচাপ সমৃদ্ধ কানাডিয়ান উচ্চচাপ লক্ষ্য করা যায়। সমুদ্রে অ্যালিউসিয়ান নিম্নচাপ এবং আইসল্যান্ড নিম্নচাপ অঞ্চলসমূহে শীতকালে ঝড়ো হাওয়া বিরাজ করে।

> শীতকালে উত্তর গোলার্ধে ভূ-খন্ড ও জলরাশি ভেদে বায়ু চাপের কি তারতম্য হয়?

গ্রীষ্মকালে বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। সমুদ্রভাগে উচ্চচাপ ও জলভাগে নিম্নচাপ বিরাজ করে। এশিয়াতে নিম্নচাপ অপেক্ষাকৃত তীব্র হয়। আফগানিস্থানকে ঘিরে এই নিম্নচাপ আবর্তিত হয়। অন্যদিকে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে দুটি ভিন্ন উচ্চচাপ কেন্দ্র তৈরী হয়। এগুলো তাদের শীতকালীন অবস্থান থেকে উত্তরে সরে যায় এবং প্রসারিত হয়। এগুলো এ্যাজোরখ উচ্চচাপ বা বারমুড়া উচ্চচাপ বা হাওয়াইন উচ্চচাপ নামে পরিচিত।

> গ্রীষ্মকালে উত্তর গোলার্ধে ভূ-খণ্ড ও জলরাশি ভেদে বায়ু চাপের কি তারতম্য হয়?

> **পাঠসংক্ষেপ**
>
> বায়ুমন্ডলীয় চাপ বলতে ওপরের বায়ুর ওজনকে বুঝায়। এটা দীর্ঘ সময় ব্যাপী এক থাকে না। উচ্চতা ভেদে এর তারতম্য ঘটে। আমরা যদিও অনুভব করিনা তবুও বায়ুমন্ডল সর্বদাই চাপ দিচ্ছে। বায়ুচাপ পরিমাপক যন্ত্রের নাম ব্যারোমিটার। এই বায়ুচাপের কারণে, ভূ-পৃষ্ঠের কয়েকটি অংশে উচ্চচাপ এবং নিম্নচাপ বলয় আকারে ভূ-পৃষ্ঠকে পূর্ব পশ্চিমে বেষ্টন করে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১.১. বায়ুচাপ অনুভূত হয়–
ক) উপরে খ) নীচে গ) চারদিকে ঘ) কোনটা নয়

১.২. নিরক্ষীয় অঞ্চলে বায়ুচাপ–
ক) কম খ) বেশী গ) স্বাভাবিক ঘ) কোনটা নয়

১.৩. ভূ-পৃষ্ঠে বায়ুচাপ কত মিলিবার?
ক) ১০০০ খ) ১০১২ গ) ১০১৩ ঘ) ৯০০

১.৪. কোথায় সর্বদা বায়ুচাপ উচ্চ থাকে?

ক) সমুদ্রপৃষ্ঠে খ) স্থলভাগে গ) মেরুদেশীয় অঞ্চলে ঘ) নিরক্ষরেখায়

উত্তর ঃ ১.১ গ ১.২ ক ১.৩ গ ১.৪ গ

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

২.১ স্থল ও জলভাগের অবস্থান ______________ ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে।

২.২ শীতকালে উত্তর গোলার্ধের বিশাল ভূ-খন্ডে _________________ কেন্দ্র গঠিত হয়।

২.৩ গ্রীষ্মকালে সমুদ্রভাগে __________________ জলভাগে ______________________ বিরাজ করে।

উত্তর ঃ ২.১ বায়ুচাপের ২.২ উচ্চচাপ ২.৩ উচ্চচাপ, নিম্নচাপ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বায়ুচাপ কাকে বলে?
২. নিরক্ষীয় অঞ্চলে বায়ুচাপ কেমন?
৩. নিরক্ষীয় ফাঁদ কাকে বলে?
৪. বায়ুর চাপ বলয়গুলো কি কি?
৫. ব্যারোমিটার কি?
৬. ৩০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে বায়ুচাপ কত মিলিবার?
৭. উপমেরুদেশীয় নিম্নচাপ বলয় কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পৃথিবীর বায়ুচাপ বন্টন বর্ণনা করুন।

ইউনিট ৯
জলবায়ু

পাঠ ৯.১ ঃ আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামক (Components of Weather and Climate)

এই পাঠ শেষে আপনি—

- আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামকগুলো কি তা বলতে পারবেন;
- নিয়ামকগুলো কিভাবে আবহাওয়া ও জলবায়ুতে কি প্রভাব ফেলে সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন; এবং
- বায়ুর উচ্চচাপ ও নিম্নচাপসমূহ কিভাবে জলবায়ুর ক্রমাবর্তনে সহায়তা করে সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

আবহাওয়ার উপাদানসমূহ অনেকগুলো ভূ-প্রাকৃতিক নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. অক্ষাংশ বা সূর্যালোকের আপাতন ও দিবা ভাগের দৈর্ঘ্য
২. উচ্চতা
৩. সমুদ্র থেকে দূরত্ব
৪. স্থলভাগ ও জলভাগের অবস্থান
৫. সমুদ্রস্রোত
৬. ভূমির ঢাল
৭. ভূ-প্রকৃতি
৮. বায়ুপ্রবাহ
৯. বনভূমির অবস্থান
১০. বায়ুর চাপ

এসব নিয়ামক সর্বত্র সমানভাবে কাজ করে না। বরং স্থানভেদে বিভিন্ন নিয়ামকের সংমিশ্রণে একটি স্থানের আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। নিম্নে নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'ল।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামকগুলো কি কি?

অক্ষাংশ (Latitude)

সূর্যের কিরণমাত্রা অক্ষাংশ ভেদে বিভিন্ন রকম হয়। যেমন, নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়, ফলে অল্প স্থানে সূর্যালোক পতিত হয় বলে বায়ু সহজেই উত্তপ্ত হয়। তাছাড়া লম্বভাবে পতিত হওয়ায় সূর্যালোক স্বল্প দূরত্ব অতিক্রম করে, ফলে পথে শোষিত বা প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলক ভাবে কম থাকে। অপরদিকে উচ্চ অক্ষাংশে সূর্য তীর্যকভাবে কিরণ দেয়, ফলে বায়ুর তাপমাত্রা কম। অক্ষাংশ ভেদে সূর্যরশ্মির এ পতন বৈশিষ্ট্য চিত্র ৯.১.১ এর সাহায্যে দেখানো হল। চিত্রে লক্ষ করলে দেখা যাবে মেরু এলাকায় পতিত রশ্মি অনেকখানি কৌণিকভাবে পতিত হওয়ায় আলোকরশ্মি বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে এবং কম বায়ুস্তর ভেদ করে আসছে। সেই তুলনায়, নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যরশ্মি খাড়াভাবে পতিত হওয়ায় স্বল্প স্থান জুড়ে কিরণ দেয় এবং দূরত্বও কম।

চিত্র ৯.১.১ ঃ সূর্যরশ্মির আপতনে অক্ষাংশের প্রভাব

উচ্চতা (Altitude)

কোন এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চ হলে তা ঐ এলাকায় তাপ, চাপ ও আর্দ্রতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। চিত্র ৯.১.২ এ উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে উষ্ণতার সম্পর্ক দেখানো হলো। উষ্ণতা হ্রাসের হার প্রতি হাজার মিটারে ৬° সেলসিয়াস। এ উচ্চতার পার্থক্যের কারণে দুই জায়গা একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও একটি অপরটির চেয়ে ভিন্ন জলবায়ু সম্পন্ন হয়। যেমন, দিনাজপুর ও শিলং একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও শিলং এর উচ্চতা বেশি হওয়ায় তা দিনাজপুরের চেয়ে অনেক বেশি বৃষ্টিবহুল ও ঠান্ডা।

চিত্র ৯.১.২ ঃ উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উচ্চতার প্রভাব

সমুদ্র থেকে দূরত্ব (Distance from Sea)

জলভাগের অবস্থান কোন এলাকার জলবায়ুকে মৃদুভাবাপন্ন করে। যেমন, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এখানকার জলবায়ু রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর বা জামালপুরের তুলনায় বেশ মৃদুভাবাপন্ন। সমুদ্র নিকটবর্তী এলাকায় শীত-গ্রীষ্ম এবং দিনরাত্রির তাপমাত্রার তেমন পার্থক্য হয় না। এ ধরণের জলবায়ুকে সমভাবাপন্ন জলবায়ু বলে। সমুদ্র উপকূল থেকে দূরে অবস্থিত রাজশাহী কিংবা বগুড়ায় শীত-গ্রীষ্ম উভয়ই চরম হয়। চিত্র ৯.১.৩ এ সমুদ্র ও ভূমির উষ্ণতার পার্থক্যের প্রভাব দেখানো হয়েছে। স্থলভাগের তুলনায় জলভাগ অনেক ধীরে উত্তপ্ত হয়। কারণ, প্রথমত, পানির আপেক্ষিক তাপ ধারণ ক্ষমতা বেশি। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত হতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তার সমপরিমাণ মাটি উত্তপ্ত হতে এর চেয়ে কম তাপের প্রয়োজন হয়।

চিত্র ৯.১.৩ ঃ বায়ুর উষ্ণতার ক্ষেত্রে সমুদ্র থেকে দূরত্বের প্রভাব

দ্বিতীয়তঃ সৌরতাপ ভূমির চেয়ে সমুদ্রের অনেক গভীরে প্রবেশ করায় তাপ বিস্তৃত জায়গায় ছড়ায়। ফলে, সমুদ্র উত্তপ্ত হতে অনেক সময় লাগে। আবার, সমুদ্র ভূমির তুলনায় আস্তে আস্তে পুনঃবিকিরণের মাধ্যমে তাপমাত্রা হারায়, তাই ঠান্ডা হতেও অনেক সময় নেয়। মোটকথা, ভূমির ন্যায় সমুদ্রের তাপমাত্রার দ্রুত পরিবর্তন হয় না। তাই, গ্রীষ্মকালে উপকুলীয় এলাকা ভূ-ভাগের অভ্যন্তর এলাকার তুলনায় শীতল এবং শীতকালে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে।

জলবায়ুর উপর সমুদ্র দূরত্বের ভূমিকা কি?

বায়ুপ্রবাহ (Wind How)

বায়ুপ্রবাহ কোন জায়গায় জলবায়ুর উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন, ভূ-ভাগ থেকে প্রবাহিত নিয়ত বায়ুপ্রবাহের কারণে উচ্চ-অক্ষাংশে শীতকালীন তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, সমুদ্র থেকে প্রবাহিত নিয়ত বায়ু শীতকালীন তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা কমায়। তাছাড়া, জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু কোন এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলে সে এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। যেমন, বাংলাদেশে বর্ষাকালে সামুদ্রিক মৌসুমী বায়ুর কারণে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অপরদিকে, শীতকালে মহাদেশীয় বায়ুর কারণে তেমন বৃষ্টিপাত হয় না এবং তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

সমুদ্রস্রোত (Ocean Currents)

সমুদ্রস্রোত জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। কারণ, এটি বায়ুর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে, শীতল ও উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে উপকূল সংলগ্ন এলাকার বায়ু শীতল বা উষ্ণ হয়।

চিত্র ৯.১.৪ ঃ আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সমুদ্রস্রোতের প্রভাব

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় শীতকালে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে পশ্চিম ইউরোপীয় উপকূলবর্তী এলাকার উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, শীতল ল্যাব্রাডর স্রোত উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলকে শীতল রাখে। শীতল ল্যাব্রাডর স্রোত ও উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম ইউরোপীয় উপকূলের তাপমাত্রায় ব্যাপক তারতম্য বিদ্যমান। একই অক্ষাংশে অবস্থিত কানাডার নাইনে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ২১° সেলসিয়াসের নিচে অথচ স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরের তাপমাত্রা হিমাঙ্গের ৩.৯° সেলসিয়াসের ওপরে থাকে।

ভূমির ঢাল (Slope of land)

কোনো এলাকার ভূমি ঢালের অবস্থান সূর্যালোক প্রাপ্তিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। যেমন, উত্তর গোলার্ধে কর্কটক্রান্তির উত্তরে দক্ষিণমুখী ঢাল সব সময় দ্বিপ্রহরের সূর্যালোক পায়। অপরদিকে দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তির দক্ষিণে উত্তরমুখী ঢাল সব সময় দ্বিপ্রহরের সূর্যালোক পায়। নিরক্ষরেখা এবং কর্কটক্রান্তির মাঝে দক্ষিণমুখী ঢাল বিশিষ্ট এলাকাসমূহ উত্তরমুখী এলাকার চেয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী সূর্যালোক পায়।

চিত্র ৯.১.৫ ঃ আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে ভূমির ঢালের প্রভাব

সূর্যালোক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভূমির ঢালের অবস্থানের বিষয়টি চিত্র ৯.১.৫-এ দেখানো হয়েছে। উত্তর গোলার্ধের একটি পাহাড়ী এলাকায় সূর্যালোক প্রাপ্তির সুবিধার জন্য সমস্ত ঘরবাড়ী দক্ষিণমুখী ঢালের পাদদেশে গড়ে উঠেছে।

ভূ-প্রকৃতি (Physiography)

উচ্চ পার্বত্য এলাকায় বায়ুপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হলে তার প্রভাব জলবায়ুর ওপর পরিলক্ষিত হয়। যেমন, হিমালয় পর্বতের অবস্থানের কারণে দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ু মৌসুমী বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয়। গ্রীষ্মকালে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু হিমালয় পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় বাংলাদেশ, ভারত, নেপালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু এ বায়ু হিমালয় অতিক্রম করতে না পারায় উত্তর ঢালে এ সময় বৃষ্টিপাত তেমন হয় না বললেই চলে। আবার শীতকালে শীতল সাইবেরীয় বায়ু উচ্চ হিমালয় পর্বত অতিক্রম করতে না পারায় উত্তর ঢালে এ সময় বৃষ্টিপাত তেমন হয় না বললেই চলে দক্ষিণে ইউরোপের চেয়ে শীতের তীব্রতা অনেক কম (চিত্র ৯.১.৬)।

শীতল সাইবেরীয় বায়ুর প্রভাবে হিমালয়ের উত্তরাংশের চীন ভূ-খন্ডে উষ্ণতা -১০° সেলসিয়াস থেকে -৫° সেলসিয়াস এবং এর দক্ষিণে ভারতীয় উপমহাদেশে ২০° সেলসিয়াস থেকে ২৫° সেলসিয়াস। হিমালয় পর্বতের অবস্থানই এ তাপমাত্রার পার্থক্যের জন্য দায়ী।

চিত্র ৯.১.৬ ঃ আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব

হিমালয় পর্বতমালা কিভাবে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে?

বনভূমির অবস্থান

গাছপালা বাষ্পীভবন-প্রস্বেদনের (Evapo-transpiration) সাহায্যে বায়ু জলীয়বাষ্পপূর্ণ হয় এবং ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং স্থানীয় আবহাওয়া শীতল রাখে। তাছাড়া, বনভূমি, ঝড়-তুফান, সাইক্লোন এর গতিপথে বাধা দিয়ে এর শক্তি কমিয়ে দেয়। ভূ-আচ্ছাদন বিহীন এলাকা দিনের সূর্যতাপে দ্রুত উত্তপ্ত হয় এবং তাপ বিকিরণের কারণে আবার দ্রুত শীতল হয়ে যায়। মরুময় এলাকায় এ ধরণের অবস্থা হয়।

স্থলভাগ ও জলভাগের অবস্থান (Location Land and Waterbodies)

ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ৭১ শতাংশ জলভাগ এবং বাকী ২৯ শতাংশ স্থলভাগ দ্বারা গঠিত। জল ও স্থলভাগের এ অসম বন্টন ও এদের ভৌত গুণাবলীর বিভিন্নতা আবহাওয়ার উপাদানগত তারতম্যে প্রভাব বিস্তার করে।

ক) জলের চেয়ে স্থলের আপেক্ষিক তাপ (Specific heat) কম হওয়ায় স্থলভাগ, জলভাগের তুলনায় দ্রুত উত্তপ্ত ও শীতল হয়।

খ) জলভাগের প্রধান অংশ সমুদ্র। সমুদ্রের পানি স্রোতে জোয়ার-ভাঁটা এবং ঢেউ এর মাধ্যমে অনবরত স্থানান্তরিত হয়। ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উত্তাপ ও পুনঃবন্টিত হয়।

গ) জলভাগের ওপর আপতিত সূর্যরশ্মির ৭০-৯০ শতাংশই বাষ্পীভবন (Evaporation) এর কাজে ব্যবহৃত হয়। সেই তুলনায় স্থলভাগের ওপর আপতিত সূর্যরশ্মির ৫.৫ শতাংশ মাত্র বাষ্পীভবনের কাজে ব্যবহৃত হয়। বাকী অংশ ভূমি ও এর উপরস্থ বায়ুমন্ডলের উত্তাপের কাজে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে স্থলভাগ তুলনামূলকভাবে জলভাগের চেয়ে দ্রুত উত্তপ্ত হয়। তাছাড়া জলভাগের তুলনায় স্থলভাগে অধিকহারে সূর্যরশ্মির প্রতিফলনের (Reflectivity) কারণেও এর উপরস্থ বায়ু অপেক্ষাকৃত দ্রুত উত্তপ্ত হয়। জল ও স্থলভাগের এ সমস্ত ভৌত গুণাবলীর তারতম্যের কারণে জলভাগের আবহাওয়া স্থলভাগের তুলনায় মৃদুভাবাপন্ন। শীতকালে জলভাগের চেয়ে স্থলভাগ বেশি শীতল থাকে এবং গ্রীষ্মকালে স্থলভাগ বেশি গরম থাকে।

বায়ুর চাপ (Wind Pressure)

নিম্নচাপ বলয়ের উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ উচ্চচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় উচ্চচাপ বিশিষ্ট শীতল অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। আবার শীতল অঞ্চলের ঠান্ডা বায়ুপ্রবাহের কারণে নিম্নচাপ বিশিষ্ট উষ্ণ অঞ্চলের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। এভাবে তাপমাত্রা বন্টন ও জলবায়ুর ক্রমাবর্তন হয়।

পাঠসংক্ষেপ

বায়ুপ্রবাহ কোন জায়গার জলবায়ুর উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন, ভূ-ভাগ থেকে প্রবাহিত নিয়ত বায়ু প্রবাহের কারণে উচ্চ অক্ষাংশে শীতকালীন তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, সমূদ্র থেকে প্রবাহিত নিয়ত বায়ু শীতকালীন তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা কমায়। তাছাড়া, জলীয়বাস্পপূর্ণ বায়ু কোন এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলে সে এলাকায় প্রচুর বৃষ্টি হয়। যেমন, বাংলাদেশে বর্ষাকালে সামূদ্রিক মৌসুমী বায়ুর কারণে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অপরদিকে, শীতকালে মহাদেশীয় বায়ুর কারণে তেমন বৃষ্টিপাত হয় না এবং তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১.১ কোনটি জলবায়ুর উপাদান নয়–
ক) উচ্চতা খ) আর্দ্রতা গ) সমুদ্র স্রোত ঘ) বায়ুপ্রবাহ

১.২ জলবায়ুর নিয়ামক হিসাবে কাজ করে না–
ক) সমুদ্র সান্নিধ্য খ) অক্ষাংশ গ) দ্রাঘিমাংশ ঘ) উচ্চতা

১.৩ জলভাগের ওপর আপতিত সূর্যরশ্মির কত শতাংশ বাস্পীভবনে ব্যবহৃত হয়–
ক) ৭০-৯০ খ) ৫১-১০০ গ) ৫১-১১০ ঘ) ৪০-১১০

১.৪ সমগ্র বিশ্বে স্থলভাগ ও জলভাগের অনুপাত–
ক) ৭১ঃ২৯ খ) ৭৫ঃ২৫ গ) ২৯ঃ৭১ ঘ) ২৫ঃ৭১

১.৫ দ্রুত উত্তপ্ত ও শীতল হয়
ক) স্থলভাগ খ) জলভাগ গ) কঠিন পদার্থ ঘ) কোনটা নয়

উত্তরঃ ১.১। খ) আর্দ্রতা ১.২। গ) দ্রাঘিমাংশ ১.৩। ক) ৭০-৯০
১.৪। ক) ৭১:২৯ ১.৫। ক) স্থলভাগ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। আবহাওয়া নিয়ন্ত্রনকারী নিয়ামকগুলির কি কি।
২। জলবায়ুর উপর সমূদ্র দুরত্বের গুরুত্ব কি ?
৩। হিমালয় পর্বতমালা কিভাবে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে?
৪। গাছপালা কি করে বৃষ্টিপাত ঘটায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান ও নিয়ামক সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৯.২ ঃ সৌরশক্তি

এই পাঠ শেষে আপনি—

- সৌরশক্তি কি তা বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- বায়ুমন্ডলের উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া সমূহ সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- বায়ুমন্ডলে সৌরশক্তির শোষন ও বিকিরণ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

সৌরশক্তি (Insolation)

বিকিরিত সূর্য শক্তি যা কোন উন্মুক্ত তলে গৃহীত হয় তাকে সৌরশক্তি (Insolation) বলে। সূর্য থেকে তরঙ্গাকারে বিপুল শক্তি পৃথিবীতে আসে। সূর্যের বিকিরণের দুই বিলিয়ন ভাগের একভাগ শক্তি ভূ-পৃষ্ঠে আসতে পারে। সূর্য পৃষ্টের তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০° সেলসিয়াস। সৌরশক্তি প্রায় ১৫০ মিলিয়ন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পৃথিবীতে আসে। সূর্য রশ্মি লম্বভাবে পতন স্থানের পরিমাপকে বলা হয় সৌর ধ্রুব (Solar constant)।

বায়ুমন্ডলের উপরে এর মান প্রতি বর্গমিটারে ১৪০০ ওয়াট। কিন্তু বায়ুমন্ডল ভেদ করে আসার ফলে এর তীব্রতা হ্রাস পেয়ে সমুদ্র পৃষ্ঠে দাঁড়ায় প্রতি বর্গমিটারে ৪০০ থেকে ৮০০ ওয়াট। আপতিত রশ্মির এই বিপুল হ্রাসকৃত শক্তির কিছু অংশ মহাবিশ্বে পরিত্যক্ত হয়। আবার কিছু অংশ বায়ুস্তর শোষণ করে। এই শোষণের ফলে বায়ুস্তরে শক্তি সঞ্চিত হয়। বায়ুস্থ জলকণা ও অন্যান্য দ্রব্য শোষিত শক্তির ফলে তাপশক্তি বা গতিশক্তি লাভ করে। বায়ুমন্ডল, বারিমন্ডল ও জৈবমন্ডলের যাবতীয় চক্রগুলো সৌরশক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদানের উপর নির্ভরশীল। জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে ও জৈব অস্তিত্ব রক্ষায় সৌরশক্তির প্রভাব অনস্বীকার্য।

বায়ুমন্ডলের উষ্ণায়ণ প্রক্রিয়াসমূহ
(Atmospheric Heating Processes)

অনেকগুলো প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে বায়ুমন্ডল শীতল বা উষ্ণ হয়ে থাকে। প্রক্রিয়া গুলো হচ্ছে ঃ

১. বিকিরণ (Radiation)
২. পরিবহন (Conduction)
৩. বাস্পীয় প্রস্বেদন (Evapo-transpiration)
৪. পরিচলন (Convection)
৫. অনুভূমিক পরিচলন (Advection)
৬. রূদ্ধ তাপীয় শীতলক্রিয়া (Adiabatic Cooling)
৭. সংকোচন (Compression)

বিকিরণ (Radiation)

তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ মাধ্যম ছাড়া এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে স্থানান্তরিত হতে পারে। এ স্থানান্তরে শক্তি, তাপ ও আলো হিসেবে স্থানান্তরিত হয়। সৌরশক্তি বিকিরণ পদ্ধতিতে পৃথিবীতে আসে। বায়ুমন্ডলের ভেতর দিয়ে আসার সময় ক্ষুদ্রতরঙ্গের রশ্মি পৃথিবীতে আসে। ভূ-পৃষ্ঠ এসব তরঙ্গকে শোষণ করে এবং দীর্ঘ তরঙ্গ শক্তিতে পরিণত করে। এই দীর্ঘ তরঙ্গ শক্তি সহজেই বায়ুমন্ডলের জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই অক্সাইড দ্বারা শোষিত হয়। বায়ুর এ শোষিত তাপের কিছু অংশ পুনঃবিকিরণের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে এবং কিছু মহাকাশে ফিরে যায়। বায়ুমন্ডল প্রক্রিয়ায় তাপের আচ্ছাদন হিসেবে জলীয়বাষ্প ও কার্বন ডাই অক্সাইড কাজ করে। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে আকাশে মেঘের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এতে মহাকাশে তাপগমন হ্রাস পায়। এই প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে তাপ আটকা পড়ে পৃথিবীর তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। এই অবস্থায় গ্রীন হাউস প্রভাব (Geen House Effect) তৈরী করে। এই গ্রীন হাউস অবস্থা তৈরী হলে, পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

> বায়ুমন্ডলের ভিতর দিয়ে কোন ধরণের তরঙ্গ রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছে।

পরিবহন (Conduction)

দুটি ভিন্ন উষ্ণতার বস্তু যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন আনবিক ক্রিয়ায় পদার্থের মাধ্যমে তাপ পরিবাহিত হয়। এসময় অনুসমূহের পারস্পরিক সংঘর্ষ হয়। এতে করে অনুশক্তি বেশী উষ্ণতা থেকে কম উষ্ণতার দিকে সমতা না আসা পর্যন্ত স্থানান্তরিত হয়। বিকিরন এর মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠ যখন উত্তপ্ত হয় তখন নিকটবর্তী বায়ুস্তরও পরিচলন প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত হয় বায়ুর তাপ পরিবাহিত কম বলে শুধু নিচের স্তরই শুধু পরিবহন প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত হয়।

> পরিবহন প্রক্রিয়ায় বায়ুর কোন স্তর শুধু উত্তপ্ত হয়?

চিত্র ৯.২.১ ঃ ভূ-ত্বক বায়ুমন্ডলের তাপ বিনিময়

বাষ্পীয় প্রস্বেদন (Evapotranspiration)ঃ বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় পানি কিছু সুপ্ত বা লীনতাপ গ্রহণ করে। এই প্রচ্ছন্ন তাপ বায়ুমন্ডলেও প্রবাহিত হয়। স্থলভাগ থেকে বাষ্পীয় প্রস্বেদনের ফলে তাপের স্থানান্তর হয়। অবস্থার পরিবর্তনে সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন তাপ পরিত্যাগের মাধ্যমে বাষ্প ঘণীভূত (condensation) হয়ে বারিপাত হয়। এই অবস্থায় সুপ্ততাপ বায়ুমন্ডলে অবমুক্ত হয়। সাধারণত: এক গ্রাম পানিকে বাষ্পে পরিণত করতে ৫৯০ ক্যালরী তাপের প্রয়োজন হয়।

পরিচলন (Convection)

পদার্থের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ কনাগুলো থেকে শীতল অংশে তাপের স্থানান্তরিত করার প্রক্রিয়াকে পরিচলন প্রক্রিয়া বলে। তরল বা গ্যাসীয় পদার্থে পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালন হয়। কোন স্থানের তাপ বৃদ্ধি পেলে বায়ুতাপ বৃদ্ধি পেয়ে সম্প্রসারিত হয় ও হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। এসময় পার্শ্ববর্তী শীতল বায়ু এসে এ জায়গা দখল করে। এভাবে তাপ বায়ুমন্ডলের নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে সঞ্চালিত হয়।

> কি ধরণের পদার্থে পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালিত হয়।

অনুভূমিক পরিচলন (Advection)

পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপের অনুভূমিক স্থানান্তরকে অনুভূমিক পরিচলন বা Advection বলে। এ প্রক্রিয়ায় তাপ মেরু এলাকা থেকে নিরক্ষীয় এলাকায় পুন:বন্টিত হয়।

> অনুভূমিক পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপ মেরু এলাকা থেকে কোন এলাকায় পুন:বন্টিত হয়?

রূদ্ধতাপীয় শীতল ক্রিয়া (Adiabatic cooling)ঃ পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপীয় সঞ্চালনে বায়ুর উচ্চমূখী গমনের ফলে রূদ্ধতাপীয় শীতল ক্রিয়া সাধিত হয়।

> পরিচলন প্রক্রিয়ায় বায়ুর কোন মূখী গমন হয়?

চিত্র ৯.২.২ ঃ রূদ্ধতাপীয়

অবনতী হার। উর্ধ্বমুখী বায়ু প্রবাহের শুষ্ক বায়ুর তাপমাত্রা প্রতি ৩০০ মিটারে ২.৬° সেলসিয়াস হ্রাস পায়, কিন্তু আর্দ্রবায়ুর তাপহ্রাসের হার প্রতি ৩০০ মিটারে ১.৫° সেলসিয়াস

সংকোচনজনিত তাপ (Compression Heating)ঃ নিম্নগামী বায়ু ওপরের বায়ুর চাপে সংকুচিত হয় তাই উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। বায়ু অধিক উচ্চতা থেকে নিম্নগামী হলে নিম্নচাপ থেকে উচ্চচাপের আওতায় আসে। এতে বায়ু সংকোচিত হয় ও এর উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়।

নিম্নগামী বায়ু ওপরের বায়ুর চাপে কি হয়?

পাঠসংক্ষেপ

অনেকগুলো প্রক্রিয়া সম্মিলিতভাবে বায়ুমন্ডলকে শীতল বা উষ্ণ করে থাকে। এই প্রক্রিয়াগুলো হলো ঃ বিকিরণ, পরিবহন, বাষ্পীয় প্রস্বেদন, পরিচলন, অনুভূমিক পরিচলন, রূদ্ধতাপীয় শীতল ক্রিয়া এবং সংকোচন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ __________ ছাড়া একবস্তু থেকে অন্য বস্ততে স্থানান্তরিত হতে পারে।

১.২. দুটি ভিন্ন উষ্ণতার বস্ত যখন পরস্পরের সংস্পর্সে আসে তখন __________ ক্রিয়ায় পদার্থের মাধ্যমে তাপ পরিবাহিত হয়।

১.৩. বাষ্পী ভবনের জন্য পানি কিছু __________ বা __________ তাপ গ্রহন করে।

১.৪. __________ প্রক্রিয়ায় তাপীয় সঞ্চালনে বায়ুর উচ্চমুখী গমনের ফলে রূদ্ধতাপীয় শীতলক্রিয়া সাধিত হয়।

১.৫. নিম্নগামী বায়ু ওপরের বায়ুর চাপে ____________________ হয়।

উত্তর ঃ ১.১. মাধ্যম ১.২. আনবিক ১.৩. সুপ্ত বা লীনতাপ ১.৪. পরিচলন ১.৫. সংকুচিত

২। সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

২.১. সৌরশক্তি বিকিরণ পদ্ধতিতে পৃথিবীতে আসে।

২.২. সাধারণত: একগ্রাম পানিকে বাষ্পে পরিণত করতে ৫০০ ক্যালরী তাপের প্রয়োজন হয়।

২.৩. স্থলভাগ থেকে বাষ্পীয় প্রস্বেদনের ফলে তাপের স্থানান্তর হয়।

২.৪. পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপের উলম্ব স্থানান্তরকে অনুভূমিক পরিচলন বা Advection বলে।

২.৫. বায়ু সংকুচিত হলে এর উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়।

উত্তরঃ ২.১. স ২.২. মি ২.৩. স ২.৪. মি ২.৫. স

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১. বায়ুমন্ডল উষ্ণ বা শীতল হবার প্রক্রিয়াগুলো কি কি?

২. গ্রীন হাউস প্রভাব কিভাবে তৈরী হয়?

৩. দীর্ঘ তরঙ্গ শক্তি সহজেই বায়ুমন্ডলের কি কি দ্বারা শোষিত হয়?

৪. সাধারণত: এক গ্রাম পানিকে বাষ্পে পরিণত করতে কত ক্যালরী তাপের প্রয়োজন হয়?

৫. পরিচলন প্রক্রিয়া কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সৌরশক্তি কাকে বলে? সৌরশক্তি কিভাবে বায়ুকে উত্তপ্ত করে তা বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৯.৩ ঃ বায়ুর প্রবাহ ঃ নিয়ামক ও ধরণ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বায়ু প্রবাহের বিভিন্ন নিয়ামক সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- বায়ুপ্রবাহের ধরণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

বায়ু প্রবাহের নিয়ামক

বায়ু প্রবাহ হচ্ছে বায়ুর সমতলীয় চাপের পার্থক্যের ফল। বায়ু উচ্চচাপ অঞ্চল হতে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। প্রবাহের মাধ্যমে চাপের সমতা বিধানের জন্য বায়ুর প্রবাহ অবিরত থাকে। অসম তাপ বন্টনের ও তাপ গ্রহণের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে বায়ু চাপের পার্থক্য হয় অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহের চালিকা শক্তি হচ্ছে শোষিত সৌরশক্তি। পৃথিবীর ঘুর্ণনগতি না থাকলে উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে বায়ুর এই প্রবাহ সরল ও নিয়ত হত। বায়ুপ্রবাহ কয়েকটি বিশেষ শক্তির সম্মিলিত কারণ যথা ঃ

১. চাপের ক্রমাবনতি;
২. কোরিওলিস প্রভাব;
৩. কেন্দ্র বিমূখী বল;
৪. ঘর্ষণ;
৫. মাধ্যাকর্ষণ।

চাপের ক্রমাবনতি শক্তি

চাপের মাত্রা হচ্ছে বায়ু প্রবাহের প্রকৃত শক্তি। মাধ্যাকর্ষণ বায়ুকে পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে টেনে নামাতে চায়, যার নামই হচ্ছে বায়ুচাপ। দুটি স্থানে এই চাপের মাত্রা ভিন্ন হতে পারে। নির্দিষ্ট দূরত্বে ভূ-পৃষ্ঠে দুটি স্থানের চাপের পার্থক্যই হচ্ছে চাপের ক্রমাবনতি (Pressure Gradient)। কোথাও চাপের পার্থক্য থাকলে তবে তা উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। চাপমাত্রার পার্থক্য তখনই বৃদ্ধি পায় যখন নির্দিষ্ট দূরত্বের দুটি স্থানে চাপের পার্থক্য বৃদ্ধি হয়। সাধারণত বায়ুর তাপমাত্রার পার্থক্যের সাথে সাথে চাপের পার্থক্য ঘটে কেননা বায়ুর ঘনত্বের পরিবর্তন ঘটে। উষ্ণ বায়ু হালকা বা কম ঘনত্বের হয় এবং উপরে উঠে যেতে চায়, ফলে ভূ-পৃষ্ঠে দেশে চাপ কমে যায়। উচ্চ অক্ষাংশের শীতল ও ভারী বায়ু তখন এদিকে প্রবাহিত হয়। শীতল ও ভারী বায়ু নিচের দিকে চাপ সৃষ্টি করে ও উচ্চচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়ে শূন্যস্থান দখল করে।

চাপমাত্রার উপর বায়ু প্রবাহের সরল ও সাধারণ উদাহরণ হচ্ছে স্থল বায়ু ও সমুদ্র বায়ু। দিনের বেলা স্থলভাগ দ্রুত উষ্ণ হলে সমুদ্র থেকে বায়ু স্থলভাগের কম ঘনত্বের বায়ু সম্পন্ন কম চাপের বায়ুর দিকে প্রবাহিত হয়, যাকে সমুদ্র বায়ু বলে। আবার রাত্রিবেলা স্থলভাগ দ্রুত ঠান্ডা হলে ভারী বায়ু সমুদ্রের হালকা ও উচ্চ বায়ুচাপ স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়।

কোরিওলিস প্রভাব (Coriolis Effect)

বায়ু প্রবাহ সাধারনত: ফেরেলের সূত্র অনুসারে উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। প্রবাহের এই ধরণ পরিবর্তনকে কোরিওলিস শক্তি (Coriolis force) বলে।

গোলার্ধ ভিত্তিক এই পরিবর্তন কোন প্রবাহিত চলমান (moving) বস্তুর উপর পৃথিবীর ঘুর্ণন বলের প্রভাব বলে অনুমান করা যায়। এই বা দিক পরিবর্তনকারী শক্তি

(১) বায়ু প্রবাহের দিকের সাথে সর্বদা লম্বভাবে (৯০°) ক্রিয়া করে;
(২) বায়ু প্রবাহে কেবল মাত্র দিক পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে, গতির উপর কোনো প্রভাব ফেলে না;

(৩) কোরিওলিস বা গোলার্ধ প্রভাব মেরুতে সর্বাধিক, নিরক্ষীয় অঞ্চলে কমতে থাকে, বিষুব রেখায় এর অস্তিত্ব লোপ পায়।

ঘর্ষণ শক্তি (Frictional force)

বায়ু প্রবাহ ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় অসমতল ভূমিরূপের কারণে কিছু সংঘর্ষ ও ঘর্ষণের সৃষ্টি করে। ঘর্ষণ বলের মাত্রা ভূ-পৃষ্ঠের অসমতার উপর নির্ভর করে। যেমন তুষারাবৃত্ত ও সমুদ্র পৃষ্ঠে বায়ু প্রবাহ মসৃণ তলের উপর কম ঘর্ষণের সৃষ্টি করে। অন্যদিকে আকাশচুম্বি অট্টালিকা সমৃদ্ধ নগরী অথবা পাহাড়ী অসম গঠনে ঘর্ষণ বেশী মাত্রায় হয়।

চিত্র ৯.৪.১ ঃ উত্তর গোলার্ধে নিম্নচাপের প্রভাবে সাইক্লোন ও উচ্চ চাপের প্রভাবে সৃষ্ট এন্টি সাইক্লোনের ঘূর্ণন দেখানো হলো, দক্ষিন গোলার্ধে বিপরীত ঘূর্ণন পরিদৃষ্ট হয়।

পাঠসংক্ষেপ

বায়ুপ্রবাহ হচ্ছে বায়ুর সমতলীয় চাপের পার্থক্যের ফল। বায়ু উচ্চচাপের স্থান থেকে নিম্নচাপ স্থান -এর দিকে প্রবাহিত হয়। প্রবাহের মাধ্যমে চাপের সমতা বিধানের জন্য বায়ুর প্রবাহ অবিরত থাকে। অসম তাপ বন্টনের ও গ্রহণের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে বায়ু চাপের পার্থক্য হয়। অর্থাৎ বায়ু প্রবাহের চালিকা শক্তি হচ্ছে শোষিত সৌরশক্তি। পৃথিবীর ঘূর্ণনগতি না থাকলে উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে বায়ুর এই প্রবাহ সরল ও নিয়ত হত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১.১ বায়ু প্রবাহের চালিকা শক্তি হচ্ছে–
ক) সমূদ্র স্রোত খ) শোষিত সৌরশক্তি গ) বৃষ্টিপাত

১.২ বায়ুকে পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে টানে কে?
ক) মাধ্যাকর্ষণ খ) ঘূর্নীঝড় গ) হিমালয় পর্বত

১.৩ বায়ুর আয়তনহ্রাস পায়–
ক) নিম্নচাপ অঞ্চলে খ) সমতলীয় অঞ্চল গ) ঢালু অঞ্চলে

উত্তর ঃ ১.১. খ ১.২. ক ১.৩. ক

২। শূন্যস্থান পূরন করুন

২.১ চাপের _____________ হচ্ছে বায়ু প্রবাহের প্রকৃত শক্তি।

২.২ বায়ু প্রবাহ উত্তর গোলার্ধে _______________ দিকে ও দক্ষিন গোলার্ধে ___________________ দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়।

২.৩ চাপের মাত্রা হচ্ছে বায়ু প্রবাহের প্রকৃত _____________ ।

২.৫ ঘর্ষন বলের মাত্রা ভূ-পৃষ্ঠের _____________ উপর নির্ভর করে।

উত্তর ঃ ২.১ মাত্রা ২.২ ডান, বাম ২.৩ শক্তি ২.৪ অসমতল ২.৫ অসমতার

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বায়ু প্রবাহ কি?
২. বায়ু প্রবাহের চালিকা শক্তি কি?
৩. চাপের ক্রমাবনতি কাকে বলে?
৪. কোরিওলিস প্রভাব কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বায়ু প্রবাহের নিয়ামকসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৯.৪ ঃ নিয়ত বায়ু প্রবাহ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- নিয়ত বায়ু প্রবাহ কি তা বলতে পারবেন;
- নিয়ত বায়ু প্রবাহের নানা ধরণ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

বায়ুর তাপ ও চাপ দ্বারা বায়ু প্রবাহের দিক ও তীব্রতা নির্ণয় করা হয়। তাই পৃথিবীর বায়ু প্রবাহ মূলত চাপ বলয়ের উপর নির্ভরশীল। এ বায়ুপ্রবাহকে প্রধান চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা ঃ নিয়ত বায়ু, সাময়িক বায়ু, অনিয়মিত বায়ু, স্থানীয় বায়ু। এ চারটি শ্রেণীর মধ্যে নিয়ত বায়ু প্রবাহ পৃথিবীর সর্বত্রই বিরাজমান।

নিয়ত বায়ু প্রবাহ

যে সমস্ত বায়ু প্রবাহ পৃথিবীর চাপ বলয়গুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সারা সৎসর ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চচাপ বলয় হতে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় তাকে নিয়ত বায়ু প্রবাহ বলে।

নিয়ত বায়ু প্রবাহের সাধারণ আলোচনা

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অক্ষাংশ ভেদে দু'প্রকার বায়ু চাপ লক্ষ্য করা যায়। যথা ঃ উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ। স্থান ও চাপ অনুযায়ী পৃথিবীকে মোট সাতটি চাপ বলয়ে বিভক্ত করা যায়। এদের তিনটি নিম্নচাপ বলয় এবং চারটি উচ্চচাপ বলয়। নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের উত্তর ও দক্ষিণে কর্কট ও মকর ক্রান্তীয় অঞ্চলে (৩০° হতে ৩৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে) দুইটি উচ্চচাপ বলয় রয়েছে। এছাড়া দুই মেরুবৃত্তে নিম্নচাপ ও দুই মেরুতে উচ্চচাপ বর্তমান। ভূ-পৃষ্ঠের এ বায়ুচাপ বলয়গুলোর অবস্থান লক্ষ্য করলে বায়ূ প্রবাহের দিক সহজেই জানা যায়। (চিত্র- ৯.৫.১) বায়ু প্রবাহ উচ্চচাপ অঞ্চল হতে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় এবং উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চচাপ বলয় হতে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে যে বায়ু সারা বছর নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় সে বায়ু প্রবাহ-ই নিয়ত বায়ু।

বায়ু সাধারণত উচ্চচাপ অঞ্চল হতে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়।

চিত্র ৯.৪.১ ঃ নিয়ত বায়ু প্রবাহ

নিয়ত বায়ু প্রবাহের প্রকার ভেদ

নিয়ত বায়ু প্রবাহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে;
ক) আয়ন বায়ু
খ) প্রত্যায়ন বায়ু এবং
গ) মেরুদেশীয় বায়ু।

প্রবাহের দিক ভেদে এদের নিম্নোক্ত ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু; দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু;
দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ু; উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ু;
উত্তর-পূর্ব মেরুদেশীয় বায়ু; দক্ষিণ-পূর্ব মেরুদেশীয় বায়ু।

নিম্নে এদের বিবরণ প্রদত্ত হল

(ক) আয়ন বায়ু ঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিম্নচাপের উষ্ণ ও লঘু বায়ু উর্ধ্বে উঠে গেলে চাপের সমতা রক্ষার জন্য কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় হতে দু'টি বায়ু সারা বৎসর নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট পথে নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। এরূপে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে আসার সময় ফেরেলের সূত্রাসুনারে উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে বেকে উত্তর-পূর্ব দিক হতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত হয়।

উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু ঘন্টায় ১৬ কি.মি. এবং দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু ঘন্টায় ২২.৪ কি.মি. বেগে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু সাধারণত নিরক্ষরেখা হতে কয়েক ডিগ্রী (প্রায় ২০) উত্তর ও দক্ষিণ হতে প্রায় ৩৫° ডিগ্রী উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে প্রবাহিত হয়। আয়ন বায়ু উচ্চ অক্ষাংশ হতে নিম্ন অক্ষাংশে প্রবাহিত হয় বলে প্রচুর জলীয় বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা রাখে।

(খ) প্রত্যায়ন বায়ু

কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় হতে দুই মেরু বৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকেও দুইটি বায়ু সারা বৎসর নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়। এদেরকে প্রত্যায়ন বায়ু বলে। এই বায়ু দুই গোলার্ধে ৩৫° হতে ৬০° অক্ষাংশের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

কত ডিগ্রী অক্ষাংশে প্রত্যায়ন বায়ু উভয় গোলার্ধে অবস্থান করে?

এই বায়ু প্রবাহের দু'টি উল্লেখযোগ্য প্রপঞ্চ হল গর্জনশীল চল্লিশা ও অশ্ব অক্ষাংশ। দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগ অধিক থাকায় উত্তর-পশ্চিমা বায়ু ৪০° - ৬০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে সারা বৎসর প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। ইহাকে গর্জনশীল চল্লিশা বলে। আবার ৩০° - ৩৫° উত্তর অক্ষাংশে পূর্বে পানীয় জলের অভাবে জন্য নাবিকেরা অশ্বগুলিকে পানিতে নিক্ষেপ করত। সেজন্য এ অক্ষাংশ অঞ্চলকে অশ্ব অক্ষাংশ বলে।

গর্জনশীল ও অশ্ব অক্ষাংশ কি?

প্রত্যায়ন বায়ুর ফলে সকল মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টি হয়। শীতকালে জল অপেক্ষা স্থলভাগ অধিক শীতল থাকে বলে এ' বায়ুতে শীতকালে অধিক বৃষ্টি হয়।

(গ) মেরু বায়ু ঃ সুমেরু ও কুমেরু উচ্চচাপ বলয় হতে দুইটি বায়ু মেরু বৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয় দু'টির দিকে প্রবাহিত হয়। ইহারাও ফেরেলের সুত্রানুসারে বেঁকে উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুরূপে প্রবাহিত হয়। মেরু হতে প্রবাহিত হয় বলে ইহারা শুষ্ক ও শীতল বায়ু। কেবল দক্ষিণ গোলার্ধে এই বায়ু প্রবাহের ফলে প্রবল ঝড় উঠে এবং বৃষ্টিপাত হয়।

শুধুমাত্র দক্ষিন গোলার্ধে বায়ুপ্রবাহের ফলে কি হয়?

পাঠসংক্ষেপ

উপরের বর্ণিত তিন প্রকার নিয়ত বায়ু প্রবাহের বিবরণ হতে দেখা যায় যে, নিম্ন অক্ষাংশে বায়ু প্রধানত পূর্ব দিক হতে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলে মিলিত হয় মধ্য অক্ষাংশে পশ্চিম দিক হতে এবং মেরু অঞ্চলে প্রধানতঃ পূর্ব দিক হতে বায়ু প্রবাহিত হয়। এভাবেই উত্তর ও দক্ষিন গোলার্ধে নিয়ত বায়ু প্রবাহ (আয়ন, প্রত্যায়ন ও মেরু বায়ু) বিষুবরেখা ও মেরুর মধ্যে যাতায়াত করে। এভাবেই পৃথিবীর উষ্ণ ও শীতল এলাকার মধ্যে তাপের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। শূন্য স্থান পূরণ করুন

১.১ বায়ু প্রবাহের দিক ও তীব্রতা পরিমাপ করা হয় বায়ুর _________ ও _____________ দ্বারা।

১.২ নিয়তবায়ু প্রবাহ পৃথিবীর _______________ বিরাজমান।

১.৩ নিয়তবায়ু উত্তর গোলার্ধে _______________ দিকে ও দক্ষিন গোলার্ধে ___________________ দিকে বেঁকে যায়।

১.৪ নিয়ত বায়ু __________________ প্রকার।

উত্তর ঃ ১.১. তাপ, চাপ ১.২. সর্বত্র ১.৩. ডান, বাম ১.৪. তিন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. নিয়ত বায়ুর সংজ্ঞা কি?

২. নিয়ত বায়ুর চাপ বলয়গুলো কি?

৩. আয়ন বায়ু কি?

৪. প্রত্যায়ন বায়ু কি?

৫. মেরুবায়ু কি?

৬. ফেরেলের সূত্র কি?

৭. গর্জন শীল চল্লিশা কি?

৮. অশ্ব অক্ষাংশ কি?

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. নিয়ত বায়ু সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

২. আয়ন বায়ুর বর্ণনা দিন। মেরু বায়ুর ফলে ঝড় ও বৃষ্টিপাত হয় কেন?

পাঠ- ৯.৫ ঃ স্থানীয় বায়ু (Local Winds)

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বিভিন্ন প্রকার সাময়িক বায়ু সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- স্থানীয় বায়ু কি এবং স্থানীয় বায়ুর প্রকার সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সমুদ্র ও স্থলবায়ু সম্পর্কে ধারণা পাবেন। এবং
- পৃথিবীর কিছু স্থানীয় বায়ু ও এর গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

কোন স্থানের তাপ ও চাপের পার্থক্যের কারনে স্থানীয়ভাবে যে বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয় তাকে স্থানীয় বায়ু বলে।

নিয়মিত ও অনিয়মিত ভিত্তিতে এই সমস্ত বায়ু পুরোপুরি স্থানীয় ভাবে সৃষ্টি হয়। এই বায়ুর প্রভাবাধীন এলাকা সীমিত এবং ক্ষণস্থায়ী। ক্ষুদ্র আয়তনের হলেও এইসব বায়ু প্রবাহের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা স্থানীয় আবহাওয়ায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। তবে, চাপ বলয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বায়ু প্রবাহের ক্ষেত্রে এই সমস্ত বায়ুর তেমন প্রভাব নেই। পৃথিবীতে প্রায় কয়েকশ স্থানীয় বায়ু প্রবাহ আছে, যা তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। যথাঃ
ক) সমুদ্র ও স্থল বায়ু
খ) উপত্যকা ও পার্বত্য মৃদু বায়ু এবং
গ) শুষ্ক তাপীয় স্তূপমেঘ পরিচলন

সমুদ্র ও স্থল বায়ু (Land and Sea Breez)

উপকূলে সকালের সূর্যতাপ স্থানীয় ভূমির তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ফলে নিকটস্থ সমুদ্রের ভারি বায়ু ভূমির দিকে প্রবাহিত হয় (চিত্র ৯.৫.১)। একে সমুদ্র বায়ু বলে। বিকালে এই বায়ুর বেগ সবচেয়ে বেশি হয়। সূর্যাস্তের পর সমুদ্রের চেয়ে স্থলভাগ দ্রুত শীতল হয়ে যায়। তখন স্থলভাগের শীতল বায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। একে স্থলবায়ু বলে।

স্থানীয় বায়ু কাকে বলে?

চিত্র ৯.৫.১ ঃ সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু

উপত্যকা ও পার্বত্য মৃদু বায়ু (Valley and Mountain Breezes)

সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া এ বায়ু স্থল ও সমুদ্র বায়ুর মতই। সাধারণত উপত্যকা বায়ু পার্বত্য বায়ুর চেয়ে দূর্বল। দিবাভাগে উপত্যকা বায়ু সৌরতাপে উত্তপ্ত হয়। উত্তপ্ত বায়ু উচু পর্বতে/পাহাড়ে বাধা পাওয়ায় পাশে যেতে না পেরে ওপরে উঠে যায়। এই সময় পর্বতের ওপরের শীতল ও ভারী বায়ু সরাসরি নীচে উপত্যকার দিকে নেমে আসে। রাত্রে উপত্যকার উভয় ঢাল সমতলের (Valley floor) চেয়ে বেশি শীতল হয়ে যায়। এই সময় ঢালের শীতল বায়ু সমতলের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহা পার্বত্য মৃদু বায়ু নামে পরিচিত (চিত্র ৯.৫.২)।

চিত্র ৯.৫.২ ঃ উপত্যকা বায়ু ও পার্বত্য মৃদুবায়ু

সারণি ৯.৬.১ ঃ পৃথিবীর কিছু স্থানীয় বায়ু ও এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

স্থানীয় বায়ুর নাম	**ভৌগোলিক অবস্থান**	**উৎপত্তি**	**বায়ুর বৈশিষ্ট্য**
চিনুক	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রকি পর্বত এলাকার মাঝামাঝি	শীতকাল	উষ্ণ স্থলভাগে সৃষ্ট
সান্তাআনা	ক্যালিফোর্নিয়া	শীতকাল (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)	উষ্ণ, স্থলভাগ থেকে সমুদ্রগামী
প্যাম্পোরো	আর্জেন্টিনা	গ্রীষ্মকাল (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)	শীতল, নিম্নচাপ সৃষ্ট
জেনেভা	আর্জেন্টিনা	গ্রীষ্মকাল	উষ্ণ, নিম্নচাপ সৃষ্ট
লেভিচি	স্পেন	বসন্তকাল	উষ্ণ
সিরোক্কো	সাহারা-লিবিয়া	বসন্তকাল	উষ্ণ, স্থল-সমুদ্র
চিলি	তিউনিসিয়া	বসন্তকাল	উষ্ণ, স্থল-সমুদ্র
খামসিন	মিসর	বসন্তকাল	উষ্ণ, স্থল-সমুদ্র
ব্রিকফিল্ডার	অস্ট্রেলিয়া (ভিক্টোরিয়া)	গ্রীষ্মকাল (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)	উষ্ণ, স্থল
মিস্ট্রাল	দক্ষিন ফ্রান্স (ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল)	শীতকাল	শীতল, স্থল-সমুদ্রগামী
ফন	সুইজারল্যান্ড	শীতকাল	উষ্ণ, সমুদ্র-স্থল
বোরো	আড্রিয়াটিক এলাকা	শীতকাল	শীতল, স্থল-সমুদ্রগামী

পাঠসংক্ষেপ

নিয়মিত ও অনিয়মিত ভিত্তিতে এ সমস্ত বায়ু পুরোপুরি স্থানীয়ভাবে সৃষ্টি হয়। এ বায়ুর প্রভাবাধীন এলাকা সীমিত এবং ক্ষণস্থায়ী। ক্ষুদ্র আয়তনের হলেও এসব বায়ুপ্রবাহের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা স্থানীয় আবহাওয়ায় বেশ প্রভাব ফেলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১. সঠিক উত্তরটির পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন

১.১. পৃথিবীতে কতটি স্থানীয় বায়ু আছে-
ক) ৫০টি খ) ১০০০টি গ) কয়েকশ'টি

১.২. সমুদ্র বায়ু কখন প্রবাহিত হয়?
ক) সকালে খ) দুপুরে গ) বিকালে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. স্থানীয় বায়ু কাকে বলে?

২. স্থানীয় বায়ুর শ্রেণীগুলো কি কি?

৩. সমুদ্র বায়ু কাকে বলে?

৪. স্থল বায়ু কাকে বলে?

৫. উপত্যকা ও পার্বত্য মৃদু বায়ু কি?

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. স্থানীয় বায়ুর বর্ণনা দিন। তিনটি স্থানীয় বায়ুর বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা ছকের মাধ্যমে দেখান।

পাঠ- ৯.৬ ঃ সাময়িক বায়ু (Periodical Winds)

এই পাঠ শেষে আপনি—

- মৌসুমী বায়ু সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন;
- দক্ষিন এশিয়ায় মৌসুমী বায়ুর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

মৌসুমী বায়ু ঃ মৌসুমী বায়ু সাময়িক বায়ুর অন্তর্ভূক্ত। আরবি ভাষায় 'মওসুম' শব্দের অর্থ ঋতু। এই বায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর দিক পরিবর্তন হয়। মৌসুমী বায়ু একটি আঞ্চলিক বায়ু। এই বায়ু প্রধানত দক্ষিণ এশিয়ায় দেখা যায়। তাছাড়া উত্তর অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার কিছু অংশ, চিলি, স্পেন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ লক্ষ্য করা যায়।

মৌসুমী বায়ু কোন বায়ুর অর্ন্তভূক্ত?

এশিয়ার মৌসুমী বায়ু ঃ এশিয়ায় জুলাই ও জানুয়ারী মাসের মৌসুমী বায়ুর একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল।

জুলাই মাসের বৈশিষ্ট্য (চিত্র ৯.৬.১ক) ঃ জুলাই মাসে মধ্য এশিয়ার উষ্ণতা পার্শ্ববর্তী পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার ও নিকটবর্তী সাগরের চেয়ে অনেক বেশি থাকে।

জুলাই মাসে মধ্য এশিয়ার উষ্ণতা কিরূপ হয়?

১। এশিয়ার ওপর বিস্তৃত এলাকা জুড়ে প্রবল নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। একই সময়ে ভারত-পাকিস্তানের থর মরুভূমিকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাব এলাকায় আরেকটি অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির প্রবল নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

২। অস্ট্রেলিয়ায় শীতকাল এবং এর উত্তরাংশে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়।

৩। অস্ট্রেলিয়ার উচ্চচাপ বলয় থেকে এশিয়ার নিম্নচাপ বলয় অভিমুখী বায়ু প্রবাহিত হয়। কিন্তু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করার পর ডান দিকে বেকে যায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসর হয়। এটি যতই উত্তরে অগ্রসর হয় ততই এশিয়ার নিম্নচাপের বামাবর্ত (Anticlockwise circulation) সঞ্চালন দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে এই বায়ু জাপান ও ইন্দোচীন বরাবর দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হয়।

৪। উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়ের বায়ু দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে নিরক্ষীয় বলয় অতিক্রম করে ভারতীয় নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু নিরক্ষীয় বলয় অতিক্রম করার পর কোরিওলিস শক্তির প্রভাবে ডান দিকে বেঁকে যায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ভারত-শ্রীলংকা-মায়ানমারের দিকে অগ্রসর হয়। বঙ্গোপসাগরে পৌঁছার পর এই বায়ু ভারতীয় নিম্নচাপের বামাবর্ত বায়ুর আওতায় আসে এবং বাংলাদেশ ও ভারতের উত্তরাংশের ওপর দিয়ে দক্ষিন-পূর্ব দিক থেকে পাঞ্জাব অভিমুখে প্রবাহিত হয়।

কোরিওলিস শক্তির প্রভাবে বায়ু কোন দিকে প্রবাহিত হয়?

চিত্র- ৯.৬.১ ঃ মৌসুমী বায়ু ক. জুলাই মাসের প্রবাহ খ. জানুয়ারী মাসের প্রবাহ

জানুয়ারী মাসের বৈশিষ্ট্য (চিত্র ৯.৭.১খ) ঃ শীতকালের মাঝামাঝি মধ্য এশিয়ার উষ্ণতা খুব কমে যায়। ফলে এই অঞ্চলে এই সময় উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। এই সময় পূর্ব ও দক্ষিণ সাগরের ওপর উষ্ণতা বেশি থাকায় নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

জানুয়ারি মাসের মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে আবহাওয়ার কি পরিবর্তন ঘটে?

১. মধ্য এশিয়া ও পাঞ্জাবে প্রবল উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। হিমালয় পর্বত দ্বারা উভয় বায়ু পৃথক থাকে।
২. অস্ট্রেলিয়ায় গ্রীষ্মকাল এবং এর উত্তরাংশে প্রবল নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।
৩. এশিয়ার উচ্চচাপ অংশ থেকে বায়ু অস্ট্রেলিয়ার প্রবল নিম্নচাপ অভিমুখে প্রবাহিত হয়। জাপান ও উত্তর চীনের ওপর দিয়ে এই বায়ু উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বায়ু কোরিওলিস শক্তির প্রভাবে ডান দিকে বেঁকে যায়। ফলে বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক থেকে অগ্রসর হতে থাকে। এইভাবে নিরক্ষীয় বলয়ে পৌঁছবার পর তা আবার বামে সরে গিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হতে থাকে।
৪. পাঞ্জাবে উচ্চচাপ অংশের বায়ু উত্তর-পশ্চিম দিকে থেকে অগ্রসর হয়ে, দক্ষিণগামী বায়ু এক পর্যায়ে কোরিওলিস শক্তির প্রভাবে ডান দিকে বেঁকে যায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে নিরক্ষীয় বলয়ে এসে পৌঁছে। নিরক্ষীয় বলয়ে এই বায়ু দক্ষিণ গোলার্ধের উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ অংশ থেকে আগত দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়।

ঘুর্ণন প্রবাহ ও বাতাসের গতিমাত্রা (Curved flow and the Gradient wind)

১. সাইক্লোন (Cyclone)ঃ আবহাওয়াবিদ্যায় নিম্নচাপ অঞ্চলের কেন্দ্র বিন্দুকে সাইক্লোন বলে। এর চারিপাশে বৃত্তাকারে বায়ু ঘুরতে থাকে। সাইক্লোনিক প্রবাহ পৃথিবীর ঘুর্ণনের সমমূখী (Same direction), উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে (Counter clock wise) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে (Clock wise) হয়।

২. এন্টি সাইক্লোন (Anti cyclone)ঃ উচ্চ চাপের বায়ু প্রবাহের কেন্দ্রকে Anti cyclone বলে। এই প্রভাবে বৃত্তাকারে বায়ু ঘূর্ণন হয়, যা পৃথিবী ঘূর্ননের বিপরীতমুখী। সমচাপীয় (Isobars) রেখা যখন বক্র হয়ে নিম্ন বা উচ্চ চাপীয় অঞ্চলে শাঙ্ক (Funnel) আকার তৈরি করে তখন ঐ স্থানকে যথাক্রমে ফাঁদ (Trough) ও উর্দ্ধমুখী (Ridge) বলে। ফাঁদ জাতীয় প্রবাহ সাইক্লোন ও উর্ধ্বমূখী প্রবাহ এন্টি সাইক্লোনের ক্ষেত্রে হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার মৌসুমী বায়ুর গুরুত্ব

দক্ষিণ এশিয়ার আওতাভূক্ত বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানে কৃষিভিত্তিক দেশের জন্য বর্ষাকালীন (জুলাই-আগষ্ট) মৌসুমী বায়ুর গুরুত্ব অপরিসীম। এই সব দেশের কৃষি পণ্য যেমন, ধান, পাট, চা ও ইক্ষুর উৎপাদন বহুলাংশে এই মৌসুমী বায়ুজনিত বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। বর্ষাকালীন মৌসুমী বায়ুর সময়মত আগমন ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে বৃষ্টিপাত এইসব কৃষি ফসল উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত জরুরী। চট্টগ্রাম উপকূলে পহেলা জুনে মৌসুমী জনিত বৃষ্টিপাত শুরু হয় এবং পরবর্তী ১ সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত বাংলাদেশের আওতায় চলে আসে। তবে ভারতের পশ্চিমাংশ ও পাকিস্তানে এ বৃষ্টিপাত শুরু হতে প্রায় ৪-৬ সপ্তাহ (১৫ জুলাই) সময় লেগে যায়। এই উপমহাদেশের কৃষি ফসল পঞ্জি (Crop calender) বর্ষাকালীন এই মৌসুমী বৃষ্টির আগমণ ও প্রস্থানের সঙ্গে সমন্বিত। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বর্ষা শুরু হলে অকাল বন্যা দেখা দেয়। তাতে বাংলাদেশের বোরো ও আউস ধান তলিয়ে যায় এবং চৈতালী ফসলের (যেমন মরিচ, তিল, কাউন) ব্যাপক ক্ষতি হয়। আবার বৃষ্টি দেরীতে শুরু হলে খরায় পুড়ে যায় অথবা ফলন খুব কমে যায়। পানির অভাবে রোপা ধান লাগনো যায় না অথবা লাগানো রোপা ধান শুকিয়ে যায়। চা, পাট ও ইক্ষুর ফলন কমে যায়।

পাঠসংক্ষেপ

সাময়িক বায়ুর অর্ন্তগত মৌসুমী বায়ু সম্পর্কে এইপাঠে আলোচনা করা হয়েছে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এর দিক পরিবর্তিত হয়। মৌসুমী একটি আঞ্চলিক বায়ু। এই বায়ু প্রবাহ প্রধানত দক্ষিন এশিয়ায় দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যানয়- ৯.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূন্যস্থান পূরনকরুন।

১.১ ___________ বায়ু সাময়িক বায়ুর অর্ন্তভূক্ত।

১.২ জুলাই মাসে মধ্য এশিয়ার উষ্ণতা পাশ্ববর্তী পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার ও নিকটবর্তী সাগরের চেয়ে অনেক ________ থাকে।

১.৩ শীতকালের মাঝামাঝি, মধ্য এশিয়ার উষ্ণতা ____________ যায়।

১.৪ জুলাই মাসে উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়ের বায়ু দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ________________ বলয় অতিক্রম করে ভারতীয় ___________________ চাপের দিকে প্রবাহিত হয়।

উত্তরঃ ১.১ মৌসুমী ১.২ বেশী ১.৩ খুব কমে ১.৪ নিরক্ষীয়, নিম্ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. মৌসুমী বায়ুর একটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
২. 'মওসুম' শব্দের অর্থ কি?
৩. মৌসুমী বায়ু প্রধানত কোথায় দেখা যায়?
৪. জুলাই মাসে মধ্য এশিয়ার উষ্ণতা নিকটবর্তী সাগরের তুলনায় কেমন হয়?
৫. জানুয়ারী মাসে মধ্য এশিয়ার এবং সাগরের বায়ুচাপের কিরূপ চিত্র দেখা যায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সাময়িক বায়ুর অর্ন্তগত মৌসুমী বায়ু চিত্রসহ বর্ণনা দিন।

পাঠ- ৯.৭ ঃ বায়ুর আর্দ্রতা

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ♦ আর্দ্রতা কি তা বলতে পারবেন;
- ♦ আর্দ্রতার সংখ্যা তাত্ত্বিক প্রকাশ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ♦ আর্দ্রতার পরিমাপ কিভাবে করা হয় সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

আর্দ্রতা (Humidity) শব্দটি বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতির পরিমাণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। বায়ুতে অন্যান্য গ্যাসের তুলনায় জলীয়বাষ্পের পরিমাণ অতি নগন্য। আয়তন হিসাবে যা শূণ্য থেকে শতকরা চার ভাগেরও কম হয়ে থাকে। কিন্তু আবহাওয়া তথা জলবায়ুতে এই সামান্য পরিমাণ জলীয়বাষ্পের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ, চাপ ও আয়তনের বায়ুতে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে সেই পরিমাণ জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিকে সম্পৃক্ত (Saturation) অবস্থা বলে। জলীয়বাষ্পজনিত বায়ুচাপ জলীয়বাষ্পচাপ নামে পরিচিত।

বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণক্ষমতা - বিভিন্ন কারণে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যেমন,

১। চাপবৃদ্ধির সাথে হ্রাস পায় ;
২। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়।

আর্দ্রতা কাকে বলে?

স্বাভাবিক চাপে বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা নিম্ন সারণীতে প্রদর্শিত হলো ঃ

সারণি ৯.৮.১ ঃ তাপমাত্রার সাথে বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতার তুলনা

তাপমাত্রা (°সে)	জলীয়বাষ্প (গ্রাম/কেজিতে)	তাপমাত্রা (°সে)	জলীয়বাষ্প (গ্রাম/কেজিতে)
-৪০	০.১	১৫	১০.০
-৩০	০.৩	২০	১৪.০
-২০	০.৭৫	২৫	২০.০
-১০	২.০	৩০	২৬.০
০	৩.৫	৩৫	৩৫.০
৫	৫.০	৪০	৪৭
১০	৭.০		

বাতাসের আর্দ্রতার সংখ্যাতাত্ত্বিক (Quantitative) মানে প্রকাশের কয়েকটি পদ্ধতি আছে তন্মধ্যে নিম্নোক্ত দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ

১। আপেক্ষিক আর্দ্রতা
২। তুল্য আর্দ্রতা

আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative Humidity)

আপেক্ষিক আর্দ্রতা হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প আছে তার পরিমাণ। এই মান একক আয়তনের বায়ুর মধ্যে উপস্থিত জলীয়বাষ্পের পরিমাণকে বুঝায়। যেমন, গ্রাম/কিলোগ্রাম, অর্থাৎ এক কিলোগ্রাম বায়ুতে এক গ্রাম জলীয়বাষ্প আছে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিতে এর মান চাপ বা তাপমাত্রা কোনটির পরিবর্তনেই পরিবর্তিত হয় না। তবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে আপেক্ষিক আর্দ্রতার মান জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সাপেক্ষে তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে বৃদ্ধি পায়।

তুল্য আর্দ্রতা (Specific Humidity)

নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বায়ুস্থ জলীয়বাষ্প এবং ঐ তাপমাত্রায় জলীয়বাষ্প সম্পৃক্তির জন্য যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প থাকতে পারে তার অনুপাতকে তুল্য আর্দ্রতা বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২৫০° সে তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত ১ কিলোগ্রাম বায়ুতে ২০ গ্রাম জলীয়বাষ্প থাকে। যদি কোনো এক সময়ে বায়ুতে উপস্থিত জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ১০ গ্রাম হয় তবে সেই সময়ের তুল্য আর্দ্রতা হবে ১০/২০ বা ৫০ শতাংশ। ১০০ ভাগ তুল্য আর্দ্রতার অর্থ হচ্ছে বায়ু জলীয়বাষ্পে সম্পৃক্ত হয়েছে। তুল্য আর্দ্রতার পরিবর্তন হয় দুটি কারণে–

১) নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ুতে জলীয়বাষ্প যোগ হলে তুল্য আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়

২) যখন জলীয়বাষ্পের উপস্থিতি নির্দিষ্ট পরিমাণে হয় তখন তাপমাত্রা কমলে তুল্য আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। আবার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে তুল্য আর্দ্রতা হ্রাস পায়।

তুল্য আর্দ্রতার সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি বিষয় হচ্ছে শিশিরাঙ্ক (Dew point)। যে তাপমাত্রায় বায়ু জলীয়বাষ্পে সম্পৃক্ত হয় তাহা শিশিরাঙ্ক নামে পরিচিত। অর্থাৎ বায়ুতে উপস্থিত জলীয়বাষ্প দ্বারা ঐ বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে হলে যে তাপমাত্রা পর্যন্ত শীতল করা প্রয়োজন সেই তাপমাত্রাকে শিশিরাঙ্ক বলে। শিশিরাংকের চেয়ে কম তাপমাত্রায় বায়ুস্থ জলীয়বাষ্প শিশির হিসাবে জমতে শুরু করে।

আর্দ্রতার পরিমাপ (Humidity measurement)

কিভাবে আর্দ্রতার পরিমাপ করা হয় ?

আর্দ্রতার পরিমাপে সাধারণত তুল্য আর্দ্রতাই পরিমাপ করা হয়।

তুল্য আর্দ্রতার পরিমাপ

তুল্য আর্দ্রতা পরিমাপের দুটি পদ্ধতি রয়েছে–

ক. সাইক্রোমিটার (Psychrometer)

খ. হাইগ্রোমিটার (Hygrometer)

পাঠসংক্ষেপ

নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ, চাপ ও আয়তনের বায়ুতে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে সেই পরিমাণ জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিকে সম্পৃক্ত অবস্থা বলে। বাতাসের আর্দ্রতা প্রকাশ করা হয় দুই ভাবে, যথা- আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তুল্য আর্দ্রতা। আর আর্দ্রতা পরিমাপের সাধারণত: দুটি পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়। যথা- সাইক্রোমিটার ও হাইগ্রোমিটার -এর সাহায্যে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১.১. জলীয়বাষ্পের ধারণক্ষমতা হ্রাস পায়–
ক) বৃষ্টিপাতের সাথে খ) চাপ বৃদ্ধির সাথে গ) কুয়াশার সাথে

১.২. আপেক্ষিক আর্দ্রতায় এক কি.গ্রা. বায়ুতে কতটুকু জলীয়বাষ্প থাকে?
ক) ১০ গ্রাম খ) ১ গ্রাম গ) ১০০ গ্রাম

১.৩. সাইক্রোমিটারের দুটি থার্মোমিটারে একই পাঠ প্রদর্শিত হলে তুল্য আর্দ্রতা
ক) সর্বোচ্চ খ) একেবারে নেই গ) ১০০ শতাংশ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. আর্দ্রতা বলতে কি বুঝায়?
২. সম্পৃক্ত অবস্থা কাকে বলে?
৩. আপেক্ষিক আর্দ্রতা কাকে বলে?
৪. তুল্য আর্দ্রতা কাকে বলে?
৫. আর্দ্রতা পরিমাপক পদ্ধতিগুলো কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বায়ু আর্দ্রতা সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৯.৮ ঃ বৃষ্টিপাত

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ♦ বৃষ্টিপাত কেন হয় তা বলতে পারবেন;
- ♦ বৃষ্টিপাতের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে জানতে পাবেন;
- ♦ বৃষ্টিপাতের পরিমাপ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

বায়ুর আর্দ্রতা জলীয়বাষ্প নির্ভর। বাষ্পীভবন (Evaporation) প্রক্রিয়ায় উন্মুক্ত জলাশয় যেমন- সমুদ্র, নদ-নদী, ক্ষুদ্র জলাশয় এবং উদ্ভিদ থেকে জলীয়বাষ্পের সৃষ্টি হয়। একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা নির্দিষ্ট। যেমন ১০° সেলসিয়াস উত্তাপে প্রতি ঘনমিটার বায়ু ৯.৪১ গ্রাম জলীয়বাষ্প ধারণ করে। একে বায়ুর সমম্পৃক্ততা (Saturated) অবস্থা বলে। আবার বায়ুর তাপমাত্রা ১০° সেলসিয়াস থেকে কম হলে তার জলীয় বাষ্প ধারন ক্ষতাও হ্রাস পায় এবং তা ৯.৪১ গ্রাম থেকেহ্রাস।

এ রকম অবস্থায় ঘনীভবনের (Condensation) সাহায্যে অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প বারিপাত ঘটায়। বারিপাত কঠিন ও তরল উভয়ই হতে পারে। জলীয়বাষ্পের শিশিরাংক যখন শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বা হিমাংকের (Freezing point) নিচে নেমে যায় তখন ঘনীভূত জলীবাষ্প কঠিন আকার ধারণ করে এবং তুষার ও বরফরূপে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে। কিন্তু হিমাংক শিশিরাংকের (dew point) ওপরে থাকলে ঘনীভবনের মাধ্যমে শিশির কুয়াশা বা বৃষ্টিতে পরিণত হয়।

বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা কিসের ওপর নির্ভর করে? বায়ুর সম্পৃক্ততা কি?

বৃষ্টিপাত

জলীয়বাষ্প পূর্ণ বায়ু উপরে উঠে শীতল হয়ে ঘনীভূত হয় এবং পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানি কণায় পরিণত হয়। পানি-কণাগুলি বড় বড় বিন্দুতে পরিণত হলে নিজের ভারে বৃষ্টিরূপে পতিত হয়।

শ্রেণী বিভাগ

চারটি উপায়ে জলীয় বাষ্প পূর্ণ বায়ু উপরে উঠে বৃষ্টিপাত ঘটায় বলে বৃষ্টিপাতকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যেমন–

ক) পরিচলন বৃষ্টি
খ) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি
গ) ঘূর্ণবাত বৃষ্টি এবং
ঘ) সংঘর্ষ বৃষ্টি

ক) পরিচলন বৃষ্টিপাত

উত্তপ্ত ভূ-পৃষ্ঠের সংস্পর্শে বায়ু উষ্ণ ও হালকা হয়ে প্রচুর জলীয়বাষ্পসহ উপরে উঠে যায়। এই অবস্থায় চাপের সমতা রক্ষার্থে চারিপাশের শীতল ও ভারী বায়ু উষ্ণ ঐ অঞ্চলে এসে উষ্ণ হয় এবং এই বায়ু ও উপরে উঠে শীতল ও প্রসারিত হয়। ফলে বায়ুস্থিত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ছোট ছোট পানি বিন্দুতে পরিণত হয়। পরে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বৃষ্টি বিন্দুরূপে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। পরিচলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উষ্ণতার বিনিময় হয়ে এই জাতীয় বৃষ্টিপাত হয় বলে একে পরিচলন বৃষ্টিপাত বলে।

চিত্র ৯.৮.১ ঃ পরিচলন বৃষ্টিপাত

খ) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত

জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময় কোন পর্বতে বাধা পেলে এই বায়ু পর্বতের ঢাল বেঁয়ে উপরে উঠতে থাকে। উপরের শীতল বায়ু ও তুষারের সংস্পর্শে এই জলীয়বাষ্প পূর্ণ বায়ু পর্বতের প্রতিবাদ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। পাহাড়ের ঢালে বাধা পেয়ে এই বৃষ্টিপাত হয় বলে একে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত বলে।

চিত্র ৯.৮.২ ঃ শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত

গ) ঘূর্নিবাত বৃষ্টিপাত

কোন স্বল্প পরিসর স্থানে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে চারিদিকের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু ঘুরতে ঘুরতে নিম্নচাপের কেন্দ্র থেকে উপরে উঠতে থাকে এবং ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করে। উপরে উঠে এই বায়ু শীতল ও ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিবাত প্রবাহিত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এইরূপ বৃষ্টিপাতকে ঘূর্ণিবাত বৃষ্টি বলে।

চিত্র ৯.৮.৩ ঃ ঘূর্ণিবাত বৃষ্টি

ঘ) সংঘর্ষ বৃষ্টিপাত

কখনও কখনও শীতল ও উষ্ণ বায়ু মুখোমুখি উপনীত হলে শীতল বায়ু ভারী হওয়ায় নীচে নেমে যায় এবং শীতল বায়ুর আঘাতে উষ্ণ, হালকা বায়ু উপরে উঠে যায়। উপরে ওঠার ফলে উষ্ণ বায়ু শীতল ও প্রসারিত হয়ে ঘনীভূত হয় এবং উভয় বায়ুর সীমান্ত বরাবর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই জাতীয় বৃষ্টিপাতকে সংঘর্ষ বৃষ্টিপাত বলে।

চিত্র ৯.৮.৪ ঃ সংঘর্ষ বৃষ্টিপাত

যে প্রক্রিয়াতেই বৃষ্টিপাত সংঘটিত হোক না কেন বৃষ্টিপাত জীব-জগৎ এবং পৃথিবীর জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

বারিপাতের পরিমাপ

[Measurement of Precipitation]

কিভাবে বারিপাত পরিমাপ করা হয়?

বারিপাতের বিভিন্ন ধরণের মধ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ সবচেয়ে সহজ। সঙ্গতিপূর্ণ প্রস্থচ্ছেদ সম্বলিত যে কোনো খোলা পাত্রই বৃষ্টিপাত পরিমাপক যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বাষ্পীভবনের ফলে অপচয় রোধ ও স্বল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত পরিমাপের জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। বৃষ্টিপাত পরিমাপের জন্য বৃষ্টি মাপনী (Rain gauge) ব্যবহার করা হয়। এটি একটি তামারতলা যুক্ত খোলা মুখবিশিষ্ট চোঙ। এর ভিতরে ফানেলসহ একটি কাঁচের পাত্র বসানো থাকে (চিত্র ৯.৯.৫)। মূল তামার চোঙটি মাটিতে এমনভাবে বসানো থাকে যাতে এর ওপর অংশ ৩০ সেন্টিমিটার মাটির ওপরে থাকে। বৃষ্টির ফোটা কাঁচের পাত্রে জমা হয় এবং সাধারত বর্ষাকালে প্রতি ২৪ ঘন্টায় কশবার তা খালি করা হয়। কাঁচের পাত্রে দাগ দেওয়া থাকায় সংগ্রহীত পানির পরিমাণ সহজেই পরিমাপ করা যায়।

আধুনিক আদর্শ বৃষ্টি মাপনী (Rain gauge) একটি ২০ সেঃ মেঃ ব্যাসের খোলামুখ সংগ্রহ পাত্র। এই খোলামুখে পতিত বৃষ্টি ফানেলের মাধ্যমে একটি চোঙ্গাকৃতির মাপনী পাত্রে জমা হয়। চোঙ্গাকৃতি পাত্রটির ছেদ্দ আয়তন (Cross-Sectional area) সংগ্রহ পাত্রের ছেদ্দ আয়তন এর এক দশমাংশ (১/১০) হয়। চোঙা সরু মুখ বিশিষ্ট হওয়ায় বাষ্পীভবনকে হ্রাস করে। ০.০২৫ সেঃ মেঃ এর কম বৃষ্টিপাত সামান্য (Trace) বৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত হয়।

চিত্র ৯.৮.৫ ঃ বৃষ্টিমাপনী যন্ত্রের সরল গঠন

বৃষ্টি মাপনী যন্ত্র খোলা জায়গায় বসানো হয় যাতে কোন গাছের বা দালানের পানি ফানেলের ভিতরে প্রবেশের সুযোগ না পায়। তাছাড়া কাঁচের পাত্রটি ফানেল দ্বারা ঢাকা থাকায় সরাসরি সূর্যালোকের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি বাষ্পায়নেরও সুযোগ থাকে না এবং চোঙটি ৩০ সেন্টিমিটার মাটির ওপর থাকায় ভূমির ছিটানো পানিও ফানেলে পৌঁছে না।

সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা ও পরিমাপের জন্য বিভিন্ন ধরণের অত্যাধুনিক মাপনী ব্যবহৃত হয়। যেমন–

টিপিং বাকেট মাপনী (Tipping-bucket gauge); ওজন মাপনী (Weighing gauge)

চিত্র ৯.৮.৬ ঃ টিপিং-বাকেট বৃষ্টিমাপনী যন্ত্র

বারিপাত পরিমাপের ক্ষেত্রে কতিপয় সতর্কতা একান্ত প্রয়োজন, সেগুলো নিম্নরূপঃ

বারিপাত পরিমাপে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন

১. বৃষ্টি মাপনীকে ঘর বাড়ী, দালান বা কোন বাঁধার (Obstructions) আড়ালে রাখা যাবে না; উন্মুক্ত স্থানে রাখতে হবে।

২. বায়ু ও বায়ুপ্রবাহ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বৃষ্টিপাত পরিমাপের জন্য অসুবিধা তৈরী করে। এজন্য মাপনীর কাছে একটি বায়ু আড়াল (Wind screen) বসাতে হবে।

৩. তুষারপাতের পরিমাপের সময় দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, পুরুত্ব ও পানির সমতা (Water Equivalent)। সাধারণত পুরুত্ব কোনো কাঠির সাহায্যে মাপা হয়। সাধারণ বায়ু প্রবাহেও তুষার মুক্ত ভাবে বিচরণ করে। এজন্য বৃক্ষ বা বাড়ী হতে দূরে খোলা স্থানে একাধিক পরিমাপ নিতে হয় ও গড় মান বের করতে হয়। পানি সম পরিমাপের জন্য, নমুনা সংগ্রহ করে বিগলিত করে পরিমাপ করা হয়। সাধারণত প্রতি দশগুণ পুরুত্বের তুষার থেকে ১ গুণ পানি পাওয়া যায়। অনেক সময় সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ৩০ সেঃ মিঃ পুরু হালকা তুষার কিম্বা ৪ সেঃ মিঃ পুরুত্বের ঘন তুষার থেকে ১ সেঃ মিঃ পানি হতে পারে।

পাঠসংক্ষেপ

জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু উপরে উঠে শীতল হয়ে ঘনীভূত হয় এবং পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানি কণায় পরিণত হয়। পানি কণাগুলি বড় বড় বিন্দুতে পরিণত হলে নিজের ভারে বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। চার ধরণের বৃষ্টিপাত দেখা যায় যথা- পরিচলন বৃষ্টি, শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি, ঘূর্ণিবাত বৃষ্টি ও সংঘর্ষ বৃষ্টি। জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ুর উপরে ওঠার উপর নির্ভর করে বৃষ্টির শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যানয়- ৯.৮

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

১। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুনঃ

১.১. জলীয়বাষ্প হিমাঙ্কের নিচে নামলে তুষারপাত হয়।

১.২. বৃষ্টি সব সময় ভারি বিন্দুতে পতিত হয়।

১.৩. বৃষ্টিপাত পাঁচ প্রকার।

১.৪. পরিচলন বৃষ্টি বড় কণায় পতিত হয়।

উত্তর ঃ ১.১. স ১.২. মি ১.৩. মি ১.৪. মি

২। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন

২.১. বৃষ্টিপাত কিসের ফল–
ক) ঘঠিভবন খ) বাষ্পায়ন গ) নগ্নিভবন

২.২. শিলা বৃষ্টি কোন বৃষ্টিপাত?
ক) শৈলোৎক্ষেপ খ) পরিচলন গ) কোনটিই নয়

২.৩. আধুনিক বৃষ্টি মাপনির ব্যাস
ক) ১০ সে.মি. খ) ১৫ সে.মি. গ) ২০ সে.মি.

২.৪. শীতল ও উষ্ণ বায়ু মুখোমুখি হলে কোন বৃষ্টি হয়
ক) পরিচলন খ) সংঘর্ষ গ) ঘূর্নিবাত বৃষ্টি

উত্তর ঃ ২.১. ক (ঘনীভবন) ২.২. গ (কোনটিই নয়) ২.৩. গ (২০ সে.মি.) ২.৪. খ (সংঘর্ষ)

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন ঃ

১. বৃষ্টিপাত কি?
২. বৃষ্টিপাত কয় প্রকার?
৩. পরিচলন বৃষ্টিপাত কাকে বলে?
৪. শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত কাকে বলে?
৫. ঘূর্ণিবাত বৃষ্টিপাত কাকে বলে?

টিকা লিখুন ঃ

১. বৃষ্টিপাতের পরিমাপ পদ্ধতি
২. বারিপাত পরিমাপে সতর্কতা অবলম্বন।

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. বিভিন্ন প্রকার বৃষ্টিপাতের বিবরণ লিখুন।
২. বৃষ্টিপাত পরিমাপের জন্য কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন?

পাঠ ৯.৯ ঃ অনিয়মিত বায়ু ঃ ঘূর্ণিঝড়

এই পাঠ শেষে আপনি—

- অনিয়মিত বায়ুর অর্ন্তগত ঘূর্ণিঝড় কিভাবে সৃষ্টি হয় তা বলতে পারবেন;
- ঘূর্নিঝড়ের বিভিন্ন দিক ও এর ফলে সৃষ্ট আবহাওয়া সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

সকল প্রকার বায়ুমন্ডলীয় গোলযোগের মধ্যে সবচাইতে প্রলয়ঙ্করী গোলযোগ হলো ঘূর্ণিঝড়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। এদের নাম ভারত মহাসাগরে সাইক্লোন (cyclonc), চীন ও জাপান উপকূলে হলো টাইফুন (Typhoon), ফিলিপাইনের উপকূলে বাগুই (baguio), অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলে উইলি উইলিছ (willy willies) এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও মেক্সিকো উপসাগর অঞ্চলে হলো হারিকেন (hyrricane)।

ঘূর্ণিঝড়ের বিভিন্ন নাম অঞ্চল ভেদে কি কি?

ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি

ঘূর্ণিঝড় (Cyclones) ও প্রতীপ ঘূর্ণিঝড় অনিয়মিত বায়ুর উদাহরণ। ওপরের ও নিচের বায়ু স্তরের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে ঘূর্ণিঝড়ও প্রতীপ ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় অত্যন্ত পরিচিত শব্দ। প্রতি বছর সাধারণত মার্চ ও নভেম্বর মাসে এই ঝড় বাংলাদেশে আঘাত হানে।

ঘূর্ণিঝড়ের বৈশিষ্ট্য

১. ঘূর্ণিঝড়ে বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ ৬৫ ঘন্টায় ১৯km বা তার বেশী হয়ে থাকে;
২. ঘূর্ণিঝড় প্রবল নিম্নচাপের ফলে সৃষ্টি হয়;
৩. পৃথিবীতে গড়ে প্রতি বছর ৮০টির মতো ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। সে তুলনায় মধ্য অক্ষাংশে গড়ে প্রতিদিন ৫০-৬০টি চলমান নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।
৪. উত্তর গোলার্ধে প্রবল ঘূর্ণিবায়ু বামাবর্তে কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হয় এবং প্রচন্ড শক্তিতে বায়ু আবর্তের মাধ্যমে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। বায়ু আবর্তের কেন্দ্রকে চোখ বলে।
৫. দ্রুত উর্ধ্বগামী বায়ু জলীয় বাস্পপূর্ণ থাকায় ঘূর্ণিঝড় প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। ঘূর্ণিঝড় প্রচন্ড শক্তিতে বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে, ফলে ব্যাপক প্রাণহানী ঘটে এবং সম্পদের বিশেষ ক্ষতি হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের বৈশিষ্ট্য কি কি?

বায়ুচাপ

ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়সমূহের ব্যাস ২০০-৭০০ কি.মি. হয়ে থাকে। ঘূর্ণিঝড়ের সমচাপ রেখাগুলি মোটামুটি বৃত্তাকার হয়ে থাকে। বাহির থেকে ভিতরের দিকে বায়ুর চাপ দ্রুত কমতে থাকে। ঘূর্ণিঝড়ে বায়ু চারপাশ থেকে পেঁচিয়ে কেন্দ্রের দিকে প্রবেশ করে এবং কেন্দ্রের কাছে এসে সে বায়ু উপরের দিকে উঠতে থাকে। ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের গভীরতা ১২ থেকে ১৬ কি.মি. হয়ে থাকে।

ঘূর্ণিঝড় এর ব্যাস ও গভীরতা কত?

চিত্র ৯.৯.১ ঃ ঘূর্ণিঝড়ের গঠন কাঠামোতে কেন্দ্রভাগ শান্ত, উভয় পার্শ্বভাগ ঘন উর্ধ্বগামী বায়ু প্রবাহ ফানেল আকৃতি ধারন করে।

ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি

উত্তর ও দক্ষিন আয়নবায়ুর বয়ে আনা বায়ুপুঞ্জ (Airmass) যেখানে মিলিত হয় সেখানেই এ ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। এটি সাধারণত আন্ত:ক্রান্তীয় এলাকাতে সংঘটিত হয়। ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রের ওপর সৃষ্টি হয়। বায়ুপুঞ্জ সমুদ্রের ওপর দিয়ে বয়ে আসায় এর বায়ুর নিম্নস্তর উষ্ণ ও আর্দ্র থাকে। ওপরের বায়ুস্তর এসময় শীতল ও শুষ্ক থাকে। দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্যের বায়ুস্তর যখন মুখোমুখি হয় তখন একটি স্তর অপর স্তরের ওপরে উঠে যায় (চিত্র ৯.১০.১)। এ উর্ধ্বগামী বায়ু দ্রুত শীতল হয় এবং এর আর্দ্রতা ঘনীভূত হয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। ঘনীভবনের ফলে যুক্ত হয়ে সুপ্ততাপ ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণনের শক্তি যোগায়। ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় সাধারণত পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। ভূমিতে পৌঁছবার পর উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঘূর্ণীঝড় দুর্বল হয়ে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায়। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির পেছনে কিছু শর্ত থাকেঃ

১. সমুদ্র পৃষ্ঠের কাছাকাছি কমপকেষ ২৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বিশিষ্ট পর্যাপ্ত উষ্ণ ও আর্দ্রবায়ু।
২. বায়ুর প্রবাহ ভেতরের দিকে এবং উর্ধ্বগামী হয়ে খাড়া মেঘপুঞ্জের সৃষ্টি করে, ফলে মুষলধারে বৃষ্টিপাত ঘটায়।
৩. উর্ধ্বস্তরে বায়ু বর্হিগামী হবে।

ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির শর্ত তিনটি কি?

ঘূর্নিঝড়ের ফলে সৃষ্ট আবহাওয়া

১. ঘূর্ণিঝড়ের আগের বায়ু শান্ত থাকে, বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বেশী হয়।
২. ঘূর্ণিঝড়ের অগ্রবর্তী অংশে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে দমকা বাতাসের সৃষ্টি হয় এবং ঘন ঘন মেঘ দেখা দেয়।
৩. ঘূর্ণিঝড়ের মূল অংশ আসার ফলে প্রবল ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে। এসময় ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে থাকে এবং মুষলধারে বৃষ্টি হতে থাকে।
৪. ঘূর্ণিঝড়ের চোখে এসে শান্ত অবস্থা ফিরে আসে।
৫. ঘূর্ণিঝড়ের পশ্চাৎভাবে পৌঁছানোর পর পুনরায় ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত থাকে, ঘন মেঘ ও প্রচন্ড বৃষ্টি শুরু হয়। এ পর্যায়ে বায়ু অগ্রবর্তী ঘূর্ণিঝড়ের বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত হয়।

টর্নেডো (Tornado)ঃ ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে টর্নেডোর পার্থক্য হল ইহা স্থলভাগে সৃষ্টি হয়। টর্নেডো ঘূর্ণিঝড়ের চেয়ে অনেক বেশী ধ্বংসাত্বক। বাংলাদেশে এপ্রিল-মে সে মাসে প্রায়সই টর্নেডো ঘটে থাকে।

পাঠসংক্ষেপ

স্থানীয় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বায়ুর উদাহরণ হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় (cyclone) ও প্রতীপ ঘূর্ণিঝড়। প্রবল নিম্নচাপের ফলে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। উত্তর ও দক্ষিণ আয়নবায়ুর বয়ে আনা বায়ুপুঞ্জ (Airmass) যেখানে মিলিত হয় সেখানেই এ ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে প্রতিবছরই সাধারণত মার্চ ও নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৯

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১.১. ঘূর্ণিঝড় একটি
ক) নিয়ত বায়ু খ) স্থানীয় বায়ু গ) সাময়িক বায়ু ঘ) অনিয়মিত বায়ু

১.২. ঘূর্ণিঝড়ে বায়ু প্রবাহের গতিবেগ ঘন্টায় প্রায়-
ক) ১১৯ কি.মি. খ) ১৯ কি.মি. গ) ১৯০ কি.মি. ঘ) ১২০ কি.মি.

১.৩. সারা পৃথিবীতে গড়ে প্রতি বছর সৃষ্টি ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা কত?
ক) ৫০ টি খ) ৮০ টি গ) ৯০ টি ঘ) ৫৫ টি

১.৪. ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় সমূহের ব্যাস
ক) ২০০-৭০০ কি.মি. খ) ১০০-৭০০ কি.মি. গ) ১০০-৫০০ কি.মি. ঘ) ২০০-৬০০ কি.মি.

১.৫. ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের গভীরতা
ক) ১২ থেকে ১৬ কি.মি গ) ১০-১৫ কি.মি. গ) ২০-২৫ কি. মি. ঘ) ১০-২০ কি.মি.

উত্তর ঃ ১.১. ঘ) অনিয়মিত বায়ু ১.২. ক) (১১৯ কি.মি.) ১.৩. খ (৮০ টি) ১.৪. ক) (২০০-৭০০ কি.মি.)
১.৫. ক) (১২ থেকে ১৬ কি.মি.)

২. শূন্য স্থান পূরন করুন

২.১. ঘূর্ণিঝড় প্রবল ______________ চাপের ফলে সৃষ্টি হয়।

২.২. মধ্য অক্ষাংশে গড়ে প্রতিদিন ___________ থেকে _________ টি চলমান নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

২.৩. উত্তর গোলার্ধে প্রবল ঘূর্ণিবায়ু বামাবর্তে ___________ দিকে প্রবাহিত হয়।

২.৪. উত্তর ও দক্ষিন ______________ বায়ুর বয়ে আনা বায়ুপুঞ্জ সেখানে মিলিত হয় সেখানেই এ ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়।

২.৫. ঘূর্ণিঝড়ের আগে বায়ু শান্ত থাকে, বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা ____________ হয়।

উত্তর ঃ ২.১. নিম্নচাপ ২.২. ৫০ থেকে ৬০ টি ২.৩. কেন্দ্রের ২.৪. আয়ন ২.৫. বেশী।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি কিভাবে হয়?
২. ঘূর্ণিঝড়ের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
৩. ঘূর্ণিঝড়ের বায়ুচাপ কি রকম?
৪. ঘূর্ণিঝড়ের উলম্ব গঠন কি রকম?
৫. ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির শর্ত তিনটি কি?

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
২. ঘূর্ণিঝড় এর উৎপত্তি বায়ুচাপ বৈশিষ্ট্য, সৃষ্টি, উলম্বগঠন সম্পর্কে লিখুন।
৩. পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়কে কি কি নামে অভিহিত করা যায়? ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সৃষ্ট আবহাওয়া বর্ণনা করুন।

ইউনিট ১০

জলবায়ুর শ্রেণী বিভাগ

(Classification of Climate)

পাঠ- ১০.১ ঃ জলবায়ুর শ্রেণী বিভাগ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- পৃথিবীর জলবায়ুর শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে ধারণা পাবেন;

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান ও নিয়ামক সম্পর্কে আগের অধ্যায়ে জেনেছি। এই উপাদান ও নিয়ামকের বিভিন্নতার প্রভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু দেখা যায়। কতগুলি উপাদানের সমন্বয়ে এক একটি জলবায়ুর সৃষ্টি হয় বলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুর সৃষ্টি হয়েছে।

উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুচাপ প্রভৃতি নিয়ামকগুলো সম্মিলিতভাবে ভূ-পৃষ্ঠে এক জটিল জলবায়ুর সৃষ্টি করে। পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থানভেদে এবং নিয়ামক সমূহের ভিন্নতার জন্য ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে মেরু পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু দেখা যায়।

জলবায়ুর শ্রেণীবিভাগ

পৃথিবীর যে যে অংশে মোটামুটি একই ধরণের জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাদের অর্ন্তনির্হিত প্রক্রিয়া (processes) এবং প্যাটার্নকে (pattern) ভালভাবে বোঝার সুবিধার জন্য পৃথিবীর অসংখ্যা জলবায়ুকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

প্রয়োজনের বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জলবায়ু বিজ্ঞানী পৃথিবীর জল বায়ুসমূহকে বিভিন্ন ভাবে শ্রেণী বিভাগ করেছেন। বিভিন্ন ধরণের শ্রেণী বিভাগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রেণী বিভাগ হলো কোপেনের শ্রেণী বিভাগ।

কোপেনের জলবায়ুর শ্রেণীবিভাগ ঃ ভ্লাদিমির কোপেন পৃথিবীর জলবায়ুর শ্রেণী বিভাগকে প্রথম প্রকাশ করেন ১৯০১ সনে। কয়েকবার সংশোধন এর পর চূড়ান্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সনে।

শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি

গড় মাসিক ও বার্ষিক এবং শীত ও গ্রীষ্মের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত ও শুষ্কতার মাত্রা বা সূচকের (aridity index) উপর ভিত্তি করে তিনি পৃথিবীর জলবায়ুর শ্রেণী বিভাগ করেন। এই ক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাগের পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জকে সামগ্রিক জলবায়ুর বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ধরা হয়।

কিসের ওপর ভিত্তি করে কোপেন জলবায়ুর শ্রেণী বিভাগ করেন?

বর্ণনা

গড় মাসিক তাপমাত্রার ভিত্তিতে এবং প্রধান প্রধান উদ্ভিজ্জ অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোপেন পৃথিবীর জলবায়ুসমূহকে পাঁচটি প্রধান গোত্রে বিভক্ত করেন। প্রতিটি প্রধান জলবায়ু গোত্রকে ইংরেজী বড় হাতের অক্ষর দিয়ে (A-E) চিহ্নিত করেন। ১০.১.১ নং চিত্রে কোপেনের জলবায়ু অঞ্চল দেখান হলো। নিম্নে এই শ্রেণী বিভাগের সংক্ষিপ্ত বর্ণণা দেয়া হলোঃ

A- শীতল ঋতুবিহীন উষ্ণমন্ডলীয় বৃষ্টি বহুল জলবায়ুসমূহ (Tropical rainy climates with no cool season) ঃ এই জলবায়ু অঞ্চলের শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা ১৮° সেঃ এর বেশী। যে সব গাছের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য তুলনামূলকভাবে বেশী তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন সেসব গাছ এ জলবায়ুতে জন্মায়।

শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা কত?

চিত্র ১০.১.১ ঃ কোপেনের জলবায়ু অঞ্চল

বৃষ্টিপাতের ঋতুগত বন্টনের ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে এ জলবায়ুর গোত্রকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

১. উষ্ণ মন্ডলীয় আর্দ্র জলবায়ু;
২. উষ্ণ মন্ডলীয় আর্দ্র ও শুষ্ক জলবায়ু; এবং
৩. উষ্ণ মন্ডলীয় মৌসুমী জলবায়ু

B- শুষ্ক জলবায়ুসমূহ (Dry climates) এ জলবায়ুতে বৃষ্টিতের চাইতে বাষ্পীভবন বেশী হয়ে থাকে। ফলে ভূ-গর্ভস্থ জল সমতল (Cunderground waer table) অনেক নীচে নেমে যায়। এ কারণে শুষ্ক জরবায়ু অঞ্চলে সদা প্রবাহমান নদী উৎপন্ন হয় না। উদ্ভিজ্জের বৃদ্ধি নির্ভর করে বৃষ্টিপাত ও বাষ্পীভবনের মিলিত প্রভাবের ওপর। আবার বাষ্পীভবনের পরিমাণ নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর। এজন্য শীতকাল ও গ্রীষ্মকালে যদি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সমান হয়, তাহলে গ্রীষ্মকালে বাষ্পীভবন বেড়ে যায়। এতে করে উদ্ভিজ্জের বৃদ্ধি ও বেড়ে যায় এবং এতে বৃষ্টিপাতের কার্যকারিতা অনেক কমে যায়। এ কারণে বার্ষিক বৃষ্টিপাত বায়ুর তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের ঋতুগত বন্টনের উপর ভিত্তি করে কোপেন B গোত্রের জলবায়ুসমূহকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এই প্রধান দুটি শ্রেণী হচ্ছে-
১। মরু জলবায়ু (Arid or desert climate)
২। অর্ধশুষ্ক (Semiarid) বা
'স্টেপ' (steppe) জলবায়ু।

C- মৃদু শীতসম্পন্ন মধ্য অক্ষাংশীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ুসমূহ

এ জলবায়ু অঞ্চলে শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা ৩°C ও ১৮°C এর মধ্যে থাকে এবং উষ্ণতম মাসের গড় তাপমাত্রা ১০°C এর বেশী থাকে। এ জলবায়ুর গোত্রে তিনটি প্রধান শ্রেণী রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-
১। স্পষ্ট কোন শুষ্ক ঋতু নেই।
২। শীতকাল শুষ্ক।
৩। গ্রীষ্মকাল শুষ্ক।

D- চরম ভাবাপন্ন মধ্য অক্ষাংশীয় বৃষ্টি বহুল জলবায়ুসমূহ

এ জলবায়ু গোত্রে শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা ৩°C এর কম এবং উষ্ণতম মাসের গড় তাপমাত্রা ১০°C এর বেশী থাকে। এ জলবায়ুতে বছরের সাত মাসের বেশী সময় মাটির জলীয় পদার্থ বরফে জমাট বেধে থাকে এবং ভূমি বরফে ঢেকে থাকে। এ জলবায়ু গোত্রের দুটি প্রধান শ্রেণী হলোঃ
১। আর্দ্র ও অতিশীতল জলবায়ু এবং
২। শুষ্ক শীত ধাতুসহ অতিশীতল জলবায়ু।

E- মেরু জলবায়ু (polar climates)

এ জলবায়ুসমূহে উষ্ণতম মাসের গড় তাপমাত্রা ১০°C এর কম থাকে। বছরের অধিকাংশ সময় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে থাকে। ফলে উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য গ্রীষ্মকালের স্থায়িত্ব এবং উত্তাপের প্রাচুর্য অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ জলবায়ু গোত্রের প্রধান দুটি শ্রেণী হলোঃ
১। তুন্দ্রা অঞ্চল এবং
২। চিরস্থায়ী বরফের আচ্ছাদন জনিত জলবায়ু।

পাঠসংক্ষেপ

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান ও নিয়ামকের বিভিন্নতার প্রভাবে পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু দেখা যায়। ভৌগোলিক অবস্থান ও নিয়মক ভেদে ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চল পর্যন্ত জলবায়ুর ভিন্নতা দেখা যায়। পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলের জলবায়ু একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন বা প্রক্রিয়া মেনে চলে তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ফেলা হয়। এইরূপে অনেক ধরণের জলবায়ুর শ্রেণী বিভাগ গড়ে উঠেছে। এই শ্রেণী বিভাগগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রেণীবিভাগ হলো কোপেনের শ্রেণী বিভাগ। গড়ে মাসিক ও বার্ষিক এবং শীত ও গ্রীষ্মের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত ও শুষ্কতার মাত্রা বা সূচকের উপর ভিত্তি করে তিনি পৃথিবীর জলবায়ুর শ্রেণীবিভাগ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরন করুন ঃ

১.১ ভ্লাদিমির কোপেন পৃথিবীর জলবায়ুর শ্রেণীবিভাগকে প্রথম প্রকাশ করেন _______________সনে।

১.২ সংশোধনের পর কোপেনের জলবায়ু শ্রেণীবিভাগ চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয় _____________ সনে।

১.৩ কোপেনের জলবায়ু শ্রেণীবিভাগের পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক ____________________ সামগ্রিক জলবায়ুর বহি:প্রকাশ হিসাবে ধরা হয়।

১.৪ কোপেন প্রতিটি প্রধান জলবায়ু গোত্রকে ইংরেজী _________অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করেন।

১.৫ কোপেনের জলবায়ু শ্রেণীবিভাগ ______________ টি গোত্রে বিভক্ত।

উত্তর ঃ ১.১. ১৯০১ ১.২. ১৯৩৬ ১.৩. উদ্ভিজ্জকে ১.৪. বড় হাতের ১.৫. ৫টি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। কোপেনের জলবায়ুর শ্রেণী বিভাগ দেখান?

২। কোপেনের জলবায়ুর শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি কি?

রচনা মূলক প্রশ্ন

১। কোপেনের মতানুসারে জলবায়ুর শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করুন।

পাঠ- ১০.২ ঃ নিরক্ষীয় জলবায়ু

এই পাঠ শেষে আপনি—

- নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল সম্পর্কে ধারণা পাবেন এবং
- নিরক্ষীয় জলবায়ুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন, তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, মাটি, উদ্ভিদজ্জ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

নিরক্ষীয় জলবায়ু ঃ নিরক্ষরেখার আশেপাশের অঞ্চল সমূহে অত্যধিক আর্দ্রতার কারনে যে ভ্যাপসা গরম আবহাওয়া সারা বৎসর বিরাজ করে তাহাকে নিরক্ষীয় জলবায়ু বলে। আর পৃথিবীর যে অঞ্চলে নিরক্ষীয় জলবায়ু বিরাজ করে সেই অঞ্চলকে নিক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল বলা হয়।

নিরক্ষীয় জলবায়ু কাকে বলে?

চিত্র ১০.২.১ ঃ নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল

ক) অবস্থান (Location) ঃ প্রধানতঃ নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে ৫° অক্ষাংশের মধ্যে নিরক্ষীয় অঞ্চল অবস্থিত। তবে কোথাও কোথাও নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে ১০° অক্ষাংশ পর্যন্ত এই অঞ্চলের বিস্তৃতি দেখা যায়। পৃথিবীর মধ্যভাগে বিষুবরেখার আশে পাশের ৯৬৫ কি.মি. জুড়ে নিরক্ষীয় জলবায়ু দেখা যায়। সূর্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নের ফলে এ জলবায়ু অঞ্চলে দুইবার মাত্রাধিক্য তাপমাত্রা লক্ষ্য করা যায়।

খ) অঞ্চল ও দেশসমূহ (Region and Countries) ঃ বিশ্বের নিম্নোক্ত অঞ্চলের দেশসমূহে নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল দেখা যায়। যথা–

১. **দক্ষিণ আমেরিকা ঃ** দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর পূর্ব উপকূল। আমাজান নদীর অববাহিকা, ইকুয়েড়র, কলম্বিয়ার দক্ষিণাংশ এবং পেরুর উত্তর পশ্চিমাঞ্চল।

২. **মধ্য আমেরিকা ঃ** মধ্য আমেরিকার পূর্ব উপকূলের পানামা, নিকারাগুয়া, হুণ্ডুরাস, কোস্টারিকা।

৩. **আফ্রিকা ঃ** কঙ্গো নদীর অববাহিকা ও গিনি উপকূলীয় অঞ্চল।

৪. **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঃ** মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, ফিলিপাইনের দক্ষিণ দীপপুঞ্জাঞ্চল।

৫. **নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ুর বর্ণনা ঃ** নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল উষ্ণ জলবায়ু। এই অঞ্চলের জলবায়ু প্রধানতঃ উষ্ণ ও আর্দ্র। এইখানে সবসময় জলবায়ু একই রকম থাকে। দিন রাত্রির মধ্যে তেমন পার্থক্য নাই। ঋতুর পরিবর্তন এই অঞ্চলে দেখা যায় না। ফলে সবসময় গ্রীষ্মঋতু পরিলক্ষিত হয়। দিনের প্রথমদিকে জলবায়ু আরামদায়ক

হইলেও সূর্যতাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বিকালের দিকে রোজই ঝড় ও বিদ্যুৎসহ প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। মধ্যরাত্র হইতে কিছুটা শীত অনুভূত হইলেও এই অঞ্চলে কখনও শীতকাল আসে না।

নিরক্ষরেখার উপর সারা বছর সূর্য খাড়াভাবে কিরণ দেয় বলিয়া গরম বেশী পড়ে এবং দিনরাত্রি সব সমান থাকে। নিরক্ষীয় শান্ত বলয়ের প্রভাবে এই অঞ্চলের জলবায়ুতে সারা বৎসর নিম্নচাপ বিরাজ করে। মোটকথা নিরক্ষীয় অঞ্চলে বারোমাস একই ধরণের জলবায়ু বিদ্যমান থাকে।

নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের বিস্তৃতি কত ডিগ্রী?

নিম্নে নিরক্ষীয় জলবায়ুর সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলঃ

- নিরক্ষরেখার নিকটে অবস্থিত বলিয়া এই অঞ্চলে সূর্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হয়।
- এই অঞ্চলে দিনরাত্রি সমান।
- জলবায়ু গত কারণে ঋতু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।
- বার্ষিক গড় উষ্ণতা ২৫°-২৭° সে: এর কম বা বেশী হয় না।
- উষ্ণতার তারতম্য ভেদে প্রতি ৯১ মিটারে উষ্ণতা ১৭° সেঃ হিসাবে হ্রাস পায়।
- সারা বৎসর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া তারতম্যের তীব্রতা কম অনুভূত হয়।
- নিম্নচাপ বলয়ের প্রভাবে সবসময় নিম্নচাপ বিরাজমান থাকে।
- সমুদ্রের জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ুর উর্ধ্বগতি বৃষ্টিপাতের অন্যতম কারণ।
- সমুদ্র উপকুলীয় এলাকার জলবায়ু আরামদায়ক হইলেও অভ্যন্তর ভাগের ভ্যাপসা ও গুমট জলবায়ু অসাস্থ্যকর এর মানুষের বাসের পক্ষে আরামদায়ক নয়।

নিরক্ষীয় জলবায়ুর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন?

তাপমাত্রা ঃ এ অঞ্চলে সূর্য সর্বত্র লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং দিনের দৈর্ঘ্য সারা বছর প্রায় একই থাকে। ফলে সারা বছর উচ্চ তাপমাত্রা থাকে। মাসিক তাপমাত্রার ব্যবধান খুব কম। গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ২১°-২৭° সেলসিয়াস। স্থলভাগে বার্ষিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য ৫° সেলসিয়াসের কম। দিনে বায়ুর তাপমাত্রা অধিক না কিন্তু আর্দ্রতা ও অত্যধিক সূর্যালোকের কারণে স্থানীয় আবহাওয়া অসহনীয় মনে হয়। শুধুমাত্র মেঘাচ্ছন্নতার কারণে তাপমাত্রার পার্থক্য হয়।

বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহ ঃ অত্যধিক উত্তাপের জন্য এ অঞ্চলে একটি স্থায়ী নিম্নচাপ অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে উপক্রান্তীয় উষ্ণ চাপ বলয়গুলো হতে আয়নবায়ু এ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় এবং এই অঞ্চলে এসে অত্যন্ত উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। কাজেই এই অঞ্চলে সবসময় শান্ত বলয় বিরাজ করে। এই অঞ্চলে আনুভূমিকভাবে তাপমাত্রার পরিবর্তনের হার খুব কম তাই বায়ুচাপের পরিবর্তনও কম। এর ফলে অনুভূমিক ভাবে বায়ু প্রবাহের বেগ ও কম। অত্যধিক তাপের জন্য বায়ুতে সবসময় পরিচলন প্রক্রিয়া চলে। এর ফলে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিন-পূর্ব আয়ন বায়ু এখানে এসে উপরে উঠে যায়। এই উর্ধ্বগামী উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু দ্রুত উপরে উঠে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

বৃষ্টিপাত ঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলে স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ বেশী হওয়ায় এবং প্রচন্ড উত্তাপ থাকায় সারাদিনই সূর্যের উত্তাপে জল বাষ্পীভূত হয়ে উপরে উঠতে থাকে। উপরে উঠে প্রসারিত ও শীতল হয়ে বিকেলের দিকে পরিচলন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে।

এই অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান ১৭০০ মিলিমিটার হতে ২৫০০ মিলিমিটারের মত। প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি পাত হয় তাই কোন শুষ্ক ঋতু নাই।

নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে কোন প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত হয়?

উদ্ভিজ্জ ঃ সারা বৎসর ধরে প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং অত্যন্ত তাপের জন্য এই অঞ্চলে প্রশস্ত পত্রযুক্ত চিরহরিৎ অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই বন এত গভীর যে সূর্যালোকও প্রবেশ করতে পারেনা। এই কারণে সূর্যালোক পাবার জন্য গাছগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে গাছগুলি উঁচু হয়। এই অঞ্চলের গাছ হচ্ছে সেগুন, মেহগনি, আবলুস, রোজউড, রবার, চন্দন প্রভৃতি।

মাটি ঃ এ জলবায়ু অঞ্চলের বেশীর ভাগ মাটিই কম উর্বর। প্রচুর বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের কারণে মাটি দ্রুত ক্ষয় হয় এবং ধৌত প্রক্রিয়ার ফলে মাটি থেকে খনিজ পদার্থ অপসারিত হয়। কেবলমাত্র অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে ক্লোমাইট মিলে এই মাটির রং

লাল হয়। তবে কোথাও কোথাও চুন জাতীয় মৃত্তিকা এবং আগ্নেয় মৃত্তিকা পাওয়া যায়। এরা বেশ উর্বর বলে চাষের পক্ষে খুবই উপযোগী।

নিরক্ষীয় অঞ্চলের উর্বর মৃত্তিকা কি প্রকৃতির?

পাঠসংক্ষেপ

এই পাঠের মাধ্যমে আমরা বিশ্বের জলবায়ু অঞ্চলের মধ্যের নিরক্ষীয় জলবায়ু সম্পর্কে জানলাম। এই জলবায়ু অঞ্চলের তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ একটি ধারণা হল। নিরক্ষীয় জলবায়ু নিরক্ষরেখার আশে পাশের অঞ্চলে দেখা যায়। এ অঞ্চলের অত্যধিক তাপমাত্রা, প্রচুর বৃষ্টিপাত, পরিচলন বায়ুপ্রবাহ, অনুর্বর মৃত্তিকা এবং প্রশস্ত পত্রুযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। হ্যাঁ অথবা না উত্তর দিন।

১.১ নিরক্ষরেখার নিকটে অবস্থিত বলে এই অঞ্চলে সূর্যকিরণ তীর্যক ভাবে পতিত হয়।
হ্যাঁ/না

১.২ নিরক্ষীয় অঞ্চলে দিন রাত্রি সমান।
হ্যাঁ/না

১.৩ নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে গ্রীস্মকালে বৃষ্টিপাত হয়।
হ্যাঁ/না

১.৪ নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে খাটো বৃক্ষ দেখা যায় বেশী।
হ্যাঁ/না

১.৫ নিরক্ষীয় অঞ্চলের মাটি অত্যন্ত উর্বর।
হ্যাঁ/না

উত্তর ঃ ১.১. না   ১.২. হ্যাঁ   ১.৩. না   ১.৪. না   ১.৫. না

২। **শূণ্যস্থান পূরণ করুন**

২.১ পৃথিবীর মধ্যভাগে বিষুবরেখার আশেপাশের __________ অক্ষাংশ জুড়ে নিরক্ষীয় জলবায়ু দেখা যায়।

২.২ নিরক্ষীয় জলবায়ুর বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ______________ সেলসিয়াস।

২.৩ নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা বছর অধিক তাপমাত্রা থাকায় এখানে সবসময় _ চাপ বর্তমান থাকে।

২.৪ নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা বছর ১৭০০ মিলিমিটার থেকে ___________ মিলিমিটারের মত হয়।

২.৫ নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা বছর ধরে প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং অত্যন্ত তাপের জন্য এ অঞ্চলে প্রশস্ত পত্রযুক্ত ________ অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে।

উত্তর ঃ ২.১. ৯৬৫ কি.মি.   ২.২. ২৫°-২৭°   ২.৩. নিম্ন   ২.৪. ২৫০০   ২.৫. চিরহরিৎ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. নিরক্ষীয় অঞ্চলের অবস্থান কোথায়?

২. নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত ৪টি মহাদেশের অন্তর্ভূক্ত ৪টি দেশের নাম লিখুন।

৩. নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ু কেমন এক লাইনে লিখুন।

৪. নিরক্ষীয় অঞ্চলে স্থলভাগে বার্ষিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য কত ডিগ্রি সেলসিয়াস?

৫. নিরক্ষিয় অঞ্চলের চারটি গাছের নাম লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের বর্ণনা দিন।

পাঠ- ১০.৩ ঃ ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু (Topical Monsoon Climate)

এই পাঠ শেষে আপনি—

- মৌসুমি বায়ু কি তা বলতে পারবেন;
- মৌসুমি বায়ুর বৈশিষ্ট্য জানতে পারবেন এবং
- মৌসুমি বায়ুর বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি সম্পর্কে ধানা পাবেন।

আরবি ভাষার 'মওসুম' শব্দের অর্থ ঋতু। সুতরাং ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে যে বায়ুর দিক পরিবর্তিত হয় তাকে মৌসুমী বায়ু বলে এবং যে সকল দেশের উপর দিয়ে এ বায়ু প্রবাহিত হয় সে সব দেশকে মৌসুমি জলবায়ু সম্পন্ন দেশ বলে। কর্কট ও মকরক্রান্তির নিকটবর্তী অঞ্চলে এর বিস্তৃতি ও প্রভাব সর্বাধিক বলে এ জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুও বলা হয়।

মৌসুমি বায়ু কাকে বলে?

মৌসুমি বায়ুর অবস্থান

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মায়ানমার (বার্মা) লাওস্ কমপুচিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ ও পূর্ব চীন, দক্ষিণ জাপান প্রভৃতি দেশ এ জলবায়ুর অন্তর্গত। এছাড়া ক্যারিবিয়ান সাগর ও মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহ, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপসমূহের কিয়দংশ, ব্রাজিলের পূর্বাংশ, পূর্ব আফ্রিকা, সালাগাছি দ্বীপ এবং উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় ও এ জলবায়ু দেখা যায় (চিত্র ১০.৩.১)।

উপমহাদেশের কোন অঞ্চলে মৌসুমি বায়ু দেখা যায়?

চিত্র ১০.৩.১. ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল

মৌসুমি বায়ুর বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব

এ জলবায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বায়ুর গতি ও দিক পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে বায়ু যে দিকে যায় শীতকালে তার বিপরীত দিকে যায়। ফলে গ্রীষ্মকাল বৃষ্টিবহুল এবং শীতকাল বৃষ্টিহীন থাকে।

সাধারণত: বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, তাপ ও বৃষ্টিপাতের দ্বারা জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা হয়।

মৌসুমি বায়ু অঞ্চলের বায়ুচাপ ও বায়ুপ্রবাহ

১। গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুচাপ ও প্রবাহ: - ঋতুভেদে বায়ুর চাপের তারতম্যের জন্য মৌসুমি বায়ুর উৎপত্তি হয়। উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালে সূর্য কর্কটক্রান্তীর ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এর ফলে কর্কটক্রান্তী অঞ্চলের অন্তর্গত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উত্তর-পশ্চিম ভারত, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে স্থলভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে বায়ুর নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। এই সময়ে বায়ুর বৈশিষ্ট্য মতে দক্ষিণ গোলার্ধে উচ্চচাপ বলয় থেকে আসা দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে এশিয়া মহাদেশের নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবলবেগে ছুটে যায়। এই বায়ুকে উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মের মৌসুমি বায়ু বলে (চিত্র-১০.৩.২)।

উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালে সূর্য কোথায় লম্বভাবে কিরণ দেয়?

চিত্র ১০.৩.২ ঃ গ্রীষ্মকালীন (জুলাই) মাসের মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ

নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ফেরেলের সূত্র অনুসারে দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ুর গতি বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই জন্য গ্রীষ্মের এই মৌসমি বায়ুকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বলে।

গ্রীষ্মকালে মৌসুমি বায়ু সমূদ্রের ওপর দিয়ে আসে বলে এতে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকে। আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরীয় এই দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে আরব সাগরীয় শাখা পাকিস্তান ও পশ্চিম ভারতে এবং বঙ্গোপসাগরীয় শাখা পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, আসাম এবং মায়ানমারে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

২। শীতকালীন মৌসুমি বায়ুচাপ ও বায়ু প্রবাহ - শীতকালে সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তির নিকট অবস্থান করায় সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এই সময় উত্তর গোলার্ধের স্থলভাগ অত্যন্ত শীতল হওয়ায় সেখানে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। এর ফলে স্থলভাগের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু দক্ষিণের নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসে বলে একে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু বলে (চিত্র- ১০.৩.৩)। স্থলভাগের উপর দিয়ে আসে তাই এই বায়ু বৃষ্টিহীন।

শীতকালীন মৌসুমি বায়ু শুষ্ক ও আদ্র কেন?

চিত্র ১০.৩.৩ ঃ শীতকালীন (জানুয়ারী) মৌসুমী বায়ু

মৌসুমি বায়ুর তাপমাত্রা

আর্দ্র গ্রীষ্মকাল ও শুষ্ক শীতকাল মৌসুমি জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ অঞ্চলে সারা বছর প্রবল উত্তাপ অনুভূত হয়। গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা গড়ে ২৭° সে. এর বেশী থাকে। সমুদ্র উপকূলে থেকে যতই স্থলভাগের অভ্যন্তরভাগে যাওয়া যায় ততই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মকালে যেখানে বৃষ্টিপাত বেশী সেখানে তাপমাত্রা বেশী বাড়তে পারে না। কিন্তু যেখানে বৃষ্টিপাত কম সেখানে তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশী। শীতকালে তাপমাত্রা গড়ে ১° সে. থেকে ২২° সে. এর মধ্যে থাকে। শীত ও গ্রীষ্মে তাপমাত্রার পার্থক্য ৫° সে. এর বেশী থাকে। অনেক সময় এই পার্থক্য ১০° সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই জলবায়ু অঞ্চলে জুলাই মাসে সবচেয়ে বেশী গরম এবং জানুয়ারী মাসে সবচেয়ে বেশী শীত পড়ে।

শীত-গ্রীষ্মে মৌসুমি জলবায়ুর অঞ্চলে তাপমাত্রার পার্থক্য কি রকম?

মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে বৃষ্টিপাত

মৌসুমি অঞ্চলের অধিকাংশ বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালে হয়ে থাকে। শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। এই অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১২৫ মি.মি. হতে ২০০ মি.মি. গ্রীষ্মকালে উত্তর গোলার্ধের স্থলভাগের। বেশী তাপের জন্য নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় এবং দক্ষিণ সমূদ্র থেকে আসা জলীয়বাষ্পপূর্ণ মৌসুমি বায়ু এখানে প্রতিহত হয় এবং ব্যাপক বৃষ্টিপাত ঘটায়। অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে বৃষ্টিপাতের তারতম্য ঘটে থাকে। সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয় পর্বতে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হয়ে। মৌসুমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত নির্দিষ্ট নিয়ম বা সময় মেনে চলে না। কোন বছর অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও বন্যা হয় আবার পরের বছর বৃষ্টির অভাবে খরা দেখা দেয়।

মৌসুমি অঞ্চলে শীত-গ্রীষ্মে বৃষ্টিপাতের তারতম্য কেমন?

উদ্ভিজ্জ ঃ শুষ্ক ও আর্দ্র উভয় ঋতু বর্তমান থাকায় এ অঞ্চলে পর্ণমোচী ও চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। বৃষ্টিপাত, ভূমির উচ্চতা প্রভৃতির তারতম্য অনুযায়ী মৌসুমি অঞ্চলকে চারটি প্রধান উদ্ভিজ্জ অঞ্চলে ভাগ করা যায়।

চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি ঃ এই অঞ্চলে ২০০ সে.মি. এর বেশী বৃষ্টিপাত হয়।

তৃণভূমি ঃ এই অঞ্চলে ৫০ সে.মি. থেকে ১০০ সে.মি. পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। তাই স্বল্প বৃষ্টিপাতের দরুন তৃণভূমি দেখা যায়।

মৃত্তিকা ঃ মৌসুমি অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তাই এখানে নদী গঠিত সমভূমি যথেষ্ট দেখা যায়। এই সমস্ত ভূমি উর্বর পলিমাটি দ্বারা গঠিত এবং কৃষি কাজের জন্য খুব উপযোগী।

খনিজ সম্পদ ঃ মৌসুমি অঞ্চল নানা রকম খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এদের মধ্যে কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনাপাথর প্রভৃতি প্রধান।

পাঠসংক্ষেপ

মৌসুমি জলবায়ুর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বায়ুর গতি এবং পরিবর্তীত হয়। অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে বায়ু যে দিকে যায় শীতকালে তার বিপরীত দিকে যায়। ফলে গ্রীষ্মকাল বৃষ্টিবহুল এবং শীতকাল বৃষ্টিহীন হয়। মৌসুমি বায়ু অঞ্চলে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের ফলে ঐ অঞ্চলের বনভূমি, উদ্ভিজ্জ, মৃত্তিকা, খনিজ সম্পদ ইত্যাদিরও পরিবর্তন হয়। তাই মৌসুমি জলবায়ু খুবই গুরুত্বপূর্ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১.১. মৌসুমি অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

১.২. মৌসুমি অঞ্চলে প্রচুর শীত অনুভূত হয়।

১.৩. মৌসুমি জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুও বলে।

১.৪. মৌসুমি অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়।

১.৫. গ্রীষ্মের মৌসুমি বায়ুকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুও বলে।

২। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

২.১. কোন দেশটি মৌসুমি অঞ্চলের মধ্যে নয়।

ক. ভারত   খ. আমেরিকা   গ. ব্রাজিল

২.২. মৌসুমি অঞ্চলের শীতকাল।

ক. বৃষ্টিহীন   খ. বৃষ্টিবহুল   গ. কোনটি নয়

২.৩. মৌসুমি অঞ্চলে গ্রীষ্মকালের গড় তাপমাত্রা

ক. ১৬° সে. এর বেশী   খ. ২৬° সে. এর বেশী   গ. ২৭° সে. এর বেশী

২.৪. মৌসুমি অঞ্চলে কোন মাসে বেশী শীত পড়ে।

ক. ডিসেম্বরে   খ. জানুয়ারীতে   গ. ফেব্রুয়ারীতে

উত্তর ঃ ২.১. খ   ২.২. ক   ২.৩. গ   ২.৪. খ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. বায়ুর গতি সম্পর্কীত ফেরেলের সূত্রটি কি?

২. উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু কাকে বলে?

৩. কোনমাসে বেশী গরম পড়ে?

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. মৌসুমি অঞ্চলের মৃত্তিকা ও উদ্ভিজ্জ সম্পর্কে লিখুন।

২. মৌসুমি অঞ্চলের বায়ুপ্রবাহে বর্ণনা দিন।

পাঠ- ১০.৪ ঃ ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভূ-মধ্যসাগরী জলবায়ু অর্ন্তগত অঞ্চল সমূহ সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- ভূ-মধ্যসাগরী জলবায়ুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন, বায়ু, উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, উদ্ভিদ প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এ জলবায়ুর বিস্তৃতি ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর উভয় গোলার্ধের ৩০° হতে ৪৫° অক্ষাংশের মধ্যে মহাদেশসমূহের পশ্চিমাংশে ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল বিস্তৃত।

অঞ্চল ও দেশসমূহ

ক) ভূ-মধ্যসাগর তীরবর্তী অঞ্চল

খ) পশ্চিম এশিয়ার তুরস্ক, লেবানন, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ইসরাইল!

গ) দক্ষিণ ইউরোপের স্পেন, পর্তুগাল, ইতালী, দক্ষিণ ফ্রান্স, আলবেনিয়া, গ্রীস, দক্ষিণ ও পশ্চিম যুগোশ্লাভিয়া;

ঘ) উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া, তিউনেসিয়া, মরক্কোর উত্তরাংশ, মিশরের উত্তরাংশ;

ঙ) ভূ-মধ্যসাগরীয় দ্বীপসমূহের সাইপ্রাস, করসিকা, আরদানীয়া, মাল্টা এ অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত;
এছাড়া-

আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার চিলির মধ্যভাগ, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এই জলবায়ুর অন্তর্গত।

চিত্র ১০.৪.১ ঃ ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল

বৈশিষ্ট্য

ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু খুবই আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যকর। এ অঞ্চলের আকাশ মেঘমুক্ত থাকে। এই জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করা হল-

ক) গ্রীস্মকাল উষ্ণ, শুষ্ক ও বৃষ্টিহীন গ্রীস্মকালীন গড় উষ্ণতা ২০° থেকে ২৮° সে.।

খ) শীতকালে এই অঞ্চলের উষ্ণতা বেশী থাকে না। শীত অনুভূত হলেও আকাশ পরিস্কার থাকে এবং তুষারপাত হয় না। শীতকালে উষ্ণতা ১০° সে. এর নীচে থাকে।

গ) শীতকালে সমুদ্র থেকে আগত প্রত্যায়ন বায়ুতে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকে বলে এ- অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

উষ্ণতা

এ জলবায়ু অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ২০°-২৮° সে. এর মধ্যে থাকে। শীতকালে এ তাপমাত্রা ১০° সে. এর নীচে থাকে। গ্রীষ্মকালে দেশের অভ্যন্তরে অধিক উষ্ণতা ও উপকূলভাগে কম উষ্ণতা পরিলক্ষিত হয়।

বৃষ্টিপাত

ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল গ্রীষ্মকাল শুষ্ক এবং শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৮ সে. মি. থেকে ৭৫ সে. মি.। সর্বত্র বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এক নয়। সমুদ্র উপকূলে বৃষ্টিপাত বেশী থাকে।

উদ্ভিজ্জ

এখানে যেহেতু শীতকালে বৃষ্টিপাত ঘটে সেহেতু বৃষ্টিবহুল শীতকালে এখানে বৃক্ষাদি জন্মে থাকে। উদ্ভিজ হচ্ছে- ওক, জলপাই, কর্ক, তুঁত, পাইন, নিম, সিডার ইত্যাদি প্রধান। এ ছাড়া কম বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলে ঝোপঝাড় জন্মে থাকে।

পাঠসংক্ষেপ

অঞ্চল ভেদে ও অক্ষাংশ ভেদে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়ামকের বিভিন্নতার কারণে স্থানভেদে জলবায়ুর ভিন্নতা দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুর মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু একটি বিশেষ ধরণের জলবায়ু যা কিনা সূর্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিনায়নের প্রভাবে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত আবহওয়ার সৃষ্টি করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ____________ ও ____________।
২. ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে শীতকাল ____________।
৩. শীতকালে ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে ____________ থেকে আগত বায়ুতে প্রচুর ____________ থাকে।
৪. গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ____________ থেকে ____________ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে।
৫. ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে ____________ বৃষ্টিপাত হয়।

উত্তর ঃ ১। শুষ্ক, বৃষ্টিহীন ২। মৃদুভাবাপন্ন ৩। সমুদ্র, জলীয়বাষ্প ৪। ২০°, ২৮° ৫। শীতকালে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অর্ন্তভূক্ত অঞ্চল ও দেশসমূহ কি?

২. ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল আবহাওয়া কেমন থাকে?

৩. ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের বৃষ্টিপাত এর বৈশিষ্ট্য কি?

৪. ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের শীতকালে প্রত্যায়ন বায়ু প্রভাব কেমন?

৫. ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ুর তিনটি বৈশিষ্ট্য দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বর্ণনা দিন।

ইউনিট ১১

বারিমন্ডল (Hydrosphere)

পাঠ- ১১.১ ঃ মহাসাগর বন্টন

এই পাঠ শেষে আপনি—

- পৃথিবীর স্থল ও জলভাগের বন্টন, জলভাগের উৎসে প্রভাব বিস্তারকারী জলচক্র এবং বিভিন্ন মহাসাগর সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

পৃথিবী পৃষ্ঠে স্থলভাগের চেয়ে পানিরাশির পরিমাণ অনেক বেশী। এর শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ পানি রাশির অন্তর্গত এবং স্থলভাগের পরিমান ২৯ শতাংশেরও কম। এই পানির আয়তন প্রায় (চিত্র) ৩৬ কোটি ২৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। ভূ-ত্বকের অবনত অংশে অবস্থিত এই বিশাল পানিরাশিকে বারিমন্ডল (Hydrosphere) বলে। সাগর-মহাসাগরের পানিরাশি ছাড়াও স্থলভাগের অন্তর্গত হ্রদ নদী-খাল-বিলের পানিও বারিমন্ডলের আওতায় পড়ে। তবে সাগর মহাসাগরের তুলনায় স্থলভাগের পানি রাশির পরিমাণ খুবই কম। এজন্য বারিমন্ডল বলতে প্রধানত সাগর মহাসাগরের পানি রাশিকে বুঝায়।

চিত্র ১১.১.১ঃ স্থল ও বারিমন্ডলের বিন্যাস

মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, হ্রদ ইত্যাদির সমন্বয়ে বারিমন্ডল গঠিত। উন্মুক্ত বিস্তৃত পানিরাশিকে মহাসাগর (Ocean), স্বল্প আয়তন বিশিষ্ট উন্মুক্ত পানিরাশিকে সাগর (Sea), তিনদিক স্থল দ্বারা বেষ্টিত পানিরাশিকে উপসাগর (Bay বা Gulf) এবং চারদিক স্থল দ্বারা বেষ্টিত ও প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট বৃহৎ পানিরাশিকে হ্রদ (Lake) বলে। এই বারিমন্ডল মানুষের পেষা ও খাদ্যাভাস এবং অন্যান্য জীবনযাত্রার উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বারিমন্ডলের গড় গভীরতা প্রায় ৩,৮১০ মিটার। এর উপরিভাগের পানি সূর্যতাপে উত্তপ্ত হয়। উষ্ণমন্ডলে সারাবছর বেশী সূর্য তাপ লাভ করে এবং নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলে ও হিমমন্ডলে সূর্য তাপের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। ফলে ক্রান্তীয় অঞ্চলের সাগর মহাসাগরের পানির উপরিভাগ বেশী উত্তপ্ত হয়। অক্ষাংশ ও গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বারিমন্ডলের পানির উষ্ণতা হ্রাস পায়। সমুদ্র পৃষ্ঠ

থেকে ৩৬৬ মিটার গভীরতা পর্যন্ত এলাকায় পানির তাপমাত্রা দ্রুতহ্রাস পায়। এরপর ২,১৯৫ মিটার গভীরতা পর্যন্ত পানির তাপমাত্রা ধীরে ধীরেহ্রাস পায়। অবশ্য সাগর তলের আরও গভীর অংশে পানির তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তীত থাকে।

অক্ষাংশভেদে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রার তারতম্য হওয়ায় এবং শীতল ও উষ্ণ সমূদ্র স্রোত বর্তমান থাকায় বায়ুমন্ডলের নিচের অংশে উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি করে। এর ফলে উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। সমূদ্রের উপরিভাগ উত্তপ্ত হলে পানি বাষ্পীভূত হয়ে উর্ধগামী হয় ও মেঘে পরিণত হয়ে বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে। হিমমন্ডলে বৃষ্টিপাতের পরিবর্তে তুষারপাত হয়। এমন কি নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলেও গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত এবং শীতকালে তুষারপাত হয়।

বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত হওয়ার ফলে ঝর্না, নদী, প্রভৃতির প্রবাহ অব্যাহত থাকে। এই পানি প্রবাহিত হয়ে আবার সাগরে ফিরে আসে। ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠে একটি পানি চক্রের সৃষ্টি হয় (Water Cycle)।

চিত্র ১১.১.২ ঃ পানিচক্র

বৃষ্টিপাতের ফলে পৃথিবীর মাটি উর্বর হয়। ফলে উদ্ভিদ ও প্রানীর বৃদ্ধির সহায়ক হয়। মানুষ চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদন করে। নদী পথে ও সাগর বক্ষের উপর দিয়ে পরিবহন ও ব্যবসা-বানিজ্যের সুবিধা হয়। ফলে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়, সভ্যতা বিকাশ লাভ করে। সুতরাং বারিমন্ডল পৃথিবী পৃষ্ঠের আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করছে এবং মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা নির্ধারণ করছে।

পানি চক্রের উপকারিতা কি কি?

এবার আমরা পৃথিবীর মহাসাগর গুলি সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে চেষ্টা করব ঃ

১। প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean) ঃ এ মহাসাগরের পশ্চিমে এশিয়া মহাদেশ এবং পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা। পাঁচটি মহাসাগরের মধ্যে এটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এর আয়তন ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গ কি.মি.। এর গড় গভীরতা প্রায় ৪,২৬৭ মিটার এবং সর্বাধিক গভীরতা ১০.৭৯ কি.মি.। এ মহাসাগর ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থান জুড়ে

আছে। বিখ্যাত নাবিক ম্যাগেলান (Magellan) এ মহাসাগরে প্রবেশকালে কোন প্রকার ঝড় তুফান বা তরঙ্গের আস্ফালন দেখেননি। এ কারণে তিনি এর নাম দেন প্রশান্ত মহাসাগর (Paific Ocian)।

এ মহাসাগরের উপকূল আটলান্টিক মহাসাগরের উপকুল অপেক্ষা অভগ্ন। এটি দক্ষিণ দিকে প্রশস্ত, উত্তর দিকে ক্রমেই সংকীর্ণ। বেরিং প্রণালীর মাধ্যমে এটি উত্তর মহাসাগরের সাথে সংযুক্ত আছে। নিরক্ষরেখা বরাবর এটি সবচেয়ে বেশী প্রশস্ত (১৬ হাজার কি. মি.)। প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকুলে অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশে ছোট বড় বহু দ্বীপ অবস্থিত। এ দ্বীপমালা ও মূল মহাসাগরের মধ্যে কতকগুলো সাগর আছে। তন্মধ্যে ওখটস্ক সাগর, জাপান সাগর, পীত সাগর, চীন সাগর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২। আটলান্টিক মহাসাগর (Atlantic Ocean) ঃ আয়তনে প্রশান্ত মহাসাগরের অর্ধেক হলেও গুরুত্বের দিক দিয়ে আটলান্টিক সকল মহাসাগরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এর পূর্বতীরে ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং পশ্চিম তীরে আমেরিকা। এর আয়তন প্রায় ৮ কোটি ১৫ লক্ষ বর্গ কি. মি.। এর উভয় তীর খুবই উর্বর, সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী বহুদেশ ও বড় বড় বন্দর অবস্থিত। এর সীমারেখা খুবই ভগ্ন। দক্ষিণে এটি খুবই প্রশস্ত। নিরক্ষীয় অঞ্চলে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা বরাবর কিছু সংকীর্ণ। পরে উত্তরে আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে এটি আবার বেশ প্রশস্ত।

৩। ভারত মহাসাগর (Indian Ocean) ঃ ভারত মহাসাগর দক্ষিণ দিকে প্রশস্ত ও উত্তর দিকে ক্রমেই সংকীর্ণ। উত্তরে এটি বেশী দূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ নয়। এর আয়তন প্রায় ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ বর্গ কি.মি. । গড় গভীরতা ৩,৯৬২ মিটার এবং চরম গভীরতা ৬,৯৯৮ মিটার। এ মহাসাগরের উত্তর অঞ্চলে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। পরস্য উপসাগর ও লোহিত সাগর আরব সাগরের অংশ বিশেষ। ভারত মহাসাগরের পূর্বে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিমে মাদাগাস্কার দ্বীপ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

৪। উত্তর মহাসাগর (Arctic Ocean) ঃ এ মহাসাগর সুমেরুর চারদিকে অবস্থিত। এর প্রায় সমস্ত অংশই সুমেরু বৃত্তের মধ্যে রয়েছে। এটি প্রায় বার মাসই বরফে ঢাকা থাকে। এ অঞ্চল হতে বহু হিমশৈল ভাসতে ভাসতে দক্ষিণের উষ্ণতর সমূদ্রে প্রবেশ করে। এ মহাসাগরের মোট আয়তন প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গ কি. মি.। এর গড় গভীরতা ১,৮২৩ মিটার এবং সর্বাধিক গভীরতা ৫,৪৪০ মিটার।

৫। দক্ষিণ মহাসাগর (Southern or Antarctic Ocean) ঃ এ মহাসাগরটি এন্টার্কটিকা মহাসাগরের উত্তরে অবস্থিত। এর কিছু অংশ মেরুবৃত্তের ভিতর এবং অল্প সামান্য অংশ মেরুবৃত্তের বাইরে অবস্থিত। এটি বার মাসই বরফে ঢাকা থাকা। অনেক সময় এ মহাসাগর হতে হিমশৈল ভাসতে ভাসতে উষ্ণ মহাসাগরে প্রবেশ করে থাকে। আয়তনে এটি প্রায় ১ কোটি ৪৭ লক্ষ বর্গ কি. মি.। গড় গভীরতা ১,৪১৯ মিটার এবং চরম গভীরতা ৫৭৪ কি. মি.।

পাঠসংক্ষেপ

পৃথিবী গ্যাসীয় অবস্থা হতে বর্তমান কঠিন অবস্থায় উপনীত হওয়ার সময় ভূ-পৃষ্ঠ অসমানভাবে সংকুচিত হয়েছে বলে তার কতক অংশ উঁচু এবং কতক অংশ নিচু। ভূ-পৃষ্ঠের এ উঁচ্চু অংশসমূহকে স্থলমন্ডল (Land Masses) এবং পানি সঞ্চিত নিচু অংশ সমূহকে বারিমন্ডল (Hydrosphere) বলে। আয়তন, গভীরতা প্রভৃতির পার্থক্যের জন্য বারিমন্ডলকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়; (ক) মহাসাগর (খ) সাগর (গ) নদী ও (ঘ).হ্রদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১

১। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন

১.১) বারিমন্ডল কয় ভাগে বিভক্ত ?

ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ভাগে ঘ. ৫

১.২) প্রশান্ত মহাসাগরের নাম করণ করেন

ক. কুক খ. ম্যাগিলান
গ. রবার্টহুক ঘ. জেমস কুক

১.৩) আটলান্টিক মহাসাগরের আয়তন

ক. ৭.৫ কোটি ব: কি. মি. খ. ৮.৫ কোটি ব: কি. মি.
গ. ৯.৫ কোটি ব:কি. মি. ঘ. ১০ কোটি ব.কি.মি.

১.৪) ভারত সাগরের গড় গভীরতা

ক. ২০০০ মি খ. ৩৯৬২ মি.
গ. ৪০০০ মি. ঘ. ৫০০০ মি.

উত্তর ঃ ১.১) গ ১.২) খ ১.৩) খ ১.৪) খ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. বারিমন্ডল কি?
২. জলমন্ডলকে কত ভাগে ভাগ করা হয় এবং কি কি?
৩. প্রশান্ত মহাসাগর এর আয়তন কত?
৪. আটলান্টিক মহাসাগরের আয়তন কত?
৫. ভারত মহাসাগরের আয়তন কত?
৬. পানিচক্র কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বারি মন্ডল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. পৃথিবীতে কয়টি মহাসাগর আছে? এ গুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

পাঠ- ১১.২ ঃ মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- সমুদ্রের তলদেশের ভূমিরূপ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

সমুদ্রের পানির নীচে সমুদ্রের তলদেশে যে ভূমিরূপ বা প্রাকৃতিক অবস্থা বা প্রকৃতি পরিদৃষ্ট হয় তাকে সমুদ্রের তলদেশের ভূ-প্রকৃতি বলে। সমুদ্রের তলদেশের বিভিন্ন গভীরতার মধ্যে যথেষ্ঠ পার্থক্য বিদ্যমান। মহাসাগরের পানি রাশিকে শুকিয়ে দিলে উহার শুষ্ক তলদেশের যে অবয়ব দৃষ্টি গোচর হবে তাহা স্থলভাগের ভূমিরূপের তুলনায় বৈচিত্রময় মনে হবে। সমুদ্র তলদেশের প্রাকৃতিক অবস্থার কথা ধীরে ধীরে জানা গেছে।

সমুদ্রের তলদেশ সংক্রান্ত গবেষণা

১৯৩০ সালের পর থেকে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও পানির তলদেশের ছবি নেয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার এবং ইকো সাউন্ড (Echo-Sounding) পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন সমূদ্র তলদেশের তথ্য সংগ্রহে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বর্তমানেও এর উপর যথেষ্ট অনুসন্ধান ও পরিমাপ কার্য চালানো হচ্ছে।

সামুদ্রিক গবেষনার স্থায়ী আর্ন্তজাতিক সমিতি কোপেন-হেগেনে অবস্থিত। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে স্যার জন মারে, নানসেন, আমুনসেন প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ অনুসন্ধান চালান। এক্ষেত্রে টাসকারোরা, সিটিয়র প্রভৃতি জাহাজ অংশগ্রহন করে। এই অভিযানের তথ্যই গ্রহনযোগ্য বলে ধরা হয়।

মহাসাগরের তলদেশ

মহাসাগরগুলো মহাদেশগুলোকে ঘিরে রয়েছে। দেখলে মনে হয় যেন এক একটি দ্বীপ। এসব মহাদেশ হঠাৎ খাড়াভাবে নেমে যায়নি সমুদ্রে। মহাদেশ এর সীমা সমুদ্রের তটরেখায় গিয়ে হঠাৎ করে শেষ হয়ে যায়নি, মহাদেশের উপকূলভাগ ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে সাগরের পানিরাশির মধ্যে নেমে গেছে। মহাসাগরের তলদেশ থালার মত সমতল নয়। এর গভীরতা যতই বাড়তে থাকে, ততই এর আয়তনেও ভিন্নতা দেখা যায়। এই গভীরতা ও আয়তন এর পার্থক্য সমুদ্রের তলদেশে নানারূপ ভূ-প্রকৃতির সৃষ্টি করে। এই ভূ-প্রকৃতি স্থলের মতই উঁচু নিচু ও অসমতল। সমুদ্রতলে পাহাড়, পর্বত, আগ্নেয়গিরি, মালভূমি, সমভূমি, গভীরখাত প্রভৃতি বর্তমান রয়েছে (চিত্র ১১.২.১)। তবে স্থলভাগের তুলনায় সমুদ্র তলদেশে বন্ধুরতা অনেক কম।

চিত্র ১১.২.১ ঃ মহাসাগরের তলদেশের ভূ-প্রকৃতি

গভীরতা অনুসারে মহাসাগরের বিভিন্ন অংশকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় ছক (১১.২.১)।

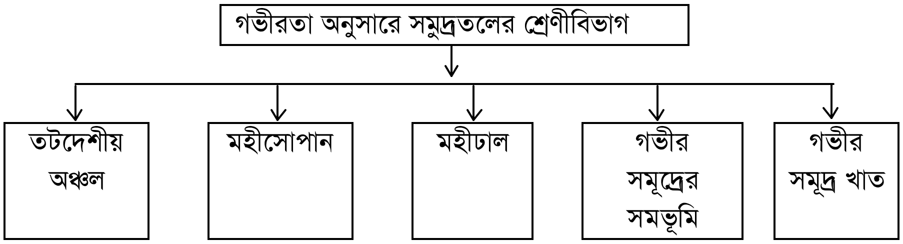

১। তটদেশীয় অঞ্চল (Littoral zone) ঃ জোয়ারের সময় সমুদ্র তীরের যে পর্যন্ত সমুদ্রের পানি উঠে সেই স্থান থেকে ভাঁটার সময় পানি যে পর্যন্ত নামে সেই স্থান পর্যন্ত অঞ্চলকে তটদেশীয় অঞ্চল বলে।

বৈশিষ্ট্য

- স্থল থেকে সাগর পর্যন্ত এই অঞ্চল সাধারণত ৩ কিলোমিটার প্রশস্ত।
- এই অঞ্চলের মোট আয়তন ১,৫৫,৪০০ বর্গ কিলোমিটার (৬০,০০০ বর্গ মাইল)। একে সমুদ্রতট বলা হয় (চিত্র ১১.২.১)।

ঝিনুক অঞ্চল (Neritic zone) ঃ গ্রীক শব্দ Neritos থেকে Neritic শব্দের উৎপত্তি। Neritos অর্থ ঝিনুক। ভাঁটার সময়ের পানিরেখা থেকে আরম্ভ করে মহীসোপান যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে তার আগ পর্যন্ত এই অঞ্চলের বিস্তৃতি। এটি তটদেশীয় অঞ্চলের অন্তর্গত।

বৈশিষ্ট্য

- এই অঞ্চলের মোট আয়তন ১.৬০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার (১ কোটি বর্গমাইল)
- এখানে ঢেউ এর কাজ এবং পলির বিন্যাস সুস্পষ্ট।

২। মহীসোপান (Continental zone) ঃ মহাদেশের কিয়দংশ উপকূল থেকে সাগরের পানির মধ্যে বিস্তৃত থাকে। মহাদেশের এই ক্রমনিম্ন স্বল্প গভীর নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে।

বৈশিষ্ট্য

- এখানকার সমুদ্রের গভীরতা সাধারণত ১৮৩ মিটার (১০০ ফ্যাদম বা ৬০০ ফুট) এর বেশি হয় না।
- এই অংশ ধীরে ধীরে ১° অপেক্ষা কম কৌনিক ভাবে সমুদ্রে ঢালু হয়ে যায়। খালি চোখে এ ঢাল বোঝা যায় না।
- মহাদেশের উপকূলে মালভূমি, পর্বত প্রভৃতি উচ্চভূমি থাকলে মহীসোপান সংকীর্ন এবং নিকটস্থ সাগর খুব গভীর হয়। আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় পুরোটা মালভূমি বলে এর উপকূলের আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের মহীসোপান অত্যন্ত সংকীর্ণ।
- মহাদেশের উপকূলে সমভূমি থাকলে মহাসোপান বিস্তৃত হয়। যেমন : ইউরেশিয়ার উত্তরে বিস্তৃত সমভূমি থাকায় উত্তর মহাসাগরের মহীসোপান স্থানে স্থানে ১,২৮৭ কিলোমিটার (৮০০ মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত।
- ভূ-আলোড়নের প্রভাবে স্থলভাগের উপকূল অঞ্চল নিমজ্জিত হওয়ায় অথবা সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মহাসোপানের সৃষ্টি।
- উপকূলে তরঙ্গের ক্ষয়ক্রিয়া মহীসোপান গঠনে সহায়তা করে।
- স্থলভাগের পাথর, কাঁদা, কাঁকর বিভিন্ন প্রভাবক দ্বারা বাহিত হয়ে সঞ্চয়নের মাধ্যমে কালক্রমে পাললিক শিলার সৃষ্টি করে।
- মোট প্রাপ্ত খাদের বেশীর ভাগ এখানে পাওয়া যায়।
- ৯০% সামুদ্রিক খনিজ এখানে পাওয়া যায়।

৩। মহীঢাল (Continental Slope)

মহীসোপানের শেষসীমা নিমজ্জিত ভূমি হঠাৎ বেশি ঢালু হয়ে (Steeper slope) গভীর সমুদ্রে নেমে যায়। এই অধিক ঢাল বিশিষ্ট নিমজ্জিত ভূ-ভাগকে মহীঢাল বলে।

বৈশিষ্ট্য

- মহীঢালের শেষ প্রান্তে সমুদ্রের গভীরতা ১৮৩ মিটার (৬০০ ফুট) থেকে ৩,৬৬০ মিটার (১২,০০০ ফুট)।
- মহীঢাল খাড়া কিন্তু চওড়া কম।
- এটি গড়ে ১৬ কিলোমিটার থেকে ৩৫ কিলোমিটার চওড়া হয়ে থাকে।
- মহীঢালের উপরিভাগ সমান নয়। উপরিভাগে ক্যানিয়ন ও ভি-আকৃতির উপত্যকা দেখা যায়।
- এখানে অসংখ্য অন্তঃসাগরীয় গিরিখাত থাকায় এটি খুবই বন্ধুর।
- মহাসাগরগুলোর এরূপ গভীর অংশে জীবজন্তুর দেহাবশেষ ও অন্যান্য পলি জমা হয়।

৪। গভীর সমুদ্রের সমভূমি (Abyssal plain) মহীঢালের শেষ প্রান্ত থেকে গভীর সমুদ্রের তলদেশ প্রায় সমতল। তবে এই বিস্তির্ণ অংশ একেবারে থালার মত সমতল নয়।

বৈশিষ্ট্য

- গভীর সমুদ্র তলে মাঝে মাঝে নিমগ্ন মালভূমি, দীর্ঘ অথচ কম উচ্চতা সম্পন্ন পর্বত শ্রেণী এবং আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এই আগ্নেয়গিরির চুড়া কখনো পানির উপরে দ্বীপ হিসেবে দেখা যায়।
- এই অঞ্চলের গভীরতা সাধারণত ৩,৬৬০ মিটার থেকে ৫,৪৯০ মিটার (১২,০০০ ফুট থেকে ১৮,০০০ ফুট)
- গভীর সমুদ্রের সমভূমির আয়তন ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ
- সমুদ্রের এই অংশে পানি, জৈব ও অজৈব পদার্থের কনা, আগ্নেয়গিরির লাভা ও ভস্ম প্রভৃতি স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে পাললিক শিলার সৃষ্টি করেছে।

৫। গভীর সমুদ্রখাত (Trough Trenches)

গভীর সমুদ্রের সমভূমিতে মাঝে মাঝে গভীর খাত বিদ্যমান থাকে।

বৈশিষ্ট্য

- এই সমুদ্র খাত অল্প জায়গা নিয়ে থাকে কিন্তু এদের গভীরতা বেশী থাকে।
- সামুদ্রিক ও মহাদেশীয় খাতের সংস্পর্সে সমুদ্র খাতের উদ্ভব হয়। তাই সমুদ্রখাতগুলো সমুদ্রতলের প্রান্তভাগে এবং আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলেই বেশি দেখতে পাওয়া যায়।
- খাতগুলো অপ্রশস্ত ও খাড়া ঢাল বিশিষ্ট।
- খাতগুলোর গড় গভীরতা ৯৭০৬.২ মিটার (৩১৮৪৪ ফুট)

কিছু উল্লেখযোগ্য খাত হচ্ছে -

প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের পশ্চিম প্রান্তে জাপানের অদূরে টাস্কারোবা খাত ৮,৫১৮ মিটার (২৭,৯৪৬ ফুট); ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অদূরে মিন্ডানাও খাত ১০৭৯৭ মিটার (৩৫৪২৩ ফুট) এবং পূর্ব প্রান্তে পেরুর অদূরে আটাকামা খাত ৭৬৪০ মিটার (২৫০৬ ফুট), ভারত মহাসাগরের পূর্ব তীরের সুভাখাত ৭,০০৩ মিটার (২২,৯৬০ ফুট), আটলান্টিক মহাসাগরের পোর্টারিকো খাত ৮,৫৪০ মিটার (২৮,০০০ ফুট) উল্লেখযোগ্য।

পাঠসংক্ষেপ

মহাসাগর ও সাগরগুলো মহাদেশকে ঘিরে থাকায় মহাদেশগুলো দ্বীপে পরিণত হয়েছে। এইসব মহাদেশগুলোর প্রান্তসীমা হঠাৎ করে সাগরের পাড়ে এসে শেষ হয়ে যায়নি। এর একটি ধারাবাহিকতা আছে। এর ফলশ্রুতিতে সমুদ্রের উপকূল থেকে গভীর সমুদ্র পর্যন্ত একটি ভূমিরূপ গড়ে উঠেছে। এই ভূমিরূপ মহাদেশের ভূমিরূপের তুলনায় কম বন্ধুর হলেও মহাসাগরের তলদেশে পাহাড়, পর্বত, আগ্নেয়গিরি মালভূমি, সমভূমি, গভীর খাত প্রভৃতি রয়েছে। গভীরতার ভিন্নতায় মহাসাগরের বিভিন্ন অংশকে তটদেশীয় অঞ্চল, মহীসোপান, মহীঢাল, গভীর সমুদ্রের সমভূমি ও গভীর সমুদ্র খাত এই পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন বিখ্যাত অনুসন্ধানকারী গবেষকগণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন

১.১ স্থলভাগের তুলনায় সমুদ্র তলদেশের বন্ধুরতা অনেক ______________________।

১.২ গভীরতা অনুসারে মহাসাগরের বিভিন্ন অংশকে __________________ ভাগে ভাগ করা হয়।

১.৩ তটদেশীয় অঞ্চল স্থল থেকে সাগর পর্যন্ত সাধারণত ______________ কিলোমিটার প্রস্থে।

১.৪ মহাদেশের ক্রমনিম্ন স্বল্প গভীর নিমজ্জিত অংশকে ________________ বলে।

১.৫ অধীক ঢাল বিশিষ্ট নিমজ্জিত ভূ-ভাগকে ________________ বলে।

উত্তর ঃ ১.১) বেশী ১.২) পাঁচ ১.৩) ৩ কি.মি. ১.৪) মহীসোপান ১.৫) মহীঢাল

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

২.১. মহীসোপান ধীরে ধীরে ১° অপেক্ষা কম কৌনিকভাবে সমুদ্রে ঢালু হয়ে যায়।

২.২. মহীঢাল খাড়া ও চওড়া বেশী।

২.৩. গভীর সমুদ্রের সমভূমির আয়তন ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় এক তৃতীয়াংশ।

২.৪. সামুদ্রিক ও মহাদেশীয় খাতের সংঘর্ষে সমুদ্র খাতের উদ্ভব হয়।

২.৫. খাতগুলো অপ্রশস্ত ও খাড়া ঢাল বিশিষ্ট।

উত্তরঃ ২.১. স ২.২. মি ২.৩. মি ২.৪. স ২.৫. স

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১. তটদেশীয় অঞ্চল কাকে বলে?

২. ঝিনুক অঞ্চল কাকে বলে?

৩. মহীসোপান কাকে বলে?

৪. মহীঢাল কাকে বলে?

৫. গভীর সমুদ্রের সমভূমি কি?

৬. সমুদ্র খাত কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপের বর্ণনা দিন।

ইউনিট ১২

মহাসাগরীয় স্রোত
(Ocean Current)

পাঠ- ১২.১ ঃ সংজ্ঞা ও কারণ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- সমুদ্র স্রোত কাকে বলে বলতে পারবেন;
- সমুদ্র স্রোতের কারণ গুলো বলতে পারবেন;
- এছাড়া এই কারণগুলো কিভাবে সমুদ্র স্রোতের সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

সমুদ্রের পানি কখনও একস্থানে স্থির থাকে না। উহা সবসময় সমুদ্রের মধ্যে চলাচল করিতেছে। বায়ু যেমন প্রতিনিয়ত এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলাচল করে তেমনি সমুদ্রের পানি ও সমুদ্রের মধ্যে সবসময় একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পানির নির্দিষ্ট প্রবাহকে সমুদ্র স্রোত বলে।

সমুদ্র স্রোতের কারণ

পানির স্বাভাবিক ধর্ম উপরিভাগের সমতা রক্ষা করা। প্রাকৃতিক বিভিন্ন কারণে সমুদ্রের উপরিভাগের পানির সমতার ব্যতিক্রম ঘটে। তখন পানি স্বাভাবিক নিয়মে সমুদ্র পৃষ্ঠের সমতা রক্ষার জন্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয় । ফলে সমুদ্র স্রোতের সৃষ্টি হয় এবং এই অসমতার বিভিন্নতার কারণে সমুদ্রের স্রোতেরও তারতম্য ঘটে। যে সকল কারণসমূহের জন্য সমুদ্র স্রোতের উৎপত্তি হয় সেগুলো নিম্নরূপঃ

(১) বায়ু প্রবাহ
(২) পৃথিবীর আবর্তন
(৩) উষ্ণতার তারতম্য
(৪) লবণাক্ততার তারতম্য
(৫) স্থলভাগের অবস্থান
(৬) শৈলশিরার অবস্থান
(৭) অসমান বাষ্পীভবন
(৮) সমুদ্রের গভীরতা

কারণ সমূহের ব্যাখ্যা

১। বায়ু প্রবাহ (Wind Movement) ঃ সমুদ্র স্রোতের প্রধান কারণ বায়ু প্রবাহ। সমুদ্রের প্রধান প্রধান স্রোতগুলি ভূ-পৃষ্ঠের প্রধান প্রধান বায়ুপ্রবাহের গতিপথ অনুসরণ করে থাকে। আয়ন বায়ু প্রবাহিত অঞ্চলে সমুদ্র স্রোত পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে এবং প্রত্যায়ন বায়ু প্রবাহিত অঞ্চলে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। ভারত মহাসাগরে মৌসুমী বায়ু প্রবাহের অনুকূলে সেখানকার স্রোতগুলি প্রবাহিত হয়। ঋতু পরিবর্তনের ফলে মৌসুমী বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হলে সমুদ্রের স্রোতের গতি ও দিক পরিবর্তিত হয়ে বায়ুর গতিপথ অনুসরণ করে। যেমন উত্তর পূর্ব আয়ন বায়ু ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রবাহের প্রভাবে নিরক্ষীয় অঞ্চলে যথাক্রমে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এবং দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের উৎপত্তি হয়। আবার দক্ষিণ পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ুর প্রভাবে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের উপসাগরীয় স্রোত এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কুরোশিও স্রোতদ্বয় উত্তর-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়।

চিত্র ১২.১.১ ঃ সমুদ্র স্রোতের উপর বায়ু প্রবাহের প্রভাব

২। পৃথিবীর আবর্তন (Rotation of the earth)

পৃথিবীর আবর্তনের ফলেও সমুদ্র স্রোতের সৃষ্টি হয়। আহ্নিক গতির ফলে পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর থাকিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঘুরছে। পৃথিবীর আবতর্নের সাথে সাথে পানি রাশি ও পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্র স্রোতের সৃষ্টি হয়। ফেরেলের সূত্র অনুযায়ী সমুদ্র স্রোত উত্তর গোলার্ধের ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। উদাহরণসরূপ উত্তর গোলার্ধে উপসাগরীয় স্রোত ও ক্যানারী স্রোতের প্রবাহ ঘড়ির কাঁটার দিকে অর্থাৎ ডান দিকে ঘুরে থাকে। অনুরূপভাবে দক্ষিণ গোলার্ধে ব্রাজিল স্রোত ও পশ্চিমা বায়ু প্রবাহ জনিত স্রোত ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে থাকে।

চিত্র ১২.১.২ ঃ পৃথিবীর আবর্তনের প্রভাবে সমুদ্র স্রোত উত্তর গোলার্ধে ডানে ও দক্ষিন গোলার্ধে বামে বেঁকে যায়।

৩। উষ্ণতার তারতম্য (Vareation of Temperature) ঃ নিরক্ষীয় ও মেরু অঞ্চলে সূর্যরশ্মি যথাক্রমে সোজাসুজি ও তীর্যকভাবে পড়ে এবং তাপমাত্রার পার্থক্য হয়। ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির তাপমাত্রার ও পরিবর্তন ঘটে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে সেই স্থানের পানি উত্তপ্ত হয়। কিন্তু মেরু প্রদেশে সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়ে বলে ঐ স্থানের পানি শীতল থাকে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণপানি আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে হাল্‌কা হয় এবং সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়া উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। পক্ষান্তরে পানির সমতা রক্ষার্থে মেরু অঞ্চলের শীতল ও ভারী পানি সমুদ্রের তলদেশ দিয়া নিরক্ষীয় প্রদেশে আসতে থাকে। এভাবে একটি স্রোত চক্রের উৎপত্তি হয়।

চিত্র ১২.১.৩ ঃ উষ্ণতার তারতম্যের প্রভাব

৪। লবনাক্ততার তারতম্য ঃ সমুদ্রের পানি লবণাক্ত। কিন্তু এই লবণাক্ততার পরিমাণ সাগর মহাসাগরের সর্বত্র সমান নয়। বৃষ্টিপাত, বাষ্পীভবন, নদনদী, বরফগলা পানি প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে সমুদ্রের সর্বত্র লবাণাক্ততার পরিমাণ সমান থাকে না। সমূদ্রের পানি যেখানে লবণাক্ততা বেশী সেখানের পানির ঘনত্ব বেশী ও ভারী । এই ভারী ও অধিক লবণাক্ত পানি স্বভাবতই নীচের দিকে এবং কম ঘনত্বের হালকা পানি উপরের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে সমুদ্রের পানিতে স্রোতের উদ্ভব ঘটে।

চিত্র ১২.১.৪ ঃ লবনাক্ততার তারতম্যের প্রভাব

৫। স্থলভাগের অবস্থান (Presence of Land masses) ঃ সমুদ্র স্রোত প্রবাহিত হওয়ার সময় উহার সম্মুখে কোন স্থলভাগের অবস্থান থাকলে স্রোতের গতি পরিবর্তন হয়ে নতুন স্রোতের উৎপত্তি হয়। আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতটি দক্ষিণ আমেরিকার সেন্টরক অন্তরীপে বাধা পেয়ে দুটি নূতন স্রোতের সৃষ্টি করে। পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কুমেরু স্রোতের একটি শাখা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে বাধা পাওয়ায় বেঙ্গুয়েলা স্রোতের উৎপত্তি হয়েছে। অনুরূপভাবে স্থলভাগের অবস্থানের দরুন দক্ষিনে প্রশান্ত মহাসাগরে পেরু এবং ভারত মহাসাগরে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে।

চিত্র ১২.১.৫ ঃ সমুদ্র স্রোতের উপর স্থলভাগের প্রভাব

৬। শৈল শিরার অবস্থান ঃ সমুদ্র তলদেশে যে সকল শৈলশিরা রয়েছে। সেগুলো সমুদ্র স্রোতের উপর প্রভাব বিস্তার করে। উত্তর স্কটল্যান্ড ও গ্রীনল্যান্ডের সংযোগকারী ওয়েভীল অসমান শৈলশিরা উত্তর মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের আন্তস্রোত প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে শৈলশিরার উপরিভাগের নিম্নের পানির উত্তাপ সম গভীরতায় আটলান্টিক মহাসাগরের পানির উত্তাপ অপেক্ষা ১৫° ফাঃ বেশী।

৭। অসমান বাস্পীভবন (Unequal evaporation) ঃ উষ্ণ মন্ডলের সূর্যের তাপ অধিক বলে সেখানে সমুদ্রের পানি প্রচুর পরিমাণে বাস্পীভূত হয়ে যায়। কিন্তু শীতল বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে তাপ কম বলে সেখানে সমুদ্রের পানি খুব কমই বাস্প হয়। সূর্য তাপের পার্থক্যের দরুণই সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বাস্পীভবনের পার্থক্য হয়ে থাকে। সমুদ্রের কোন অংশে অধিক উত্তাপের জন্য বাস্পীভবনের পরিমাণ বেশী আবার কম উত্তাপের জন্য বাস্পীভবনের পরিমাণ কম। ফলে পানির উচ্চতায় বিভিন্ন অংশে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। তখন পানির সমতা রক্ষার্থে এক অংশের পানি অন্য অংশের দিকে প্রবাহিত হইতে শুরু করে। ফলে সমুদ্র স্রোতের উদ্ভব ঘটে।

চিত্র ১২.১.৬ ঃ বাষ্পীভবনের তারতম্য

৮। সমুদ্রের গভীরতা (Depth of the ocean) ঃ সমুদ্রের গভীরতার জন্যও সমুদ্র স্রোতের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের গভীরতার পার্থক্যের জন্য উষ্ণতার তারতম্য ঘটে। সমুদ্র যদি অগভীর হয় তবে উহার পানি দ্রুত উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠে এবং শীতল পানি নিচে নেমে যায়। এতে উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী সমুদ্র স্রোতের সৃষ্টি হয়। আবার গভীর সমুদ্রে ভিন্ন প্রবাহ দেখা যায়। সেই ক্ষেত্রে সূর্যের কিরণ সমুদ্রের ২১০ মিটারের অধিক গভীরে প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে উক্ত গভীরতার পর সমূদ্রের পানির উষ্ণতা ক্রমশ কম হইয়া থাকে। ইহাতে গভীর সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়া পৃষ্ঠস্রোত এবং তলদেশ দিয়া আন্তস্রোত প্রবাহিত হয়। নীচে গভীরতার সাথে তাপমাত্রার সম্পর্ক দেখানো হল।

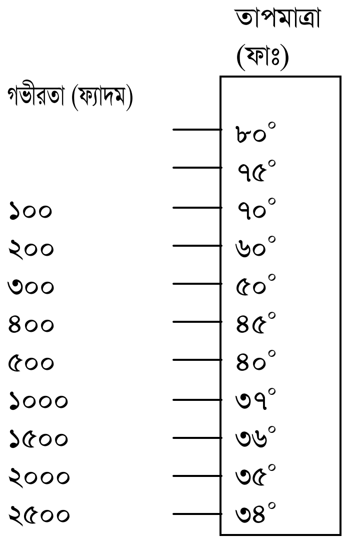

চিত্র ১২.১.৭ ঃ সমুদ্রতলের তাপমাত্রা

পাঠসংক্ষেপ

সমূদ্রের পানি কখনও একস্থানে স্থির থাকে না। পানি সবসময় সমূদ্রের মধ্যে চলাচল করছে। বায়ু যেমন এক স্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচল করে তেমনি পানিও সমূদ্রের মধ্যে প্রতিনিয়ত একস্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। সমূদ্রের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পানির নির্দিষ্ট প্রবাহকে সমূদ্র স্রোত বলে। বায়ু প্রবাহ, উষ্ণতা, পৃথিবীর আবর্তন প্রভৃতি নানা কারণে সমূদ্র স্রোতের উৎপত্তি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.১

নৈর্বাক্তিক প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১.১. কোনটি সমূদ্র স্রোতের কারণ ?
ক) সূর্যরশ্মি খ) চন্দ্র কিরণ গ) বায়ুপ্রবাহ

১.২. পৃথিবীর আবর্তনে ব্রজিল স্রোত ঘুরে -
ক) ঘড়ির কাঁটার দিকে খ) ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে গ) চক্রাকারে

১.৩. লবণাক্ততা বেশী হলে পানির ঘনত্ব -
ক) কমে খ) বাড়ে গ) সমান থাকে

১.৪. সমূদ্রের গভীরতার কারণে সমূদ্রস্রোত বহে -
ক) সামনে -পিছে খ) উপর -নীচে গ) চক্রাকারে

১.৫. স্থলভাগের অবস্থানের জন্য সৃষ্টি হয় -
ক) বঙ্গোপসাগরীয় স্রোত খ) অস্ট্রেলিয়া স্রোত গ) রেড স্রোত

উত্তর ঃ ১.১. গ ১.২. খ ১.৩. খ ১.৪. খ ১.৫. খ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর ঃ

১. সমুদ্র স্রোতের কারণগুলো কি কি?
২. আহ্নিক গতির ফলে পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর কোন দিক থেকে কোন দিকে ঘুরছে?
৩. কোন অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়?
৪. স্থলভাগের অবস্থান সমুদ্রস্রোতের অবস্থানকে কিভাবে প্রভাবিত করে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সমুদ্র স্রোত কাকে বলে? সমুদ্র স্রোতের কারণ ও এর প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ১২.২ ঃ প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত

এই পাঠ শেষে আপনি—

- প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোতের শ্রেণীবিভাগ এবং স্রোতগুলোর গুনাবলী বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারনা পাবেন।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত

(Current of the Pacific Ocean)

প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতের অনুরূপ। তবে উপকূল রেখার অবস্থানের বিভিন্নতার দরুন কিছু কিছু পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। এ মহাসাগরের মধ্য দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে নিরক্ষরেখা অবস্থান করায় এটি দু'টি অংশে বিভক্ত। কাজেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোতগুলোকে আঞ্চলিকভাবে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা–

(ক) উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত এবং

(খ) দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরই প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোতের মূল উৎস। তাই বর্ণনার সুবিধার্থে প্রথমে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোতগুলোর বর্ণনা দেয়া হল।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত

(ক) দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত
১. কুমেরু স্রোত
২. পেরু স্রোত
৩. দঃ নিরক্ষীয় স্রোত
৪. নিউ সাউথ ওয়েলস স্রোত

(খ) উঃ প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত
১. উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত
২. কুরোশিও স্রোত
৩. পশ্চিমা স্রোত
৪. আলাস্কা স্রোত
৫. ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত
৬. কামচাটকা স্রোত
৭. সুসিমা স্রোত

(গ) নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত

(ক) দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত ঃ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের স্রোতগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

(১) কুমেরু স্রোত (Antarctic Current) ঃ পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কুমেরু মহাসাগরে একটি শীতল স্রোতের সৃষ্টি হয়ে পশ্চিম হতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। এটি কুমেরু বা পশ্চিমা স্রোত নামে পরিচিত। প্রত্যায়ন বায়ুর দ্বারা তাড়িত হয়ে এ স্রোতটি সোজাসুজি দকিকান্ত মহাসাগর হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে উপনীত হয়। এটি দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণে হর্ন অন্তরীপে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়। এর প্রধান শাখাটি দিক পরিবর্তন না করে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ দিয়ে সরাসরি আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে। অপর শাখাটি দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল দিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়।

(২) পেরু স্রোত (Peruvian Current) ঃ কুমেরু স্রোতের যে শাখাটি দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল দিয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় তাকে পেরু বা হামবোল্ড স্রোত বলে। শীতল কুমেরু হতে উৎপন্ন হওয়ায় এটি একটি শীতল স্রোত। এটি আটলান্টিকের বেঙ্গুয়েলা স্রোতের অনুরূপ। উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে এ শীতল স্রোতটি ক্রমশ উষ্ণ হতে থাকে।

(৩) দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত (South Equatorial Current) ঃ পেরু স্রোত উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী হলে দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু ও পৃথিবীর আবর্তন গতির প্রভাবে উত্তর-পশ্চিম দিকে বেঁকে যায়। পরে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত নামে নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। এটি একটি উষ্ণ স্রোত। এ স্রোত হতে কয়েকটি শাখা স্রোত পর পর দক্ষিণে নির্গত হয়ে পূর্বদিকে বেঁকে যায়। কিন্তু মূল স্রোতটি বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের ১২,৮৮০ কিলোমিটার (৮,০০০ মাইল) পথ অতিক্রম করে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে পৌঁছে এবং সেখানে বাধা পেয়ে

তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়। প্রথম শাখাটি অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিণে, দ্বিতীয়টি অস্ট্রেলিয়ার উত্তর দিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে এবং তৃতীয় শাখাটি উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়।

(৪) নিউ সাউথ ওয়েলস স্রোত (New South Wales Current) ঃ দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের যে শাখাটি দক্ষিণে বেঁকে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয় তাকে নিউ সাউথ ওয়েলস স্রোত বলে। একে পূর্ব অস্ট্রেলিয়া স্রোতও বলা হয়। এ স্রোতটিকে আটলান্টিক মহাসাগরের ব্রাজিল স্রোতের সাথে তুলনা করা চলে। এটি একটি উষ্ণ স্রোত এবং দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ শীতল হতে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার উপকূল অতিক্রম করে নিউজিল্যান্ডের নিকট পৌঁছলে এ স্রোতটি পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে বেঁকে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। এখানে এ স্রোতটি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। এর একটি নিউজিল্যান্ডের উত্তর এবং অপরটি দক্ষিণ দিয়ে পূর্বদিকে পৌঁছে এবং পরস্পর মিলিত হয়। এ মিলিত স্রোত দক্ষিণপূর্ব অগ্রসর হয়ে কুমেরু স্রোতের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

চিত্র ১২.২.১ ঃ প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত

(খ) উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত

নিরক্ষরেখার উত্তর দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে যে সব স্রোত প্রবাহিত হয় তারা সাধারণত উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোতের অন্তর্ভুক্ত। নিচে এ সব স্রোতের বিবরণ দেয়া হল ঃ

(১) উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত (North Equatorial Current) ঃ নিরক্ষরেখার উত্তর দিয়ে যে স্রোতটি প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব হতে সোজাসুজি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয় তাকে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত বলে। বস্তুত এটা ক্যালিফোর্নিয়া স্রোতের বর্ধিত অংশ।

এ স্রোতটি উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল হতে উৎপত্তি লাভ করে আয়ন বায়ুর তাড়নায় পশ্চিম দিকে সুদীর্ঘ ১২,৮৮০ কি. মি. পথ অতিক্রম করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপকূলে উপস্থিত হয়। সেখানে এটি দু’টি শাখায় বিভক্ত হয়। এ শাখা দুটি ফিলিপাইনের দু’ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুরোশিও স্রোতের সাথে মিলিত হয়।

(২) কুরোশিও (Kurosio) বা জাপান স্রোত ঃ দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের তৃতীয় শাখা নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবার সময় উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়। এ মিলিত স্রোত এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে জাপানের পার্শ্ব দিয়ে জাপান বা কুরোশিও স্রোত নামে উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। কুরোশিও স্রোতের অনেক বৈশিষ্ট্য আটলান্টিক মহাসাগরের উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের মত হলেও এর গতিবেগ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এ স্রোতটি উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ুর দ্বারা তাড়িত হয়ে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়।

(৩) পশ্চিমা স্রোত (West Wind Current) ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ু বা পশ্চিমা বায়ু দ্বারা তাড়িত হয়ে কুরোশিও স্রোত জাপানের পূর্ব উপকূল হতে উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর এটি পূর্বদিকে বেঁকে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে কানাডার পশ্চিম উপকূলে উপনীত হয়। উত্তর মহাসাগরের এ স্রোতটিকে পশ্চিমা স্রোত বা উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত বলা হয়। এটি একটি উষ্ণ স্রোত। এখানে এ স্রোতটি দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়। এর একটি শাখা আলাস্কা স্রোত নামে উত্তর দিকে এবং অপরটি ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়।

(৪) আলাস্কা স্রোত (Alaska Current) ঃ পশ্চিমা স্রোতের যে শাখাটি উত্তর দিকে বেঁকে আলাস্কা উপসাগরে প্রবেশ করে তাকে আলাস্কা স্রোত বলা হয়। এ স্রোতটি পরে আলাস্কার উপকূল দিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় এবং এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে দক্ষিণ দিকে বেঁকে একটি চক্রাকার স্রোতরূপে পশ্চিমা স্রোতের সাথে মিলিত হয়। এটি একটি উষ্ণ স্রোত এবং এর প্রভাবে উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূল অক্ষাংশ অনুযায়ী যেরূপ শীতল হওয়া উচিত সেরূপ শীতল হতে পারে না।

(৫) ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত (California Current) ঃ পশ্চিমা স্রোতের যে শাখাটি উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল বেয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় তাই ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত। পৃথিবীর আবর্তন গতি ও উত্তর-পূর্বে আয়ন বায়ুর প্রভাবে এ স্রোতটি ডানদিকে আবর্তন করে পশ্চিম দিকে যেতে থাকে। পরিশেষে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়। এরূপে স্রোতটি মহাসাগরের জলাবর্তের মধ্যে স্রোতহীন কেন্দ্রস্থলে একটি প্রকান্ড শৈবাল সাগরের সৃষ্টি করেছে। উষ্ণ স্রোতের শাখা হলেও এ অঞ্চলে এটি শীতল স্রোতরূপে প্রবাহিত। কারণ সুমেরু স্রোতের একটি শাখা উত্তর প্রশান্ত প্রবাহের নিম্ন দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে ক্যালিফোর্নিয়া স্রোতের সাথে মিশে তাকে শীতল স্রোতে পরিবর্তিত করে।

(৬) কামচাটকা বা সুমেরু স্রোত (Kamchatka or Arctic Current) ঃ মেরু দেশীয় বায়ু এবং পানির উষ্ণতা ও লবণাক্ততার পার্থক্যের দরুন উত্তর মহাসাগরে একটি শীতল সুমেরু স্রোতের সৃষ্টি হয়। এ স্রোতটি বেরিং স্রোত নামে বেরিং প্রণালীর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। এর পর কামচাটকা স্রোত নামে কামচাটকার পার্শ্ব দিয়ে ওর্খটস্ক সাগরে প্রবেশ করে। সেখান হতে বের হয়ে এটি সাখালীন ও হোক্কাইডো দ্বীপদ্বয়ের পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। হোক্কাইডোর পূর্ব পার্শ্বে এটা ওয়াশিও (Oyasiwo) স্রোত নামে পরিচিত। এ স্রোতটি উষ্ণ কুরোশিও স্রোতের পার্শ্ব দিয়ে বিপরীত দিকে অগ্রসর হবার সময় শীতল ও উষ্ণ স্রোতের সংমিশ্রনে এখানে নিবিড় কুয়াশা বা ঝড়ের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে হতে এটি ক্রমশ উষ্ণ হয়ে কুরোশিও স্রোতের সাথে মিশে যায়। এ শীতল স্রোতকে উত্তর আটলান্টিকের ল্যাব্রাডর স্রোতের সাথে তুলনা করা চলে। এ শীতল স্রোতের সাথে কোন কোন সময় হিমশৈল ভেসে আসে।

(৭) সুসিমা স্রোত (Tsushima Current) ঃ এ স্রোতটি কুরোশিও স্রোতের একটি ক্ষুদ্র শাখা। এটি জাপানের দক্ষিণে কুরোশিও স্রোত হতে উৎপন্ন হয়ে জাপানের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়। পরে এটি হনসু ও হোক্কাইডোর দিয়ে পূর্বদিকে যায়। পরিশেষে এ স্রোতটি কুরোশিও স্রোতের সাথে মিলিত হয়। উষ্ণ কুরোশিও স্রোতের শাখা বলে মধ্য এটিও একটি উষ্ণ স্রোত।

(গ) নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত
Counter Equatorial Current

উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের মধ্য দিয়ে যে উষ্ণ স্রোতটি পশ্চিম হতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়, তাকে নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত বলে। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে এটি দীর্ঘতম স্রোত। ফিলিপাইনের পূর্ব উপকূল হতে এটি সুদীর্ঘ ১২,৮০০ কি.মি. (৮,০০০ মাইল) পথ অতিক্রম করে মধ্য আমেরিকার পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। এটি প্রায় ৫° উত্তর অক্ষাংশের উপর অবস্থান করে। এ স্রোতটি আটলান্টিকের নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন। কারণ প্রশান্ত মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর হতে অধিক প্রশস্ত।

পাঠসংক্ষেপ

প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতের অনুরূপ। স্থলভাগের পার্থক্যের ভিন্নতায় স্রোতের গতি ও প্রকৃতিতে কিছু পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রশান্ত মহাসাগর নিরক্ষরেখা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। যেমন উত্তর ও দক্ষিন প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত। দক্ষিন প্রশান্ত মহাসাগরই প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোতের মূল উৎস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১.১. প্রশান্ত মহাসগরীয় স্রোত কয়ভাগে বিভক্ত ?

ক) তিন | খ) চার
গ) দুই | ঘ) সাত

১.২. কুমেরু স্রোত সৃষ্টি হয় কার প্রভাবে ?

ক) পশ্চিমা বায়ু | খ) প্রত্যায়ন বায়ু
গ) নিরক্ষীয় বায়ু | ঘ) মেরুবায়ু

১.৩. শীতল স্রোতের সাথে ভেসে আসে -

ক) হিমশৈল | খ) প্রস্তর খণ্ড
গ) লতা গুল্ম | ঘ) কাঠ

১.৪. নিরক্ষীয় স্রোত মিশেছে -

ক) ফিলিপাইওনীয় স্রোতের সাথে | খ) কুরোশিও স্রোতের সাথে
গ) আলাস্কা স্রোতের সাথে | ঘ) কামচাট্কা স্রোতের সাথে

১.৫. কোনটি দীর্ঘতম স্রোত ?

ক) ক্যালির্ফোনিয়া স্রোত | খ) সুসিমা স্রোত
গ) নিরক্ষীয় স্রোত | ঘ) পশ্চিমা স্রোত

উত্তর ঃ ১.১. গ ১.২. ক ১.৩. খ ১.৪. ক ১.৫. গ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোতের শ্রেনী বিভাগ দেখান
২. সুমেরু স্রোত বলতে কি বোঝেন ?
৩. চিত্রসহ নিউ সাউথ ওয়েলস স্রোতের বর্ণনা দিন
৪. দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের গতিপথ দেখান

রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোতের চিত্রসহ বর্ণনা দিন।

পাঠ- ১২.৩ ঃ ভারত মহাসাগরীয় স্রোত

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভারত মহাসাগরীয় স্রোত সম্পর্কে ধারনা পাবেন।

ভারত মহাসাগরীয় স্রোত

Current of the Indian Ocean

আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মত ভারত মহাসাগরের অবস্থান ও পরিবেশ একইরূপ নয়। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় ভারত মহাসাগর উত্তর ও দক্ষিণ হিমমন্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশ সুমেরু মহাসাগরে উন্মুক্ত কিন্তু ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশ স্থলভাগ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত। এ কারণে উত্তর ভারত মহাসাগরের স্রোতের সাথে উত্তর আটলান্টিক ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের স্রোতের মধ্যে কোন মিল নেই। অথচ দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় স্রোতগুলোর সাথে দক্ষিণ আটলান্টিক ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোতগুলোর মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশে পানি রাশির আয়তন কম থাকায় স্রোতের সংখ্যাও কম। এছাড়া ভারত মহাসাগরের এ অংশের স্রোত মৌসুমী বায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ঋতুভেদে স্রোতের দিক সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় স্রোতগুলো সারা বছর প্রায় একই দিকে প্রবাহিত হয়। নিচে ভারত মহাসাগরীয় স্রোতগুলোর বর্ণনা দেয়া হল।

ভারত মহাসাগরীয় স্রোত (ছক ১২.৩.১)

ভারত মহাসাগরীয় স্রোত

(ক) দঃ ভারত মহাসাগরীয় স্রোত
১. কুমেরু স্রোত
২. পঃ অস্ট্রেলিয়া স্রোত
৩. দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত
৪. মোজাম্বিক ও মাদাগাস্কার স্রোত
৫. আগুলহাস স্রোত

(খ) উত্তর ভারত মহাসাগরীয় স্রোত
১. সোমালী স্রোত
২. মৌসুমী স্রোত
ক. গ্রীষ্মের মৌসুমী স্রোত
খ. শীতকালীন মৌসুমী স্রোত

(গ) ভারত মহাসাগরীয় বিপরীত স্রোত বা নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত

(ক) দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় স্রোত

(১) কুমেরু বা পশ্চিমা স্রোত (Antarctic or West wind) ঃ প্রবল পশ্চিমা বায়ুর তাড়নায় কুমেরু মহাসাগরের একটি শীতল স্রোত পশ্চিম হতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। এ স্রোতটি কুমেরু বা পশ্চিমা স্রোত নামে পরিচিত। এটি পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে সমগ্র দক্ষিণ ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে উপনীত হয়ে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। প্রধান শাখাটি অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করে। অপর শাখাটি অস্ট্রেলিয়ার লিউউইন (Leewin) অন্তরীপে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল দিয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়।

(২) পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোত (West Australian Current) ঃ কুমেরু স্রোতের যে শাখাটি অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল দিয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় তা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোত নামে পরিচিত। এটি আটলান্টিক মহাসাগরের বেঙ্গুয়েলা এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পেরু স্রোতের অনুরূপ। অতিশয় শীতল কুমেরু স্রোতের শাখা বলে এটি একটি শীতল স্রোত। ক্রান্তীয় অঞ্চলে উপনীত হলে স্রোতটি ক্রমশ উষ্ণ হতে থাকে।

(৩) দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত (South Equatorial Current) ঃ দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু এবং পৃথিবীর আবর্তন গতির প্রভাবে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোতটি পশ্চিম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হতে থাকে। ঐ সময় অস্ট্রেলিয়ার নিউগিনির নিকটবর্তী টরেস (Torres) প্রণালীর মধ্য দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখা এসে এর সাথে মিলিত হয়। পরে এ মিলিত স্রোত দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত নামে সোজা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের

মাদাগাস্কার দ্বীপের নিকট পৌঁছে এ স্রোত আবার তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়। দুটি শাখা মাদাগাস্কার দ্বীপের দু পার্শ্ব দিয়ে দক্ষিণে এবং অপরটি উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়।

(৪) মোজাম্বিক ও মাদাগাস্কার স্রোত (Muzambique and Madagascar Current) ঃ দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের যে শাখাটি মাদাগাস্কার (বা মালাগাসি) দ্বীপের পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয় তাকে মাদাগাস্কার স্রোত (বা মালাগাসি স্রোত) বলা হয়। অপরদিকে মালাগাসি ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী মোজাম্বিক প্রণালীর মধ্য দিয়ে যে শাখাটি দক্ষিণে প্রবাহিত হয় তাকে মোজাম্বিক স্রোত বলে। এ স্রোত দু'টি মালাগাসি দ্বীপের দক্ষিণে পৌঁছে একসঙ্গে মিলিত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চল হতে আগত বলে এরাও উষ্ণ স্রোত।

চিত্র ১২.৩.১ ঃ ভারত মহাসাগরীয় স্রোত (গ্রীষ্মকালীন)

(৫) আগুলহাস স্রোত (Agulhus Current) ঃ মালাগাসি দ্বীপের দক্ষিণে মোজাম্বিক এবং মাদাগাস্কার (বা মালাগাসি) স্রোত মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। এ মিলিত স্রোতটিকে আগুলহাস স্রোত বলা হয়। এটি একটি উষ্ণ স্রোত। আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল দিয়ে এ স্রোত উত্তমাশা অন্তরীপের নিকট পৌঁছলে পশ্চিমা বায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হয় এবং পূর্ব দিকে বেঁকে শীতল কুমেরু স্রোতের সাথে মিলে যায়।

(খ) উত্তর ভারত মহাসাগরীয় স্রোত

Current of North Indian Ocean

(১) সোমালী স্রোত (Somali Current) ঃ ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের যে শাখাটি মালাগাসি দ্বীপের উত্তর হতে পশ্চিম দিকে বেঁকে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের সোমালিয়ার পার্শ্ব দিয়ে সোজা উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় সেটি সোমালী স্রোত নামে পরিচিত। এটি একটি উষ্ণ স্রোত।

(২) মৌসুমী স্রোত (Monsoon Current) ঃ মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে উত্তর ভারত মহাসাগরের উত্তর উপকূল বরাবর যে স্রোত প্রবাহিত হয় তাই মৌসুমী স্রোত। গ্রীষ্মকালে এটি পশ্চিম হতে পূর্বদিকে এবং শীতকালে একই পথে বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। তাই মৌসুমী স্রোত দু'প্রকার, যেমন- গ্রীষ্মকালীনও শীতকালীন মৌসুমী স্রোত।

(ক) গ্রীষ্মের মৌসুমী স্রোত

Summer Monsoon Current

গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সোমালী স্রোত আফ্রিকার পূর্ব উপকূল হতে প্রথমে আরব সাগরে প্রবেশ করে। সেখান হতে এ স্রোত ভারতের পশ্চিম উপকূল দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয় এবং শ্রীলংকার দক্ষিণ-পূর্বদিক ঘুরে ভারতের পূর্ব উপকূল দিয়ে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে। এটাই গ্রীষ্মের মৌসুমী স্রোত নামে পরিচিত। একে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী স্রোতও বলা হয়। বঙ্গোপসাগরের উত্তর দিকের স্থলভাগে প্রতিহত হয়ে এ স্রোত দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয় এবং আন্দামান সাগর অতিক্রম করে সুমাত্রার পশ্চিম পার্শ্বে উপনীত হয়। এখানে এসে এ স্রোত আয়ন বায়ুর তাড়নায় পশ্চিম দিকে সামান্য বেঁকে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়। এ সময় উত্তর ভারত মহাসাগরে অন্য কোন স্রোত দেখা যায় না।

(খ) শীতকালীন মৌসুমী স্রোত (Winter Monsoon current)

শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী স্রোতটি আর থাকে না। কিন্তু এর পথ অনুসরণ করে একটি বিপরীতমুখী স্রোতের সৃষ্টি হয়। সর্বপ্রথম মালয় ও সুমাত্রার মধ্য দিয়ে একটি স্রোত আন্দামান সাগরে প্রবেশ করে এবং পরিশেষে বঙ্গোপসাগরে উপনীত হয়। এখানে পৌঁছে এ স্রোতটি উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর অধীনে চলে যায় এবং সম্পূর্ণ রূপে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী স্রোতের পথ অনুসরণ করে আরব সাগর ঘুরে আফ্রিকার সোমালিয়ার দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এটাই শীতকালীন মৌসুমী স্রোত বা উত্তর-পূর্ব মৌসুমী স্রোত।

(গ) ভারত মহাসাগরীয় বিপরীত স্রোত

শীতকালীন মৌসুমী স্রোতটি আফ্রিকার সোমালিয়ার দক্ষিণে পৌঁছে পূর্বদিকে বেঁকে যায় এবং নিরক্ষরেখা বরাবর সোজা পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। পরিশেষে এ স্রোতটি ভারত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত সুমাত্রা দ্বীপের নিকট পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং দক্ষিণে বেঁকে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়। এটাই ভারত মহাসাগরীয় বিপরীত স্রোত। একে নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোতও বলা হয়। এটি একটি উষ্ণ স্রোত। এ স্রোতটি কেবল শীতকালেই দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে শীতকালীন মৌসুমী স্রোতের সঙ্গে এ স্রোতটিও অন্তর্হিত হয়।

চিত্র ১২.৩.২ ঃ ভারত মহাসাগরীয় স্রোত (শীতকালীন)

পাঠসংক্ষেপ

আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের অবস্থান ও পরিবেশ অনেকটা একই। কিন্তু ভারত মহাসাগর এই দুই মহাসাগরের ন্যায় উত্তর ও দক্ষিণ হিমমন্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশ সুমেরু মহাসাগরে উন্মুক্ত কিন্তু ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশ সম্পূর্নরূপে স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত। এ সমস্ত কারণে উত্তর ভারত মহাসাগরের সাথে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোতের তেমন কোন মিল নেই। কিন্তু দক্ষিন ভারত দক্ষিন আটলান্টিক ও দক্ষিন আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোতে যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। ভারত মহাসাগরীয় স্রোত দক্ষিন ভারত মহাসাগরীয় ও উত্তর ভারত মহাসাগরীয় স্রোত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাঠে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশে স্রোতের সংখ্যা -
 ক) কম খ) বেশী
 গ) একেবারে নেই ঘ) ক ও খ উভয়ই

২. পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোত একটি -
 ক) উষ্ণ স্রোত খ) শীতল স্রোত
 গ) নাতিশীতোষ্ণ স্রোত ঘ) ক ও গ ইভয়ই

৩. মোজাম্বিক ও মাদাগাস্কার স্রোত একটি -
 ক) শীতল স্রোত খ) উষ্ণ স্রোত
 গ) ক্রান্তীয় স্রোত ঘ) মেরু স্রোত

৪. উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটবর্তী স্রোতটির নাম -
 ক) আগুলহাস স্রোত খ) মৌসুমী স্রোত
 গ) শীতকালীন মৌসুমী স্রোত ঘ) পেরু স্রোত

৫. উষ্ণ স্রোতে জাহাজ চলাচল নিরাপদ কেন ?
 ক) হিমশৈল গলে যায় বলে খ) কোন উদ্ভিদ থাকে না বলে
 গ) অন্য কোন যানবাহন চলাচল করে না বলে ঘ) ঝড় নেই বলে

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১। ভারত মহাসাগরীয় স্রোতের শ্রেনী বিভাগ দেখান।
২। ভারত মহাসাগরীয় বিপরীত স্রোতের বর্ণনা দিন।
৩। জলবায়ুর উপর সমূদ্র স্রোতের প্রভাব কি ?
৪। নৌ পরিবহনে সমূদ্র স্রোতের প্রভাব কি ?
৫। চিত্রসহ দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের বর্ণনা দিন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভারত মহাসাগরীয় স্রোতের চিত্রসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২. সমুদ্র স্রোতের ফলাফল সমূহের বর্ণনা দিন।

পাঠ- ১২.৪ ঃ আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত

এই পাঠ শেষে আপনি—

- আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত সম্পর্কে ধারণা পাবেন

আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোতের বর্ণনা

আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থান দিয়ে পূর্ব পশ্চিমে বিষুবরেখা বিস্তৃত হয়ে একে দুইটি অংশ বিভক্ত করেছে। তাই আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতকে অনুরূপ আঞ্চলিকভাবে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

(ক) দক্ষিন আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত

(খ) উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত

(ক) দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত

বিষুবরেখা হইতে দক্ষিন দিকে দক্ষিন আটলান্টিক মহাসাগরে অনেকগুলি স্রোত প্রবাহিত। এদের মধ্যে উষ্ণ ও শীতল উভয় প্রকার স্রোতই বিদ্যমান। দক্ষিন আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতগুলি নিম্নরূপঃ

(১) কুমেরু স্রোত বা পশ্চিমা স্রোত;

(২) বেঙ্গুয়েলা স্রোত;

(৩) দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত;

(৪) ব্রাজিল স্রোত ও

(৫) ফকল্যান্ড স্রোত।

১। কুমেরু স্রোত বা পশ্চিমা স্রোত ঃ পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কুমেরু মহাসাগরে একটি শীতল স্রোতের উৎপত্তি হয়। কুমেরু মহাসাগরে উৎপত্তি বলে এই স্রোত কুমেরু স্রোত নামে পরিচিত। আবার পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে সৃষ্ট বলে একে পশ্চিমা স্রোতও বলা হয়। পশ্চিমা বায়ু কর্তৃক পরিচালিত হয়ে এই স্রোত উত্তর পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে এবং সমগ্র দক্ষিন আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে এই স্রোত দক্ষিন আফ্রিকার উপকূলে পৌছে। দক্ষিন আফ্রিকার স্থলভাগে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এই স্রোত দুইভাগে বিভক্ত হয়। একটি স্রোত পশ্চিম উপকুল দিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হয় এবং মূল শীতল স্রোতটি আফ্রিকার দক্ষিন দিক দিয়ে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে।

চিত্র ১২.৪.১ ঃ আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত

২। **বেঙ্গুয়েলা স্রোত ঃ** কুমেরু স্রোত দক্ষিন আফ্রিকার স্থলভাগে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে একটি অংশ বেঙ্গুয়েলা স্রোত নামে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। এই শীতল স্রোতটি উত্তরে উষ্ণমন্ডলের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় ক্রমশ উষ্ণ হয়। পৃথিবীর আবর্তন গতি ও দক্ষিন-পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে এই স্রোত উত্তর-পশ্চিম দিকে বেঁকে নিরক্ষরেখার দক্ষিন দিক দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়।

৩। **দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত ঃ** বেঙ্গুয়েলা স্রোত যখন নিরক্ষরেখার দক্ষিন দিক দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় তখন তাকে দক্ষিন নিরক্ষীয় স্রোত বলে। এই উষ্ণ স্রোতটি দক্ষিন আমেরিকার ব্রাজিলের পূর্বদিকে 'সেন্টরক' অন্তরীপে বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়। একটি শাখা নিরক্ষরোখা অতিক্রম করে দক্ষিন আমেরিকার উত্তর উপকূল দিয়ে অগ্রসর হয়ে ক্যারিবিয়ান সাগরে প্রবেশ করে এবং উপসাগরীয় স্রোতে পরিণত হয়। অপর শাখাটি ব্রাজিলের পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিন দিকে অগ্রসর হয়েছে।

৪। **ব্রাজিল স্রোত ঃ** দক্ষিন নিরক্ষীয় স্রোতের যে শাখাটি ব্রাজিলের পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিন পশ্চিমে অগ্রসর হয় তা ব্রাজিল স্রোত নামে পরিচিত। অগ্রসর হওয়ার সময় এই স্রোত উচ্চ অক্ষাংশে ক্রমশঃ শীতল হয়। ফকল্যান্ড দ্বীপের অনতিদূরে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে এই স্রোত পূর্বদিকে বেঁকে কুমেরু স্রোতের সাথে মিলিত হয়।

৫। ফকল্যান্ড স্রোত ঃ কুমেরু স্রোতের একটি ক্ষুদ্র শাখা ফকল্যান্ড দ্বীপের নিকট দিয়ে দক্ষিন আমেরিকার পূর্ব উপকূল এবং ব্রাজিল স্রোতের মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে অধিক শক্তিশালী ব্রাজিল স্রোতের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এই শীতল স্রোতটিকে ফকল্যান্ড স্রোত বলে।

(খ) উত্তর আটলান্টিক মহাসগরীয় স্রোত

নিরক্ষরেখার উত্তর দিকে আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত স্রোতগুলি উত্তর মহাসাগরীয় স্রোতের অন্তর্গত। গ্রীনল্যান্ডের উভয় পার্শ্ব দিয়ে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর সুমেরু সাগরের সাথে যুক্ত। এই জন্য সুমেরু সাগর হতে অত্যন্ত শীতল স্রোত আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে। বেশী প্রতিবন্ধকতা থাকায় উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে স্রোতের সংখ্যা বেশী। স্রোতগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) উপসাগরীয় স্রোত;	(২) ক্যানারি স্রোত;	(৩) উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত;
(৪) উত্তর আটলান্টিক স্রোত;	(৫) সুমেরু স্রোত;	(৬) লাব্রাডর স্রোত;
(৭) গ্রীনল্যান্ড স্রোত;	(৮) নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত;	(৯) গিনি স্রোত।

১। উপসাগরীয় স্রোত ঃ দক্ষিন নিরক্ষীয় স্রোতের উত্তরাংশের শাখাটি নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিন আমেরিকার উত্তর উপকূল দিয়ে অগ্রসর হয়ে ক্যারিবিয়ান সাগরে প্রবেশ করে। সেখানে পূর্বদিক হতে আগত উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের একটি উষ্ণ শাখার সাথে মিলিত হয়। এই সম্মিলিত স্রোতের বেগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই প্রবল স্রোত ফ্লোরিডা প্রণালীর মধ্য দিয়ে বের হয়ে এসে ফ্লোরিডার পূর্বদিকে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের অপর শাখার সাথে মিলিত হয়। উপসাগরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে এই স্রোত উপসাগরীয় স্রোত নামে পরিচিত। এই স্রোত উষ্ণ এবং এর রং গাঢ় নীল। এই স্রোত উত্তর পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে উত্তর আটলান্টিকের মধ্যভাগে এসে তিনটি শাখার বিভক্ত হয়।

২। ক্যানারী স্রোত ঃ উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত উত্তর আটলান্টিকের মধ্যভাগে যে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয় তার সর্বাপেক্ষা দক্ষিন দিকের শাখাটি প্রথমে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে পর্তুগালের উপকূলে পৌছায় এবং সেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দক্ষিন দিকে বেঁকে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের পার্শ্বে দিয়ে প্রবাহিত হয়। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে এটা ক্যানারি স্রোত নামে পরিচিত উচ্চ অক্ষাংশের শীতল অঞ্চল দিয়ে ঘুরে আসে বলে এটা শীতল স্রোত। পরে এই স্রোত পশ্চিম দিকে বেঁকে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়।

৩। উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত ঃ ক্যানারি স্রোত দক্ষিনাভিমুখী হলেই উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ুর দ্বারা প্রবাহিত হয়ে দক্ষিন-পশ্চিম দিকে ধাবিত হয়। অত:পর এই স্রোত কর্কট ক্রান্ত রেখার দক্ষিণে সরাসরি পশ্চিমমুখী হয়ে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত নামে প্রবাহিত হয়। এটি একটি উষ্ণ স্রোত। এই স্রোত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দুইভাগে বিভক্ত হয়। একটি শাা ক্যারিবিয়ান সাগরের মধ্যে দিয়ে মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে এবং অপর শাখা উপসাগরীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়। কাজেই উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের উভয় শাখাই প্রকৃত পক্ষে উপসাগরীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়।

উপসাগরীয় স্রোত, ক্যানারি স্রোত ও উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত মূলত একই স্রোত যা বিভিন্ন নামে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। এই জলাবর্তির অভ্যন্তরে কোন স্রোত প্রবাহিত হয় না। এই স্রোতহীন জলে ভাসমান আগাছা, শৈবাল ইত্যাদি সঞ্চিত হয় এবং সামুদ্রিক উদ্ভিদ জন্মে তাই একে শৈবাল সাগরও বলা হয়।

৪। উত্তর আটলান্টিক স্রোত ঃ উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের যে শাখাটি দিক পরিবর্তন না করে সরাসরি উত্তর পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে উত্তর মহাসাগরে মিলেছে তাকে উত্তর আটলান্টিক স্রোত বলে। এই স্রোত উষ্ণ স্রোতরূপে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও উত্তর পশ্চিম ইউরোপের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়।

৫। সুমেরু স্রোত ঃ সুমেরু মহাসাগর হতে দুটি শীতল স্রোত গ্রীনল্যান্ডের উভয় পার্শ্ব দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে। একটি স্রোত উত্তর আটলান্টিক স্রোতের নীচ দিয়ে পর্তুগালের কাছে ক্যানারি স্রোতের সাথে মিশে একেও শীতল স্রোতে পরিণত করে। এ স্রোতকে সুমেরু স্রোত বলে। গ্রীনল্যান্ডের পূর্ব উপকূলের স্রোতটিকে পূর্ব গ্রীনল্যান্ড স্রোতও বলা হয়ে থাকে।

৬। লাব্রাডর স্রোত ঃ সুমেরু মহাসগর হতে মেরু বায়ুর প্রভাবে অপর একটি স্রোত দক্ষিন দিকে অগ্রসর হয়ে ডেভিস প্রণালির মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে উত্তর আমেরিকার লাব্রাডর উপদ্বীপের উত্তর প্রান্তে উপনীত হয়ে গ্রীনল্যান্ড স্রোতের সাথে মিলিত হয়। এই মিলিত স্রোত লাব্রাডর স্রোত নামে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে। নিউফাউন্ডল্যান্ডের নিকট দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। একটি স্রোত উপসাগরীয় স্রোতের নিচ দিয়ে এবং অপর স্রোতটি উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল দিয়ে প্রবাহিত হয়।

উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের নীল পানি উত্তর পূর্ব-দিকে এবং তার পাশ দিয়ে শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের সবুজ পানি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। এই উভয় স্রোতের মধ্যবর্তী সীমারেখাকে হিম প্রাচীর বলে। উষ্ণ ও শীতল স্রোত পাশাপাশি প্রবাহিত হওয়ার ফলে সেখানে প্রায়ই কুয়াশা এবং ঘুর্ণিবাতের সৃষ্টি হয়।

৭। গ্রীনল্যান্ড স্রোত ঃ সুমেরু স্রোতের একটি স্রোত গ্রীনল্যান্ডের পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় তাকে গ্রীনল্যান্ড স্রোত বলে। মেরু দেশীয় বায়ু প্রবাহ এবং আটলান্টিক ও সুমেরু মহাসাগরের পানির লবণাক্ততার পার্থক্যের দরুন এই স্রোতের উৎপত্তি হয়।

৮। নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত ঃ নিরক্ষরেখার উত্তর পার্শ্বদিয়ে এবং উত্তর ও দক্ষিন নিরক্ষীয় স্রোতের মধ্যদিয়ে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষীন স্রোত এদের বিপরীত দিকে অর্থাৎ পশ্চিম হতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। এটা নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত নামে পরিচিত। এই উষ্ণ স্রোত।

৯। গিনি স্রোত ঃ নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে ক্যানারি স্রোতের একটি ক্ষুদ্র শাখার সাথে মিলিত হয়ে গিনি উপসাগরে প্রবেশ করে। এটাই গিনি স্রোত নামে পরিচিত। এটি একটি উষ্ণ স্রোত।

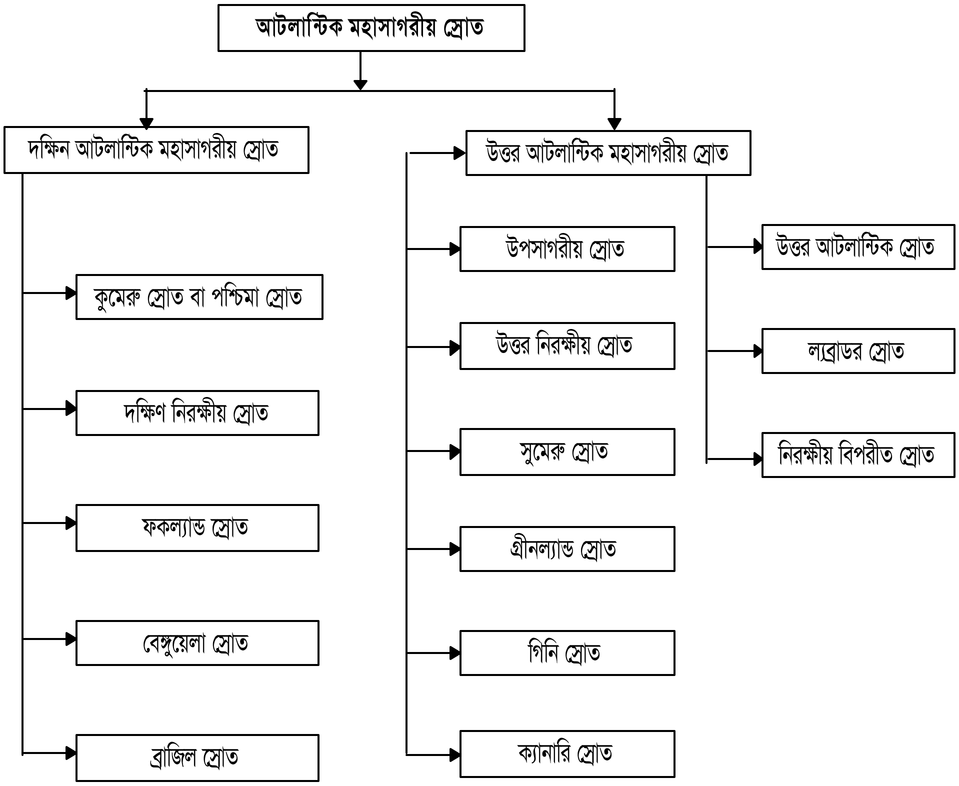

পাঠসংক্ষেপ
আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যভাগ দিয়ে বিষবরেখা চলে যাওয়ায় বিষুব রেখার উত্তর ও দক্ষিনের স্রোতকে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়। এই মহাসাগরে উষ্ণ ও শীতল উভয় প্রকার স্রোত বিদ্যমান। স্রোতগুলো গতিপথে দিক এবং উষ্ণতার পরিবর্তন করে প্রবাহিত হয়। স্থানীয় আবহাওয়ায় এই স্রোতগুলোর প্রভাব অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত ?

ক) বেঙ্গুয়েলা খ) সুমেরু স্রোত গ) সোমালা স্রোত

২। দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতটি কোথায় বাধা পায় ?

ক) আল্প পর্বত মালায় খ) হিমালয়ে গ) সেন্টরক অন্তরীপে

৩। উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এলাকাকে বলে -

ক) ফকল্যান্ড স্রোত খ) শৈবাল স্রোত গ) পশ্চিম উপকূল স্রোত

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতের শ্রেনীবিভাগ দেখান।

২। ব্রাজিল স্রোত ও ফকল্যান্ড স্রোতের গতিপথ দেখান।

৩। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতগুলি কি কি।

৪। উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এবং ল্যাব্রাডর স্রোতের গতিপথ দেখান।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। চিত্রসহ আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতের বিবরণ দিন।

পাঠ- ১২.৫ ঃ সমুদ্র স্রোতের প্রভাব বা ফলাফল

এই পাঠ শেষে আপনি—

- সমুদ্র স্রোতের প্রভাব বা ফলাফল সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

সমুদ্র-স্রোতের প্রভাব বিভিন্ন রূপে দেখতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর নানাস্থানে উষ্ণ ও শীতল স্রোতের প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। এসব সমুদ্র-স্রোতকে মানুষ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও জলবায়ুর উপরও সমুদ্র-স্রোতের অধিক প্রভাব রয়েছে। নীচে সমুদ্র স্রোতের প্রভাব আলোচনা করা হল।

(ক) বাণিজ্যের উপর প্রভাব

Influence on Trade

ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর সমুদ্র-স্রোতের প্রভাব নিচে আলোচিত হল ঃ

(১) নাতিশীতোষ্ণ এবং হিমমন্ডলের অনেক সমুদ্রে শীতকালে পানি জমে বরফ হয়ে যায়। এরূপ অঞ্চলে উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হলে সমুদ্রের পানি বরফে পরিণত হতে পারে না। উপসাগরীয় উষ্ণ স্রোতের দরূন নরওয়ের উত্তর উপকূলে শীতকালেও বরফ জমে না, সুতরাং বন্দরগুলোর পথ বন্ধ হতে পারে না। উষ্ণ জাপান বা কুরোশিও স্রোতের জন্য কানাডার পশ্চিম উপকূলও বরফমুক্ত থাকে। সুমেরু শীতল স্রোতের প্রভাবে উত্তর আমেরিকার লাব্রাডর উপদ্বীপের বন্দরগুলো বছরের অধিকাংশ সময়ই বরফে আচ্ছাদিত থাকে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটে।

(২) সামুদ্রিক জাহাজ চলাচলের উপর সমুদ্র-স্রোতের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। স্রোতের অনুকূলে জাহাজ চালিয়ে অতি শীঘ্রই গন্তব্য স্থানে যাওয়া যায়। এতে সুলভে মালপত্র রপ্তানি ও আমদানি করা সহজ হয়। কিন্তু প্রতিকূলে জাহাজ চালনা করলে অধিক সময় লাগে। এ কারণে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের পথে জাহাজ চালিয়ে অল্প সময়ে আমেরিকা হতে ইউরোপ যাওয়া যায়। কিন্তু এ পথে ইউরোপ হতে আমেরিকা আসতে বহু সময় লাগে।

পুরাতনকালে পালের জাহাজগুলো সর্বদা সমুদ্র-স্রোত অনুসরণ করে একস্থান হতে অন্য স্থানে চলাচল করত। সেকালে পশ্চিম ইউরোপের বন্দরগুলো হতে পালের জাহাজগুলো ক্যানারি ও উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের টানে সহজেই উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে গিয়ে পৌছত। ফিরবার সময় উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের সাহায্যে উত্তর আটলান্টিক স্রোত বরাবর ইউরোপে ফিরে যেত। অনুরূপ ভাবে শীতকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাহাজগুলো রপ্তানি সামগ্রী নিয়ে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী স্রোতের সাহায্যে আরব, ইরান প্রভৃতি দেশে পৌছত এবং গ্রীষ্মকালে স্রোতের গতি পরিবর্তিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী স্রোতের উৎপত্তি হলে স্রোতের অনুকূলে আমদানি সামগ্রী নিয়ে ফিরে আসত।

(৩) উষ্ণ স্রোতের অনুকূলে জাহাজ চালনা নিরাপদ। কিন্তু শীতল স্রোতের গতিপথে হিমশৈল প্রভৃতির জন্য জাহাজ চালনায় অসুবিধা হয়। এজন্য আটলান্টিকের উষ্ণ স্রোতের অনুকূলে সর্বাপেক্ষা অধিক জাহাজ যাতায়াত করে। হিমশৈলের আঘাতে জাহাজ নষ্ট হতে পারে। বিশ্ববিখ্যাত জাহাজ টাইটানিক হিম-শৈলের আঘাতে নিমজ্জিত হয়েছিল।

(৪) হিমশৈল উষ্ণ স্রোতের সংস্পর্শে আসলে গলে যায় এবং তার সাথে প্রবাহিত মাটি, কাদা, উদ্ভিদ প্রভৃতি পানির তলদেশে সঞ্চিত হয়ে চরাভূমির সৃষ্টি করে। নিউফাউন্ডল্যান্ডের নিকটে এরূপ এক বিরাট চড়ার সৃষ্টি হয়ে মৎস্যক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। ফলে এ অঞ্চল মৎস্য ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধ।

(৫) মগ্ন চড়ার নিকট উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলন হলে মাছের প্রিয় খাদ্য প্ল্যাঙ্কটন বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। এ কারণে এরূপ মগ্ন চড়ায় প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায় এবং সহজেই মৎস্য ব্যবসায় গড়ে উঠে। নিউফাউন্ডল্যান্ড, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, নরওয়ে ও জাপান উপকূলে মৎস্যশিল্প গড়ে উঠার পশ্চাতে রয়েছে উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলন।

(খ) জলবায়ুর উপর প্রভাব

Influence on climate

জলবায়ুর উপর সমুদ্র-স্রোতের প্রভাব নিচে দেয়া হলঃ

১. সমুদ্র তীরবর্তী দেশসমূহের জলবায়ুর উপর সমুদ্র স্রোতের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেসব দেশের নিকট দিয়ে উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হয় সেসব দেশের উত্তাপ বৃদ্ধি পায় কিন্তু শীতল সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হলে জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল হয়। শীতল লাব্রাডর স্রোতের প্রভাবে উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স নদী ও তার মোহনা বছরের প্রায় নয় মাসই বরফাবৃত থাকে। কিন্তু উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে একই অক্ষাংশে অবস্থিত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপকূল অঞ্চল সর্বদা বরফ মুক্ত থাকে। নিউইয়র্ক লন্ডন হতে দক্ষিণে অবস্থিত হলেও নিউইয়র্কের পার্শ্বে দিয়ে শীতল ল্যাব্রাডর স্রোত প্রবাহিত হয় বলে সেখানে শীতকালে লন্ডন অপেক্ষা বেশি শীত অনুভূত হয়।
২. উষ্ণ স্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ুতে অধিক জলীয়বাষ্প থাকে বলে তা স্থালভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় বৃষ্টিপাত ঘটায়। অন্যদিকে শীতল স্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু শুষ্ক হয় এবং তা স্থলভাগে পৌঁছে বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারে না।
৩. ঝড়, কুয়াশা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনেক সময় সমুদ্র-স্রোতের প্রভাবেও সংঘটিত হয়ে থাকে। উষ্ণ ও শীতল সমুদ্র-স্রোতের মিলন স্থানে উষ্ণতার পার্থক্যের দরুন ঘন কুয়াশা এবং ঝড়ের সৃষ্টি হয়। এজন্য নিউফাউন্ডল্যান্ড ও জাপানের পূর্ব উপকূলে কুয়াশা এবং ঝড়-বৃষ্টির সৃষ্টি হয়।

পাঠসংক্ষেপ

সমুদ্রস্রোতের প্রভাব মাসুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব রাখে। বিশ্বের বহুদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সমুদ্রস্রোত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। স্থানীয় জলবায়ুর উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব সর্বত্রই লক্ষ্যণীয়। এছাড়াও মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সমুদ্র স্রোতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান থাকায় এর আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

১.১. নাতিশীতোষ্ণ ও হিমমন্ডলের অনেক সমুদ্রে শীতকালে পানি ______________ হয়ে যায়।

১.২. সামুদ্রিক জাহাজ চলাচলের উপর _________________ যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

১.৩. উষ্ণ স্রোতের অনুকূলে জাহাজ চালনা ______________।

১.৪. নিউফাউল্যান্ডের নিকটে এক বিরাট চড়ার সৃষ্টি হয়ে __________________ গড়ে উঠেছে।

১.৫. শীতল স্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু ___________________ হয়।

উত্তর ঃ ১.১. জমে বরফ ১.২. সমুদ্র স্রোতের ১.৩. নিরাপদ ১.৪. মৎস ক্ষেত্র ১.৫. শুষ্ক

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাণিজ্যের উপর সমুদ্র স্রোতের প্রভাব কি?

২. জলবায়ুর উপর সমুদ্র স্রোতের প্রভাব কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমুদ্র স্রোতের প্রভাব বা ফলাফল বর্ণনা করুন।

ইউনিট ১৩

জোয়ার ভাঁটা

পাঠ- ১৩.১ ঃ জোয়ার-ভাঁটার সংজ্ঞা, কারণ, শ্রেণীবিভাগ

এই পাঠ শেষে আপনি—

- জোঁয়ার ভাটা কাকে বলে বলতে পারবেন;
- জোঁয়ার ভাটার কারণ জানতে পারবেন এবং
- জোঁয়ার ভাটার শ্রেনী বিভাগ সম্পর্কে ধারণা পারবেন।

জোয়ার-ভাঁটার সংজ্ঞা

সমুদ্রের পানি নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক এক স্থানে ফুলে ওঠে এবং এক এক স্থানে নেমে যায়। পানির এই ফুলে ওঠাকে জোয়ার (Flow of high tide) এবং নেমে যাওয়াকে ভাঁটা (Ebb or low tide) বলে। অর্থাৎ সমুদ্রের পানির এই সময়ান্তরে উত্থান ও পতনকে জোয়ার-ভাঁটা বলে। পৃথিবীর ওপর চন্দ্র ও সূর্যের কেন্দ্রাতিগ ও মহাকর্ষ শক্তির আকর্ষণে সমুদ্রের পানির এই উত্থান ও পতন হয়। প্রত্যেক ১২ ঘন্টা ২৬ মিনিট অন্তর সমুদ্রের পানি একবার নিয়মিত ওঠা নামা করে। সমুদ্রের মোহনা থেকে নদীগুলোর স্রোতের বিপরীতে উজানে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত জোয়ার-ভাটা বেশী অনুভূত হয়। সমুদ্রের মধ্যভাগ অপেক্ষা উপকূলের কাছে পানির অগভীর অংশে জোয়ারের পানির উচ্চতা বেশী থাকে।

বিভিন্ন নদীপথে দেশের অভ্যন্তরে সমুদ্রের পানি প্রবেশ করে এবং আবার নেমে যায় এ ক্ষেত্রে পানির অনুভূমিক গতি লক্ষ্য করা যায়। একে জোয়ার-ভাঁটা বলে না। এটি সমুদ্রের পানির স্বাভাবিক নেমে যাওয়া এবং বেড়ে যাওয়া।

> কত সময় পর পর সমুদ্রের পানি ওঠা নামা করে?
> জোয়ার-ভাঁটা সাধারণত কোথায় বেশী অনুভূত হয়?

জোয়ার-ভাঁটার কারণ

বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, চন্দ্র ও সূর্যের আর্কষণের ফলেই জোয়ার-ভাটা হয়। স্যার আইজ্যাক নিউটনের অভিকর্ষীয় সূত্রের মাধ্যমে জোয়ার-ভাঁটার উৎস শক্তি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা যায়। এটি মূলত পৃথিবীর সাথে চন্দ্র ও সূর্যের অভিকর্ষিয় বলের প্রতিফলন। এক্ষেত্রে পৃথিবীর জড়তার গতিকে (Inertia of motion) উপেক্ষা করে পৃথিবীর উপরের জলরাশিকে নিয়ে চিন্তা করা হয়েছে।

জোয়ার-ভাঁটা উৎপাদনকারী কারণকে ২ (দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ
ক) মহাকর্ষণ শক্তির প্রভাব (Gravitational force)
খ) কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাব (Centrifugal force)

ক) মহাকর্ষণ শক্তির প্রভাব

মহাকাশের প্রতিটি পদার্থই পরস্পরকে আর্কষণ করছে। এই আর্কষণই মহাকর্ষণ। এই আর্কষণের ফলে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে এবং চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে পরিভ্রমণ করছে। মহাকাশে অবস্থিত সব নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের এ আর্কষণের পরিমাণ সমান নয়। বড় পদার্থের আর্কষণ ক্ষমতা ছোট পদার্থ অপেক্ষা বেশী। চাঁদ অপেক্ষা সূর্য ২ কোটি ৬০ লক্ষ গুন বড় এবং পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য ১ কোটি ৩০ লক্ষ গুন বড় হলেও পৃথিবী থেকে সূর্য গড়ে ১৪ কোটি ৯০ লক্ষ কিলোমিটার দুরে এবং পৃথিবী থেকে চাঁদ গড়ে ৩৮ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩২১ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত। এজন্য পৃথিবীর ওপর চাঁদের আর্কষণ ক্ষমতা সূর্য অপেক্ষা বেশী। পৃথিবী ও এর পদার্থগুলোর ওপর সূর্য অপেক্ষা চাঁদের কার্যকরী আকর্ষণী শক্তি প্রায় দ্বিগুন। সূর্য ও চাঁদের আর্কষণী শক্তি পৃথিবীর কেন্দ্রে ভূমির কাছে কাজ করে থাকে। কিন্তু, পানি তরল বলে এর উপরিভাগে আর্কষণী শক্তি বেশী কাজ করে। কাজেই, পৃথিবীর কেন্দ্র ও পানির উপরিভাগের ওপর চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণ শক্তির তারতম্যের কারণে জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীর ওপর আকর্ষণ ক্ষমতা সূর্য অথবা চাঁদের বেশী?

খ) কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাব

পৃথিবী যখন তার অক্ষের উপর ঘুরতে থাকে তখন একটি বিপরীত শক্তি এর পৃষ্ঠ থেকে বিপরীত দিকে বিপরীত দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে সহজেই তা বোঝা যায়। কোন ব্যক্তি যদি একস্থানে দাঁড়িয়ে ঘুরতে থাকে। তবে আর একটি বিপরীত শক্তি তাকে ছুঁড়ে ফেলার চেষ্টা করে। তাই হঠাৎ থেমে গেলে ঐ ব্যক্তি হঠাৎ দুরে ছিট্‌কে পড়ে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পৃথিবী যেমন নিজ অক্ষে ঘুরছে এবং অভিকর্ষ শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর প্রতিটি জিনিষ তাদের অবস্থানে ঠিক থাকছে, পড়ে যাচ্ছে না তেমনি আরো একটি শক্তি কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে যা সবকিছুকে বাইরের দিকে ঠেলে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রবল মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে সবকিছু পৃথিবী পৃষ্ঠে ঠিক মত অবস্থান করে। তবে পানি তরল বলে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে পানি বিপরীত দিকে বেগে যেতে চায়। একে কেন্দ্রাতিগ বল বা বিকর্ষণ শক্তি বলে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বিকর্ষন শক্তির প্রভাবে পানিরাশি সবসময় বাইরের দিকে বিক্ষিপ্ত হয় এবং কঠিন ভূ-পৃষ্ঠ হতে বাইরের দিকে নিক্ষিপ্ত হতে চায়। এই বিকর্ষণ শক্তি জোয়ার-ভাঁটায় সহায়তা করছে।

কেন্দ্রাতিগ শক্তি পদার্থকে কোন দিকে ফেলার চেষ্টা করে?

ভাঁটা

পৃথিবীতে মোট পানিরাশি পৃথিবীর সর্বত্র সমান ভাবে ছড়িয়ে নেই। জোয়ার-ভাঁটাই এর জন্য দায়ি। যখন পৃথিবীর কোন অংশে মূখ্য জোয়ার ও তার বিপরীত অংশে গৌন জোয়ার, তখন ঐ স্থানদুয়ের মধ্যবর্তী সমকোনে অবস্থিত অংশ দুটি থেকে পানিরাশি মুখ্য ও গৌন জোয়ার স্থান দুটির দিকে প্রবাহিত হয়। এতে করে সমকোনে অবস্থিত স্থান দুটিতে পানিরাশি কমে যায়। এই পানি রাশি কমে যাওয়া স্থান দুটোর অবস্থাকে ভাটা বলে। এক স্থানে প্রতি দিন দুই বার জোয়ার ও দুইবার ভাটা হয়। জোয়ার ভাটার মধ্যকার ব্যবধান প্রায় ১২ ঘন্টা ১৩ মিনিট। জোয়ার ও ভাটার প্রত্যেকটির স্থিতিকাল প্রায় ৬ ঘন্টা ৬ মনিট ৩০ সেকেন্ড।

মুখ্য জোয়ার ও গৌণ জোয়ার হওয়া স্থান দুটোর বিপরীত স্থানে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়?

জোয়ার ভাঁটার শ্রেণীবিভাগ

জোঁয়ার ভাটাকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক) চন্দ্রের অবস্থান ভিত্তিক এবং

খ) পানির উচ্চতা ভিত্তিক।

ক) চন্দ্রের অবস্থান ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

চন্দ্রের অবস্থান ভিত্তিক জোয়ার দু'ধরণের i) মুখ্য জোয়ার এবং ii) গৌণ জোয়ার

i) মুখ্য জোয়ার ঃ পৃথিবী যেমন সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, তেমনি চাঁদও পৃথিবীর উপগ্রহ হিসেবে সর্বদা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এইরূপ আবর্তনের সময় পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের সবচেয়ে নিকটবর্তী বা ঠিক সামনে উপস্থিত হয় তখন সেই স্থানে চাঁদের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী। স্থলভাগ এর চেয়ে জলরাশির ওপর চাঁদের এই আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত বেশী কার্যকরী হয় তাই চারদিক থেকে পানিরাশি ঐ আর্কষণ স্থলের দিকে প্রবাহিত হয়। এক্ষেত্রে কেন্দ্রাতিগ শক্তি বা বিকর্ষণ শক্তি সাহায্য করে। এরই ফলশ্রুতিতে চাঁদের সবচাইতে নিকটবর্তী অঞ্চলে পানিরাশি ফুলে ওঠে। এই জোয়ারকে মুখ্য (Primary) বা প্রত্যক্ষ জোয়ার (Direct tide) বলে। এই জোয়ারকে নিকটবর্তী জোয়ারও (Near Tide) বলে।

চিত্র ১৩.১.১ ঃ মুখ্য জোয়ার ও গৌণ জোয়ার

ii) গৌণ বা পরোক্ষ জোয়ার ঃ (Secondary and Indirect Tide) চন্দ্রের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ স্থলের ঠিক বিপরীত দিকের স্থানে পানির নিচে যে কঠিন স্থলভাগ আছে, তা পৃথিবীর কেন্দ্রের সঙ্গে দৃঢ়রূপে সংযুক্ত থাকে কাজেই তার ওপর চাঁদের আকর্ষণ কেন্দ্রস্থলে আকর্ষণের সমান। তাই বিপরীত দিকের স্থলভাগ অপেক্ষাকৃত বেশী আকৃষ্ট হয়। এই সময় বিপরীত দিকের পানিভাগের ওপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব কমে যায় এবং বিকর্ষণ শক্তির প্রভাবে চার পাশের পানিরাশি ঐ স্থানের দিকে প্রবাহিত হয় এবং এতে করে জোয়ারের সৃষ্টি হয়। এই জোয়ারকে গৌন (Secondary) বা পরোক্ষ জোয়ার (Indirect Tide) বলে। একে দূরবর্তী জোয়ারও (Far Tide) বলে।

গৌন জোয়ার পৃথিবীর কোথায় হয় ?

খ) পানির উচ্চতা ভিত্তিক শ্রেনীবিভাগ

পানির উচ্চতা ভিত্তিক জোয়ার-ভাঁটা দু'ধরণের হয়।

i) তেজকটাল বা ভরা কটাল (Spring Tide) ঃ জোর্তির্বিদগণের মতে চাঁদ ও সূর্যের জোয়ার উৎপন্ন করার ক্ষমতার অনুপাত ১১ঃ৫। অর্থাৎ সূর্য যদি ৫ গুন জোয়ারের সৃষ্টি করে তবে চাঁদ ১১ গুন জোয়ার সৃষ্টি করে। পৃথিবী ও চাঁদের আকর্ষণের এক পর্যায়ে সূর্য ও চাঁদ পৃথিবীর একই দিকে অবস্থান করে। এই সময় অমাবস্যার সৃষ্টি হয় (চিত্র ১৩.১.৩)। আবার পূর্ণিমার সময় পৃথিবীর একদিকে সূর্য ও অন্যদিকে চাঁদ থাকে এবং এরা একই সরল রেখায় অবস্থান করে। এর ফলে চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণ শক্তি একই সঙ্গে কার্যকরি হয়। যদিও সূর্যের আকর্ষণ চাঁদের আকর্ষণের তুলনায় কম তবুও উভয়ের মিলিত আকর্ষণে পূর্ণিমা ও অমবস্যায় চাঁদের আকর্ষণে যে স্থানে মুখ্য ও গৌন জোয়ার হয়, সূর্যের আকর্ষণেও সেই স্থানে জোয়ার হয়। এই দুই জোয়ারের মধ্যের সমকোনী অংশে ভাটার পানি খুবই নেমে যায়। এই জন্যই পূর্ণিমা ও অমাবস্যার জোয়ারকে ভরা জোয়ার বা ভরা কটাল বা তেজ কটাল (Spring) বলে। পূর্ণিমা তিথিতে ভূ-পৃষ্ঠের যে স্থানে চাঁদের প্রভাবে মুখ্য জোয়ার হয়, সে স্থানে সূর্যের প্রভাবে গৌন জোয়ার এবং যে স্থানে চাঁদের প্রভাবে গৌন জোয়ার, সে স্থানে সূর্যের প্রভাবে মুখ্য জোয়ার হয়। অমাবস্যা তিথিতে পৃথিবীর একই পাশে চাঁদ ও সূর্যের মুখ্য জোয়ার এবং এর বিপরীত পাশে চাঁদ ও সূর্যের গৌন জোয়ার হয়ে থাকে।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথীতে পৃথিবী, সূর্য ও চাঁদে অবস্থান কেমন থাকে?

চিত্র ১৩.১.২ ঃ পূর্ণিমায় ভরা কটাল

ii) মরা কটাল ঃ (Neap Tide)

সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে চাঁদ ও সূর্য সরল রেখায় না থেকে উভয়ে পৃথিবীর সঙ্গে এক সমকোনে অবস্থান করে পৃথিবীকে আর্কষণ করে। ফলে সে দিন তাদের আর্কষণ আড়াআড়ি কার্যকর হয়।

চিত্র ১৩.১.৩ ঃ অমাবস্যার ভরা কটাল

চিত্র ১৩.১.৪ ঃ অষ্টমীর মরা কটাল

এই সময় চাঁদের আর্কষণে চাঁদের দিকে এবং এর বিপরীত দিকে জোয়ার ও সূর্যের আকর্ষণে সূর্যের দিকে এবং এর বিপরীত দিকে জোয়ার হওয়ার কথা থাকলেও চাঁদের অধিক আর্কষণী শক্তির কারণে চাঁদের দিকে ও এর বিপরীত দিকে জোয়ার এবং সূর্যের দিকে ও সূর্যের বিপরীত দিকে ভাটা হয়। এর ফলশ্রুতিতে চাঁদের দিকে ও এর বিপরীত দিকে পানি তত বেশী ফুলে উঠতে পারে না। এই কারণে এই দুই দিন জোয়ার সবচেয়ে কম হয়। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার প্রবল জোয়ারের পর সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে মরা জোয়ার বা মরা কটাল বলে।

মরা কটালের সময় চাঁদ সূর্য ও পৃথিবীর অবস্থান কি হয়?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. কত সময় পর পর সমূদ্রের পানি একবার উঠানামা করে?
   - ক) ৬ ঘন্টা পর পর
   - খ) ১২ ঘন্টা ২৬ মিনিট পর পর
   - গ) ৮ ঘন্টা পর পর
   - ঘ) ৫ ঘন্টা ২০ মিনিট পর পর

২. জোঁয়ার ভাটা বিশ্লেষণে পৃথিবীর কোন গতিকে উপেক্ষা করা হয়?
   - ক) আহ্নিক গতি
   - খ) বার্ষিক গতি
   - গ) জড়তার গতি
   - ঘ) ধীর গতি

৩. মহাকর্ষণ কি?
   - ক) মহাকাশের প্রতিটি পদার্থের পারস্পরিক আকর্ষণ
   - খ) পৃথিবীর বস্তগুলির পারস্পরিক আকর্ষণ
   - গ) উভয়ই
   - ঘ) যে কোন দুটি বস্তুর বিকর্ষণ

৪. চাঁদ-সূর্যের জোয়ার উৎপন্ন করার ক্ষমতার অনুপাত?
   - ক) ১০ : ৫
   - খ) ৬ : ৪
   - গ) ১১ : ৫
   - ঘ) ১৬ : ১৫

উত্তর ঃ ১। খ (১২ ঘন্টা ২৬ মিনিট) ২। গ (জড়তার গতি)
৩। ক) (মহাকাশের প্রতিটি পদার্থের আকর্ষণ ৪। গ (১১ঃ৫)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পানির উচ্চতা ভিত্তিক জোয়ারের শ্রেনীবিভাগ বর্ণনা করুন।
২. গৌণ বা পরোক্ষ জোয়ার বলতে কি বুঝেন?
৩. মূখ্য জোয়ার ও গৌণ জোঁয়ারের মধ্যে পার্থক্য কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জোয়ার ভাটা কাকে বলে? জোয়ার ভাঁটা কিভাবে সংঘটিত হয়?
২. জোয়ার ভাঁটা কাকে বলে? জোয়ার ভাঁটার শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করুন।

পাঠ- ১৩.২ ঃ জোয়ার ভাঁটার সময়, গতি ও প্রভাব

এই পাঠ শেষে আপনি—

- জোঁয়ার ভাটার সময়, গতি এবং প্রভাব সম্পর্কে ধারনা পাবেন।

জোয়ার (Tide)

জোয়ার হচ্ছে কতকগুলো তরঙ্গ যার সংকোচিত হবার সময় হচ্ছে ১২ ঘন্টা ২৬ মি. এবং এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পৃথিবীর পরিধির প্রায় অর্ধেক (১২,৬০০ মাইল বা প্রায় ২৩,৩০০ কিলোমিটার)। পর্যবেক্ষন করলে দেখা যায় যে এক জোয়ার থেকে ভাটার পার্থক্য প্রায় ৬ ঘন্টা ১৩ মিনিট।

জোয়ার-ভাঁটার বিস্তৃতি

(Tidal Range)

উচ্চ জোয়ারের সময় পানির সর্বোচ্চ উচ্চতা ও নিম্ন জোয়ারের সময় পানির সর্বনিম্ন উচ্চতার ব্যবধানকে জোয়ার ভাটার বিস্তৃতি বা টাইডাল রেঞ্জ বলে। টাইডাল রেঞ্জ সাধারণত ১ মিটার থেকে ২০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে কোথাও কোথাও এটা ২০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। যেমন- বে-অব-ফাইন্ডি। ভৌগোলিক অবস্থা ও এলাকার জ্যামিতিক আকৃতি অনুয়ায়ী টাইডাল রেঞ্জ এর বিভিন্নতা হয়।

টাইডাল রেঞ্জ কি?
টাইডাল রেঞ্জের ভিন্নতার জন্য দায়ী কি কি নিয়ামক?

জোয়ার ভাঁটার সময়

পশ্চিম থেকে পূর্বে পৃথিবী ২৪ ঘন্টায় একবার নিজ অক্ষের ওপর ঘোরে। চাঁদও নিজকক্ষ পথে অবস্থান করে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘোরে এবং পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমন করছে। চাঁদ যদি স্থির থাকত তবে পৃথিবীর প্রত্যেক স্থান ২৪ ঘন্টা অন্তর একবার চাঁদের সামনে আসত এবং ঐ স্থানে মূখ্য জোয়ার হত। চাঁদ যেহেতু নিজ কক্ষ পথে সাড়ে উনত্রিশ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে, সেহেতু এটি একদিনে তার কক্ষের সাড়ে উনত্রিশ ভাগের একভাগ অগ্রসর হয়। কাজেই, পৃথিবীর এক বার আর্বতন সময়ে অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় চাঁদ নিজ কক্ষের প্রায় ১৩° পথ অগ্রসর হয়। সম্পূর্ন একবার ঘুরে আসার পর ভূ-পৃষ্ঠের কোন মধ্য রেখা পুনরায় চাঁদের ঠিক নিচে আসতে ঐ ১৩° পথ বেশি অগ্রসর হতে হয়। এই ১৩° পথ অগ্রসর হতে পৃথিবীর আরো ১৩×৪২=৫২ মিনিট সময় লাগে। তাই, আজ যে জায়গায় মুখ্য জোয়ার হল, আগামীকাল সেই জায়গায় মূখ্য জোয়ার ঠিক ২৪ ঘন্টা পর না এসে ২৪ ঘন্টা ৫২ মিনিট অর্থাৎ প্রায় ২৫ ঘন্টা পরে আসে।

চিত্র ১৩.২.১ ঃ জোয়ার-ভাঁটার সময়ের ব্যবধান

এক মুখ্য জোয়ার চলে যাবার ১২ ঘন্টা ২৩ মিনিট অর্থাৎ প্রায় সাড়ে বার ঘন্টা পরে সেই জায়গায় গৌন জোয়ার এবং ঐ স্থানের প্রত্যেক জোয়ারের প্রায় ৬ ঘন্টা ১৩ মিনিট অর্থাৎ প্রায় সোয়া ছয় ঘন্টা পরে ভাঁটা হয়।

চাঁদ নিজ কক্ষপথে কয়দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিন করে?
আজ যেখানে মুখ্য জোয়ার আগামীকাল সেখানে মুখ্য জোয়ার কত সময় পরে আসে?

জোয়ার-ভাঁটার ব্যবধান

উন্মুক্ত সমুদ্রে জোয়ারের পানি খুব বেশি ফুলে ওঠে না। জোয়ার ও ভাঁটার মধ্যে মাত্র কয়েক মিটারের ব্যবধান দেখতে পাওয়া যায়। উপুকূলের কাছে এ অবস্থার পরিবর্তন দেখা যায়। বড় বড় সাগর, মহাসাগরে জোয়ারের পানি ১-২ মিটারের (৩-৪ ফুট) বেশি উঁচু হয় না। কিন্তু স্থানভেদে উপকুলের কাছে নদীর খাড়ী, মোহনা, পোতাশ্রয় এবং সাগরের মহীসোপানে জোয়ারের স্রোত ৩ থেকে ৪ এবং ৯ থেকে ১২ মিটার (১০-১২ এবং ৩০-৪০ ফুট) পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। উন্মুক্ত উপসাগরে ভাঁটার সময় পানির গভীরতা অপেক্ষা জোয়ারের সময়ের গভীরতা ২১ মিটার (৭০ ফুট) বেশি হয়। ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, কৃষ্ণ সাগর ও বাল্টিক সাগর প্রায় চারদিক স্থল বেষ্টিত থাকায় সে সব জলাশয়ে মহাসাগরের জোয়ার ভাঁটার প্রভাব খুব কম দেখা যায়।

উন্মুক্ত সাগরে জোয়ার-ভাঁটার ব্যবধান কেমন?
উপকূলের কাছে জোয়ার-ভাঁটার অবস্থা কেমন?

সম জোয়ার রেখা

সমুদ্রের অনেক স্থানে একই সঙ্গে জোয়ার আসতে দেখা যায়। পৃথিবীপৃষ্ঠে যে সব স্থানে একই সময়ে জোয়ার আসে। এই স্থান গুলিকে কাল্পনিক রেখা দ্বারা যোগ করলে যে রেখা সমুহ পাওয়া যায় তাকে 'সমজোয়ার' রেখা (Co-tidal-lines) বলে। নাবিকদের জন্য এই সম জোয়ার রেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।

চিত্র ১৩.২.১ ঃ সমজোয়ার রেখার বন্টন

সমজোয়ার রেখা কি?

জোয়ারের স্রোত ঃ

জোয়ারের ফলে এ স্রোতের সৃষ্টি হয়। এই স্রোত দুই ধরণেরঃ

i) বন্যার ফলে সৃষ্ট স্রোত

ii) ভাঁটার ফলে সৃষ্ট স্রোত

বন্যার ফলে সৃষ্ট স্রোতঃ উপকূল থেকে ভূ-অভ্যন্তরের দিকে জোঁয়ারের ফলে এ স্রোতের সৃষ্টি হয়।

ভাঁটার ফলে সৃষ্ট স্রোতঃ ভাঁটার সময় যখন পানি নেমে যায় তখন সে স্রোতের সৃষ্টি হয়। এই স্রোত উপকূল থেকে সমুদ্রের দিকে হয়।

জোয়ার ভাঁটার প্রভাব

১. জোয়ারের সময় নদীর মোহনায় ও তার অভ্যন্তরে পানি অধিক হয়। ফলে বড় বড় জাহাজের পক্ষে নদীতে প্রবেশ করা সুবিধাজনক হয়। আবার ভাটার টানে অনায়াসে সমুদ্রে নেমে আসতে পারে।
২. জোয়ার-ভাঁটার ফলে নদীর পানি নির্মল থাকে। ভাটার টানে নদীর সব আবর্জনা ধুয়ে মুছে যায়।
৩. জোয়ার-ভাঁটায় স্রোতের জন্য নদী খাত গভীর হয়।
৪. অবিরাম জোয়ার-ভাঁটার ফলে পলি মাটি পড়ে নদীখাত বন্দ হতে পারেনা।
৫. বহু নদীতে ভাঁটায় স্রোতকে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।
৬. জোয়ার-ভাঁটার ফলে নদীর পানি স্বল্প পরিমাণ লবনাক্ত হয়। এর ফলে শীত প্রধান দেশে নদীর পলি সহজে জমে না।
৭. নদীর জোয়ার পানি সেচে সহায়তা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১.১. জোয়ার ও ভাঁটার সময়ের পার্থক্য কত
ক) ৬ ঘন্টা ১০ মিনিট খ) ৬ ঘন্টা ১৫ মিনিট গ) ৬ ঘন্টা ১৩ মিনিট ঘ) ৮ ঘন্টা

১.২. টাইডাল রেঞ্জ-এর দৈর্ঘ কত ?
ক) ২ ঘন্টা ১০ মিনিট খ) ৫ ঘন্টা ২০ মিনিট গ) ১ ঘন্টা ২০ মিনিট ঘ) ২ ঘন্টা

১.৩. একদিনে চাঁদ কত কৌনিক পথ অতিক্রম করে ?
ক) ১৫° খ) ১২° গ) ৩০° ঘ) ১৫°

১.৪. সাধারণত ঃ জোঁয়ারের পানি কত উঁচু হয় ?
ক) ১-২ মি খ) ৩-৪ মি গ) ৫-৬ মি ঘ) ১-৪ মি.

উত্তর ঃ ১.১. গ ১.২. গ ১.৩. খ ১.৪. ক

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সমজোয়ার রেখার সংজ্ঞা দিন।
২। জোয়ার-ভাঁটার প্রভাব লিখুন।
৩। টাইডাল রেঞ্জের জন্য দায়ী কি কি নিয়ামক?
৪। জোয়ার ভাঁটার সময় বলতে কি বুঝেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জোয়ার ভাঁটার সময় গতি ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

সিলেবাস
প্রাকৃতিক ভূগোল ১ম পত্র
এইচএস সি প্রোগ্রাম

মার্ক বন্টনঃ

রচনামূলক প্রশ্ন

প্রাকৃতিক ভূগোল (ইউনিট ১ থেকে ৭ পর্যন্ত)
মোট ৬টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ৩×১০ = ৩০

বায়ূমন্ডল (ইউনিট ৮ থেকে ১০)
মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ১×১০ = ১০

বারিমন্ডল (ইউনিট ১১ থেকে ১৩)
মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ১×১০ = ১০

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

সমগ্র বই থেকে (ইউনিট ১ থেকে ১৩ পর্যন্ত) মোট ১০ টি প্রশ্ন থাকবে।
যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ৫×৫ = ২৫

মোট = ৭৫ নম্বর

নমুনা প্রশ্ন

এইচ এস সি প্রোগ্রাম

বিষয় ঃ প্রাকৃতিক ভূগোল ১ম পত্র

“ক” বিভাগ

প্রাকৃতিক ভূগোল

যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন- ৩×১০ = ৩০

১। প্রাকৃতি ভূগোল-এর সংঙ্গা দিন। এর পরিধি আলোচনা করুন।

২। পর্বতের শ্রেনীবিভাগ দেখান। ভঙ্গিল পর্বত কিরূপে সৃষ্টি হয় বর্ণনা করুন।

৩। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করুন।

৪। ভূ-আলোড়ন বলতে কি বুঝেন? ভূ-আলোড়নের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপের বিবরন দিন।

৫। ভূ-অভ্যন্তরের গঠন বর্ণণা করুন।

৬। শিলা কাকে বলে? আগ্নেয় শিলার বিবরণ দিন।

“খ” বিভাগ

বারিমন্ডল

যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দিন- ১×১০ = ১০

৭। চিত্রসহ নিয়ত বায়ুপ্রবাহ বর্ণনা করুন।

৮। বৃষ্টিপাতের সংঙ্গা দিন। বিভিন্ন প্রকার বৃষ্টিপাতের বর্ণনা করুন

“গ” বিভাগ

বারিমন্ডল

যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দিন- ১×১০ = ১০

৯। সমূদ্র তলদেশের ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা করুন।

১০। জোঁয়ার ভাঁটার কারণ চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

“ঘ” বিভাগ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিন- ৫×৫ = ২৫

১। প্রাকৃতিক ভূগোল-এর শাখা সমূহ কি কি ?

২। স্তূপ পর্বত কিভাবে গঠিত হয়?

৩। চ্যুতি ও ফাঁটলের সংঙ্গা দিন।

৪। স্থানীয় ও সাময়িক বায়ুর সংঙ্গা দিন।

৫। ভূ- আলোড়নের ফলে সুষ্ট ভূমিরূপ গুলো কি কি?

৬। মূখ্য জোঁয়ার কখন এবং কিভাবে হয়?

৭। ভঙ্গিল পর্বত কাকে বলে?

৮। চাপ বলয় কাকে বলে?

৯। শৈলৎক্ষেপ বৃষ্টিপাতের সংঙ্গা দিন।

১০। মরা কটাল কি?

মানবণ্টন
ও
নমুনা প্রশ্ন

ব্যবহারিক অংশ

গ্রন্থপঞ্জি

১। Chorley, R.J., S.A. Schumm and D.F. Sugden, 1985. Geomorphology, Methuen and Co. Std., London, New Youk.

২। Gilluly James and etl, 1968, principles of Geology, W.H. Freeman and Company, San Francisco and London.

৩। 22, 1971. The Earth : It's Shape Internal Structure and Composition, The Open University Press, U.K.

৪। Singh Savindra, 1998. Geomorphology, Prayag Pustak Bhawan, Allahabad, India.

৫। Sparks, B.W. 1960. Geomorphology, Longmans, U.K.

৬। Strahler A.H. and Strahler, A.N., 1992. Modern Physical Geography, Singapore: John Wiley & Sons.

৭। Tarbuck, E.J. and F.K. Lutgens, 1984. The Earth, An Introduction to Physical Geology, Charles E. Merrill Publishing Com., A Bell & Howell Com. Columbus Ohio 43216.

৮। Tarbuck, E.J. and F.K. Lutgens, 1994. Earth Science, 7th ed., McGrawHill, N.Y. College Pub. Com., N.Y.

৯। Thornbury, W.D. 1968. Principles of Geomorphology, John Wiley & sons.

১০। Worcester, P.G. 1965. A Text Book of Geomorphology, Von Nostrand.

১১। আলম, শা. ও রউফ কা, আ, ১৯৯৮। উচ্চ মাধ্যমিক প্রাকৃতিক ভূগোল, সুজনেষু প্রকাশনী, ঢাকা।

১২। আহমেদ রফিক, ১৯৯৭, আবহাওয়া ও জলবায়ু বিজ্ঞান, সুজনেষু প্রকাশনী।

১৩। আলম শামসুল মোহা ও হোসেন ফারজানা, ২০০৩ ভূগোল ও পরিবেশ পরিচিতি, বিএ/বিএসএস প্রোগ্রাম, বাউবি।

১৪। চৌধুরী মো, হো, ১৯৯৪। প্রাকৃতিক ভূগোল, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ ঢাকা।

১৫। চৌধুরী মো, হো, ১৯৯৪। প্রাকৃতিক ভূগোল, নিউ পূবালী, ঢাকা।

১৬। চৌধুরী মো, হো, ২০০১। ব্যবহারিক ভূগোল, উচ্চ মাধ্যমিক, বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড।

১৭। দাস, সু, চ, ১৯৯৮। আধুনিক সমুদ্র বিজ্ঞান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৮। বন্দোপাধ্যায় ত,কু, ১৯৮০। আধুনিক ভূ-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, কলকাতা।

১৯। বন্দোপাধ্যায় ত,কু, ১৯৮০। আধুনিক ভূ-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, কলকাতা।

২০। বন্দোপাধ্যায় ত,কু, ১৯৮০। আধুনিক ভূ-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, কলকাতা।

২১। মুখোপাধ্যায় সু, ও দাস র,কু, ১৯৯৪। ভূমিরূপঃ উদ্ভব ও প্রকৃতি, ২য় খণ্ড, পর্যায়ন ভূমিরূপ, পশ্চিমবঙ্গরাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

২২। মুখোপাধ্যায় সু, ও দাস র,কু, ১৯৯৩। ভূমিরূপঃ উদ্ভব ও প্রকৃতি, ১ম খণ্ড, ভূ-গাঠনিক ভূমিরূপ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।